বুলবুল চৌধুরী

সুলতানা রাহমান

বুলবুল চৌধুরী

[নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরীর জীবনী]

সুলতানা রাহমান

Chunati.com
Pioneer in village based website

বাংলা একাডেমী ঃ ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২

দ্বিতীয় সংস্করণ
ফাল্গুন ১৩৯০
ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪

বাএ ১৩৫৪

পাণ্ডুলিপি : ভাষা ও সাহিত্য উপ-বিভাগ

প্রকাশক
বশীর আলহেলাল
পরিচালক, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রাকর
সুন্দর মুদ্রণ
৩০, টিপু সুলতান রোড, ঢাকা
সলিমাবাদ প্রেস
২১/৩, কোর্ট হাউস স্ট্রীট, ঢাকা
বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ : প্রাণেশ কুমার মণ্ডল

মূল্য : চল্লিশ টাকা

BULBUL CHOUDHURY : A Biographical sketch of Dancer Bulbul Choudhury by Sultana Rahman. published by Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First Edition, July, 1962. Second Edition, 1984. Price : Tk. 40.00 US Dollar 4.00

Chunati.com
Pioneer in village based website

বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর
ছাত্রছাত্রীদের হাতে

সুলতানা রাহমান

Chunati.com
Pioneer in village based website

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

১৯৬২ সালে বুলবুল চৌধুরীর জীবনী-গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলো তৎকালীন পাকিস্তান কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি। মাঝখানে দীর্ঘ বাইশ বছর কেটে গেছে, বইটির সব কপি নিঃশেষ হয়ে গেছে বহু বছর আগে। অনেক দেরিতে হলেও বাংলা একাডেমী বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। ইতিমধ্যে নীলরতন মুখোপাধ্যায় বুলবুল চৌধুরীর একটি জীবনী-গ্রন্থ রচনা করেছেন। আমার রচিত বুলবুল চৌধুরীর দ্বিতীয় সংস্করণে আমরা কিছু কিছু পরিবর্ধন করেছি, কিন্তু পরিবর্তন করা হয়নি। বইটি যে ত্রুটিহীন হয়েছে, এমন দাবিও করছি না।

সুখে দুঃখে আনন্দ বেদনায়, সাধনা ও সাফল্যে একটি সমৃদ্ধ জীবনের অতি সামান্য আলেখ্যই আমরা বইটিতে তুলে ধরতে পেরেছি। তবুও আশা করবো আমাদের বিদগ্ধ পাঠক-সমাজ বইটি গ্রহণ করবেন সাদরে।

Ghunati.com
Pioneer in village based website

বুলবুল চৌধুরী এমন এক ব্যক্তিত্ব প্রতিদিনের কথাবার্তায় আচার-আচরণের মধ্যেও তীব্র জীবনবোধ বিধৃত। আমরা সেদিকে কতটুকু আলোকপাত করতে পেরেছি সে বিচারের ভার সহৃদয় পাঠক সমাজের।

'ছায়াপথ'
রুমঘাটা
চট্টগ্রাম।
২১-৭-৮৪

বিনীত
সুলতানা রাহমান

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

সহোদর বা বড় ভাইয়ের জীবনী হিসেবেই নয় শুধু একজন স্বভাব-শিল্পীর মানস বিকাশ ও শিল্পীসত্তার ক্রম পরিণতির পটভূমি হিসেবেও এই বইখানা পাঠক সমাজে পেশ করা হলো। বুলবুল-জীবনী আরো সুন্দর ও বহু প্রসারী হওয়া উচিত ছিলো, কিন্তু তেমনভাবে বইখানা সুসম্পন্ন করতে পারিনি—না পারার কারণ আমার অক্ষমতা আর বইটি লেখাতে আমার স্বাধীনতা ছিলো না বলে।

যে-কোন লেখাতেই লেখক-লেখিকার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন, কিন্তু এই বইটি লিখবার বেলায় সেই স্বাধীনতা আমার ছিলো না। তাতে করে লেখার গতি ব্যাহত হয়েছে। একটা ভয়, একটা সন্দেহ লেখার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমায় অনুসরণ করে ফিরেছে—আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছি? এই আত্মচেতনার মধ্যে বইখানা শেষ করতে হয়েছে।

আর এই সচেতনতাই প্রত্যেক লেখক-লেখিকার স্বাধীনতা হরণ করে থাকে। বিশেষ করে জীবনীকারের পক্ষে আত্মসচেতনতা যে কতখানি অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে সহৃদয় পাঠকবৃন্দ ও বুলবুল অনুরাগীরা তা বিবেচনা করে দেখবেন নিশ্চয়ই। এ-ক্ষেত্রে অন্তরায় কাটিয়ে উঠবার প্রশ্ন তাঁরা তুলবেন না অনেক সময়। রচনার বিচার ও মূল্যায়নে এই কথাটি স্মরণ রাখলে আমি বাধিত হবো।

Chunati.com
Pioneer in village based website

বুলবুল-জীবনীর পটভূমি তৈরী হয়েছিলো '৫৪ সালের শেষের দিকে বুলবুলের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই। নিজের মনে বুলবুলের কথা ভাবতাম—কতদিনের কত রকম ঘটনা শৈশবের কত স্মৃতি হীরা-জহরতের মত মনের দর্পণে আলো বিকীর্ণ করতো, কস্তুরীর মত সৌরভ ছড়িয়ে আমায় আকুল করে তুলতো। আমার ছেলেমেয়েদের কাছে ডেকে এনে সেইসব কথা শোনাতাম। আমার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কতদিন কত রকমে শুধু বুলবুলের কথা নিয়েই আলাপ করেছি। কোনক্রমেই তৃপ্ত হতে পারিনি। সব সময় একটা অস্থিরতা বোধ করতাম। মনে প্রশ্ন জাগতো বুলবুলের বিরাট ব্যক্তিত্ব মহৎ শিল্পগুণ ক'দিন পরেই কী আমরা বিস্মৃত হয়ে যাবো না? এই শিল্পীই না তিল তিল করে ক্ষয়ে সংস্কৃতির জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করে গেছে! এই শিল্পীইতো বোম্বে চিত্রজগতের লক্ষপতি প্রযোজকদের মোটা অঙ্কের অর্থের

প্রলোভনকে অবলীলাক্রমে অগ্রাহ্য করে বলেছিলোঃ 'শিল্প ব্যবসার পণ্য নয়। এ জিনিস সাধনা করে পেতে হয়। চিত্র জগতের কর্তাদের খেয়াল-খুশির কাছে আমি আমার সম্পর্ক বেচতে পারবো না। চরম অর্থকষ্টের সময় হাজার হাজার অর্থ এক রকম হাতের মুঠোয় পেয়েও যে দৃঢ়তার সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে তার চারিত্রিক বিশালতা সর্বোপরি শিল্পের প্রতি মর্যাদা যে কত গভীর ও অকৃত্রিম হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

কালের অমোঘ নিয়মে মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়—কিন্তু তার কীর্তি? কী করা যায়! কেমন করে বুলবুলকে আমি তুলে ধরবো সকলের সামনে—মনের সেই অবস্থায় একদিন লিখতে বসলাম—আমার দুর্বল লেখনীতে, বুলবুলকে প্রকাশ করার চেষ্টায়।

অধ্যক্ষ জনাব ইব্রাহিম খাঁ তখন করাচীতে ছিলেন। লেখাটা তাঁকে পড়তে দিলাম, সংশোধনের উদ্দেশ্যে। তারপর কোনো পত্রিকায় লেখাটি তাঁকে ছাপাবার ব্যবস্থা করতে বলেছিলাম।

হয়তো আমাকে উৎসাহিত করার জন্যেই তিনি বলেছিলেনঃ এমন নিষ্ঠা, এত দরদ যে লেখাতে তাতে আমি কলম চালাবো কোন প্রাণে মাতাজী, আপনি বরং আরো কিছু লিখে ফেলুন—তারপর জীবনীর মত একখানা বই বার করুন।

Pioneer in village based website

বলাবাহুল্য, এতখানি আমি আশা করিনি। তাই বলেছিলাম সে কি আমি পারবো? তিনি ভরসা দিয়ে বলেছিলেনঃ এতখানি যখন লিখতে পেরেছেন বাকিটুকুও আপনি পারবেন। তাঁর সেই শুভেচ্ছা আমি মাথায় করে রেখেছিলাম। তখন আমি বুলবুল অনুরাগী, বুলবুলের সাহিত্যিক বন্ধুদের পানেই চেয়েছিলাম—ধারণা ছিলো তাঁদের মধ্যে কেউ নিশ্চয় এই দায়িত্ব পালন করবেন। তারপরও দীর্ঘদিন কেটেছে কিন্তু তাঁরা এ সম্বন্ধে কিছু করছেন কিনা জানি না। আমাদের জাতীয় শিল্পীর প্রতি সুধী সমাজের কী কোনো কর্তব্য নেই? নাকি চিন্তা ও ভাবনার মধ্যে তাঁরা তাঁদের কর্তব্য শেষ করে দিতে চান—এই কর্মবিমুখিনতা কী কোনো জাতির পক্ষে মঙ্গলজনক?

অবশেষে জনাব ইব্রাহিম খাঁর শুভেচ্ছা ও আশ্বাস স্মরণ করে বুলবুলকে প্রকাশ করার এই দুরূহ দায়িত্ব পালনে আমাকেই ব্রতী হতে হয়েছে। গ্রন্থখানি যত সামান্য যত অসম্পূর্ণই হোক না কেনো আজ তা বুলবুল অনুরাগীদের হাতে তুলে দিতে পেরে কিছুটা যেন তৃপ্তি বোধ করছি। তার জন্য জনাব ইব্রাহিম খাঁর কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

বুলবুলের অভিন্ন হৃদয় সুহৃদ অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত হরি নারায়ণকে কোলকাতা থেকে বুলবুলের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র পাঠিয়ে, মূল্যবান তথ্য দিয়ে এবং তাঁর সুচিন্তিত মতামত জানিয়ে আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু-প্রীতি স্মরণীয় হয়ে থাকলো বুলবুল-জীবনী প্রসঙ্গে।

বইটি সংশোধন ও সম্প্রসারণের কাজে স্নেহাস্পদ এ. এম. সাহাবুদ্দিনের অমূল্য সাহায্য পেয়েছি। বুলবুলকে সে যে কতখানি শ্রদ্ধা করে ভালো-বাসে জীবনীখানাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য তার অকাতর পরিশ্রম ও প্রচেষ্টাতেই সে তা প্রমাণ করেছে। তার ঐতিহাসিক শ্রদ্ধা ও গভীর ভালোবাসার কাছে নীরব হয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

প্রীতিভাজন লুৎফর রহমান বুলবুলের সঙ্গে তাঁর শেষ সাক্ষাতের বর্ণনা দিয়ে এবং আরো নানা রকমে আমাকে সাহায্য করেছেন। ধন্যবাদ জানিয়ে এঁদের প্রীতি-পরিমল ভরা ভালোবাসাকে খর্ব করবো কেমন করে।

আমাদের কবি ও সাহিত্যিক-বন্ধু জনাব মখছেদ আলী, জনাব মফিজ-উদ্দিন, জনাব মবজুলল হোসেন তাঁদের কর্মব্যস্ততার মধ্যেও পাণ্ডুলিপিখানা দেখে দিয়েছেন, আরো অনেক রকম পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁদের সৌহার্দ্যতায় মুগ্ধ হয়েছি। মামুলি ধন্যবাদ দিয়ে তাঁদের বন্ধুতাকে খাটো করতে চাই না।

জনাব আবুল ফজল সাহেব বইটির ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। এ যেমন ব্যথার তেমনি গর্বের। উভয়ের সম্পর্ক ছিলো আন্তরিক প্রীতি-শ্রদ্ধার। বুলবুলের মৃত্যুর পর বুলবুল সম্বন্ধে ফজল সাহেব যে প্রবন্ধ লিখেছেন তাতে আর এই ভূমিকায় একই মাতৃভূমির এক সাহিত্য শিল্পী আর এক নৃত্য শিল্পীর যোগসূত্র অক্ষয় হয়ে রইলো। তা ছাড়া প্রেসে দেবার পূর্বে পাণ্ডু-লিপিখানাও ফজল সাহেব দেখে দিয়েছেন। প্রকাশনা ও মুদ্রণ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে বুলবুলের তথা আমাদের যে সম্পর্ক তাতে ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গেল উভয় পক্ষ অস্বস্তি বোধ করবো বলে তার থেকে বিরত রইলাম।

বইটির প্রুফ দেখে দিয়েছেন অনুজপ্রতিম অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। মুদ্রণ প্রমাদের বিভীষিকা থেকে বইটিকে মুক্ত রাখবার জন্য রফিক সাহেব ঐকান্তিকভাবে পরিশ্রম করেছেন। সংশোধনের কাজেও তাঁর অবদান রয়েছে। শুধু সৌজন্যের খাতিরে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর ঐকান্তিক সাহায্য দানকে ক্ষুণ্ণ করতে পারবো না।

Chunati.com Rendering image based website

জনাব এন. এম. খাঁ বুলবুল-জীবনী প্রকাশের ব্যাপারে ঐকান্তিক আগ্রহান্বিত। তাঁর সাহায্যে আমরা পাকিস্তান কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটির সঙ্গে সহজে যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরেছি। দেশের একজন মহৎ শিল্পীর প্রতি দেশের আর একজন দরদী কর্মীবন্ধুর অনুরাগ যে কত অকৃত্রিম হতে পারে জনাব এন. এম. খাঁ শিল্পীর জীবনী প্রকাশে সক্রিয় সাহায্য দানে তা প্রমাণ করেছেন, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সে কথা স্মরণ করছি।

পরিশেষে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটির ম্যানেজার জনাব বখতিয়ার সাহেবকে, যাঁর ব্যক্তিগত আগ্রহ ও সহায়তায় বইটির প্রকাশ সম্ভব হলো।

"বাফা" থেকে ও কোলকাতা থেকে প্রকাশিত (Souvenir) ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রচনা ইত্যাদি থেকে আমি যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি।

৩১-সি গার্ডেন রোড,
করাচী—৩
৫/৭/৬১

বিনীতা
সুলতানা রাহমান

Chunati.com
Pioneer in village based website

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

'বুলবুল-জীবনীর' ভূমিকা লেখা আমার পক্ষে একদিকে আনন্দের অন্যদিকে অত্যন্ত বেদনার। আনন্দের এ কারণে যে আমি ছিলাম বুলবুলের অনুরাগী—তাঁর মৃত্যুর, তার লেখার আর তাঁর প্রতিভার। আমার এই অনুরাগের কথা তাঁর মৃত্যুর পর আমি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছি। বেদনার কারণ বুলবুল বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট ছিলেন অথচ চলে গেলেন অনেক আগে। অবশ্য যেখানে গেলেন সেখানে তাঁর লাভ হলো অগ্রজের আসন। এ রকম সাংত্বনার প্রলেপে মন কিন্তু শান্ত হয় না—অকাল মৃত শিল্পীর জন্যে যে বেদনাবোধ তা মোটেও লাঘব হয় না এতে।

বুলবুলের মৃত্যুর পর প্রায় সাত বৎসর গত হয়ে চল্ল। এই পর্যন্ত পাকিস্তানের এই সর্বশ্রেষ্ঠ ও একমাত্র আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নৃত্যশিল্পীর জীবন ও শিল্প সম্বন্ধে কেউ-ই কোন উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেন নি। বুলবুল পাকিস্তানে নৃত্যশিল্পের যে ঐতিহ্যধারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যথাযথ আলোচনার সাহায্যে ভাষায় তাকে ধরে রাখার চেষ্টা না হলে কালস্রোতে হারিয়ে যেতে বাধ্য।

Ghurati.com
Pioneer in village based website

'বাফা'র মারফৎ তাঁর নামটা হয়ত বেঁচে থাকবে। কিন্তু স্বরচিত শিল্পছাড়া শিল্পীর নামের কতটুকুই বা মূল্য? রচনা বা সাহিত্য ছাড়া রবীন্দ্রনাথ বা নজরুল ইসলাম বা যে কোন রাম রহিমও তাই। শিল্পীর আয়ু নির্ভর করে তাঁর শিল্পকর্মের উপর আর তাঁর বেঁচে থাকার উপর। বুলবুলও বেঁচে থাকবেন তাঁর শিল্পের জন্যই। শিল্পে যে নতুনত্ব তিনি এনেছেন আর পাকিস্তানে নৃত্যশিল্পের যে ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন তার স্থায়ীত্বের উপরই নির্ভর করছে শিল্পী হিসেবে তাঁর নামের আয়ু ও মর্যাদা। পাকিস্তানের নৃত্য-শিল্পে তিনিই প্রথম। তাঁর শিল্পের পরিচয় ও তাঁর ইতিবৃত্ত যদি রচিত না হয়, আলোচনা ও বিশ্লেষণের মারফৎ তার মূল্যায়ন যদি না ঘটে তাহলে তার ইতিহাস একদিন অবলুপ্ত হতে বাধ্য। যে জীবনকে কেন্দ্র করে তাঁর তথা পাকিস্তানের নৃত্য-শিল্প গড়ে উঠেছে, হয়েছে রূপায়িত তার পরিচয় ছাড়া আমাদের নৃত্য-শিল্প সম্বন্ধে কোন ধারণই সুষ্ঠুতর হবে না। তাই বুলবুলের মানস-বিকাশ ও নৃত্য-শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁর ক্রম পরিণতি ও অবদানের ইতিহাস রচনা আর তা আমাদের

উদীয়মান ও অনাগত নবীন শিল্পীদের সামনে তুলে ধরা আমাদের এক গুরুদায়িত্ব। শুধু দায়িত্ব নয়, জাতীয় কর্তব্যও। কারণ একক বুলবুলই এদেশের নৃত্য শিল্পকে বিশ্বের নৃত্য-শিল্পের মানচিত্রে স্থান করে দিয়েছেন আর নিজেও একক সাধনার দ্বারা পৌঁছেছিলেন নৃত্য-শিল্পের উচ্চতম মানে। এত বড় শিল্প সম্বন্ধে এতকাল উল্লেখযোগ্য আলোচনা না হওয়ার আমাদের শিল্প-সংস্কৃতি চেতনার অভাব যে কতকখানি তাই সূচিত করছে।

সুখের বিষয় কিছুটা দেরিতে হলেও--বুলবুলের ছোট বোন কল্যাণীয়া সুলতানা রাহমান এই গুরুদায়িত্ব পালনে এগিয়ে এসেছেন। তাঁর ক্ষমতা হয়ত ক্ষুদ্র, একটি প্রতিভাধর শিল্পীর বিচিত্র জীবনকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য সাহিত্য রচনায় যে অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন তা হয়ত তাঁর নেই কিন্তু বুলবুলকে, বুলবুলের শিল্প-সাধনাকে অতি নিকট থেকে দেখার ও জানার সুযোগ তাঁর হয়েছে। শিল্পী বুলবুলের প্রস্তুতিপর্ব থেকে সাফল্য পর্ব অবধি সব কিছু তাঁর দেখা। ফলে শিল্পীর শিল্প জীবনের পরিচয় ও ব্যাখায় তাঁকে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়নি--বানাতে বা গড়ে তুলতে হয়নি কল্প-রাজ্যের "হিরো"। অনেক সময় এ রকম ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে। বইটির সর্বত্র একটা ঘরোয়া আবহাওয়া ও অন্তরঙ্গতার স্পর্শ পাওয়া যায়।

Chunati.com
Pioneer in village based website

প্রতিভাবান শিল্পীদের দু'টো ভূমিকা ঃ এক, নতুন সৃষ্টি করা, দ্বিতীয়ত, পুরানো ও মৃত ঐতিহ্যে প্রাণদান করা, তাকে বাঁচিয়ে তোলা। ভারতের উদয় শঙ্কর, রামগোপাল প্রভৃতি শিল্পীরা রামায়ণ মহাভাতর হিন্দু পুরাণ ইত্যাদির অজস্র কাহিনী ও ঘটনাকে তাঁদের নৃত্যের মাধ্যমে আবার সজীব তুলেছেন। কবেকার হারিয়ে যাওয়া কাহিনীকে উদয়শঙ্কর তাঁর "রামলীলা" নৃত্যে শুধু দেহের ছন্দে, নাচের ভঙ্গী আর মুদ্রায় দর্শকদের সামনে জীবন্ত করে তুলে ধরেছেন। এইখানেই শিল্পীর সার্থকতা ও প্রতিভার পরিচয়-এক নতুনকে সৃষ্টি করা আর একদিকে মৃতকে জীবন দেওয়া। বুলবুলও যুগপৎ একাজ করেছেন। মুসলিম ইতিহাসের বহু ঘটনা ও কাহিনী—"যা কেউ কোন দিন নাচের বিষয় হতে পারে ভাবেনি বুলবুলের হাতে তাই অপরূপ নৃত্য হয়ে রূপায়িত হয়েছে। বুলবুলের আগে কি ভাবতে পেরেছিল কবি হাফেজকে নিয়ে সোহরাব রুস্তম বা চাঁদ সোলতানকে দিয়ে অথবা আনারকলির বিয়োগান্ত ঘটনা নিয়ে এমন আশ্চর্য নৃত্য রচনা সম্ভব? তাঁর কল্পনাশ্রয়ী নৃত্যের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়—প্রেরণা বা কবি প্রতিভা উন্মেষ, জীবন-মৃত্যু প্রতিভা নাচগুলো এই পর্যায়ের। মনে হয় একটা

ক্ষেত্রে বুলবুল উদয়শঙ্করকেও ছাড়িয়ে গেছেন। বুলবুল ছিলেন মনে প্রাণে প্রগতিশীল। তাঁর লেখায় যেমন রয়েছে তেমনি তাঁর নৃত্য পরিকল্পনায়ও রয়েছে প্রগতির সব রকম লক্ষণ। উদয়শঙ্কর চলতি বা সাময়িক কোন ঘটনাকে নিয়ে নৃত্য রচনা করেছেন কিনা জানি না বুলবুল কিন্তু সাময়িক ঘটনাকেও নৃত্যে রূপায়িত করেছেন—যেমন 'মন্বন্তর'। এই নাচে তাঁর প্রগতিশীল আদর্শবাদ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সাময়িক বা চলতি ঘটনাবলম্বনে সার্থক গল্প উপন্যাস নাটক লেখা যেমন কঠিন তার চেয়ে কঠিন সাময়িক ঘটনাকে নাচে রূপায়িত করা। তাঁর স্বাভাবিক প্রতিভার সঙ্গে প্রগতিশীলতার মিলন ঘটেছিল বলেই বুলবুলের পক্ষে এই অসাধ্য সাধন সম্ভব হয়েছে। ইতিহাসের পাতায় হারিয়ে যাওয়া বহু ঘটনাকে নৃত্যের মাধ্যমে পুনর্জীবন দান, নৃত্যের নব নব রূপ কল্পনা আর সাময়িক ঘটনাকে নৃত্যে রূপদান—এই তিন ক্ষেত্রে বুলবুলের অবদান স্মরণীয় ও বিচার্য।

পাকিস্তান নতুন দেশ। তার সাহিত্য ও শিল্পের ঐতিহ্য এখনো শৈশবাবস্থায়। বিশেষ করে উচ্চাঙ্গের রুচিসম্মত আধুনিক নাচের কোন ঐতিহ্যই এখানে ছিল না, আর মুসলিম-প্রধান দেশ বলে নৃত্যের আবহাওয়া ও পরিবেশও ছিল না তেমন অনুকূল। এমন অবস্থায়, তৈয়ারী শিল্পীর অভাবে, ধারকরা শিল্পীগোষ্ঠী নিয়েই বুলবুলকে আসরে নামতে হয়েছে। একদিকে নৃত্য-পরিকল্পনা বা কম্পোজ করে তাঁকে মঞ্চে রূপায়ণ অন্যদিকে শিল্পী তৈয়ারী করা যুগপৎ এই দুই দুঃসাধ্য দায়িত্ব তাঁকে পালন করতে হয়েছে। কিছু না থেকে যেমন আমাদের রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে, তেমনি কিছু না থেকেই বুলবুলকেও এদেশে নৃত্যের ঐতিহ্য গড়ে তুলতে হয়েছে। যতদিন বেঁচে ছিলেন এই দায়িত্ব পালনে তিনি এতটুকু শৈথিল্যের পরিচয় দেননি।

নৃত্য-শিল্পের ক্ষেত্রে পাকিস্তানে বুলবুল যে অগ্রদূত ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বুলবুল একাধারে নৃত্যশিল্পী ও নৃত্য রচয়িতা বা কম্পোজার। তাঁর রচিত নাচগুলো এখনো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। 'নোটেশনের' মাধ্যমে কোনটাই রেকর্ড করা নেই। শুধু কাহিনী বা বিষয়বস্তুরই কিছুটা করে পরিচয় পাওয়া গেছে। এখন থেকে সাবধান না হলে ভবিষ্যতে কেউ কেউ বুলবুলের নাচ বিশেষকে হয়ত তাঁদের নিজের 'কম্পোজিসন' বলে দাবী করে বসবেন। এখনই নাকি কোথাও কোথাও এমন দাবীর কথা শোনা গেছে। এই বইতে বুলবুলের রচিত অনেকগুলো নাচের পশ্চাৎভূমি ও প্রমাণ একত্রিত করা হয়েছে। বুলবুলের

Chunati.com

অধিকাংশ নাচের প্রামাণ্য দলিল হিসেবেও এই বইটি সুধীজনের স্বীকৃতির দাবী রাখে।

বুলবুল-জীবনের সব তথ্য ও তত্ত্ব এখনো সংগৃহীত হয়নি। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও কোলকাতায় তাঁর জীবনের বহু ঘটনা ও উপকরণ ছড়িয়ে আছে। এছাড়া পাক-ভারতে ও ইউরোপের বহু শহরে ও নগরে তাঁর শিল্পীদল নিয়ে বুলবুল সফর করেছেন। পূর্ব পাকিস্তানের এমন জেলা নেই যেখানে বুলবুল সদলে যাননি ও তাঁর নৃত্যের শো দেখাননি। এসব সফরে বিস্তৃত পরিচয় এখনো অলিখিত। সবক্ষেত্র থেকে সম্ভাব্য সব উপকরণ জোগাড় হলে তবেই বুলবুলের পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখা ও তাঁর শিল্পের যথাযথ পরিচয় দেওয়া সম্ভব হবে। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন এই বইখানাই আমাদের যথালাভ ও একমাত্র অবলম্বন মনে করতে হবে বুলবুল-জীবন ও তাঁর শিল্প সম্পর্কে. বলাবাহুল্য সুলতানা রাহমান এ ক্ষেত্রে পথিকৃৎ অর্থাৎ Pioneer। নিঃসন্দেহে পায়োনিয়ারের গৌরব তাঁর প্রাপ্য। কত হাজারো অসুবিধা ও অন্তরায় ডিঙ্গিয়ে একজন সংসার গৃহিণীকে অবসরের ফাঁকে ফাঁকে এমন একটা কষ্টসাধ্য কাজ করতে হয়েছে তা মনে রাখলে লেখিকার ত্রুটি-বিচ্যুতি পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয়ই ক্ষমা করতে পারবেন, যদি কোথাও তা তাঁদের নজরে পড়ে। লেখিকা শুধু ভ্রাতৃ অনুরাগেই এই বই লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছেন, একথা মনে করলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে—ভ্রাতৃ অনুরাগের সঙ্গে সঙ্গে এ বইতে লেখিকার নিজের শিল্পী-প্রীতি ও অকৃত্রিম শিল্পানুরাগও মিশে রয়েছে।

সাহিত্য নিকেতন,   আবুল ফজল
চট্টগ্রাম,
১৮/৭/৬২

প্রথম পরিচ্ছেদ

এক

কাঠ ফাটা এক বৈশাখের দুপুর। ঝাঁ ঝাঁ করছে তেতে ওঠা রোদের প্রচণ্ডতা। ঘরে বাইরে বিরাজ করছে নিঝঝুম নিস্তব্ধতা। ভরদুপুরের এই অখণ্ড নীরবতা ভেঙে দিয়ে হঠাৎ অদূরে কেয়া ঝোপের দিকে সাপুড়ের বাঁশী বেজে উঠলো। কে এক বেদে কেয়া ঝোপে সাপের সন্ধান পেয়ে প্রাণপণে ফুঁ দিচ্ছে তার বাঁশীতে। বাঁশীর সুরে মুগ্ধ করে সাপটাকে গর্তের বাইরে টেনে এনে বাঁধবে তার ঝাঁপিতে—এই হলো তার মতলব। সেই বাঁশীর সুরে সাপের মনে কি ভাবের উদয় হলো বলা যায় না। তার মনে কোনো সাড়া জাগলো কি-না তাই বা কে জানে। একটি কিশোর মনে কিন্তু বাঁশীর সেই সুর প্রচণ্ড এক দোলা জাগালো। কিশোরটি দেখতে ফুটফুটে সুন্দর। বয়স বোধ হয় তখন বছর পনর। যেমন চেহারা তেমনি ডাগর দু'টি চোখ। চোখ পড়লে চোখ আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। দুপুর বেলা রূপকথার বই হাতে নিয়ে হয়তো সে আপন মনে কল্পনার জাল বুনছিলো, হয়তো খোলা তলোয়ার হাতে পক্ষিরাজের পিঠে সোয়ার হয়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে উড়ে যাচ্ছিলো, সে কোন 'মায়া পাহাড়ে'র দেশে। বেদের বাঁশীর সুর তাকে পক্ষিরাজের পিঠ থেকে টেনে নামালো ধুলোর পৃথিবীতে। ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো বারান্দায়। উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলো বাঁশীর সুর। মন-পাগল-করা সুর ভেসে ভেসে আসছে কেয়া ঝোপ থেকে। তখন আর এক খেপা স্বপ্ন এসে জুড়ে বসলো তার দুটি চোখে। কি সেই স্বপ্নের রূপ, সে দিন সে তা ধরতে পারলো কি-না কে জানে? মন কিন্তু তার সুরে দোল খেয়ে কেঁপে কেঁপে উঠলো। সে যাবে ওই সাপ ধরা দেখতে—নিশ্চয় যাবে সে—কিন্তু বিপত্তি ঘটালো ছায়ার মত তার কাছে কাছে থাকা ছোট বোনটির আচমকা আবির্ভাবে। যে বোন

Chhunati.com
Pioneer in village based website

একাধারে তার বন্ধু ও শত্রু। বোনটিও কম অবাক হয়নি। উৎসুক কণ্ঠে বললো : ও কিসের বাঁশী ভাই ?

: একটু দাঁড়া, আমি দেখে আসি—বলার সঙ্গে সঙ্গে যাবার জন্য পা' বাড়ালো। খুকু ছোট্টটি হলেও তার মনে কিন্তু কৌতূহল কম ছিলো না।

: উঁহু, সে হবে না ভাই, আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।

: আরে না, না তোর গিয়ে কাজ নেই, দেখছিসনে বাইরে কি রকম রোদ্দুর ? বরং আগে আমি গিয়ে দেখে আসি, এক দৌড়ে ফিরে এসে বলবো তোকে কি দেখলাম সব—কেমন ?

: উঁহু, সে হবে না। আমায় না নিয়ে গেলে এক্ষুণি মাকে বলে দেবো কিন্তু—আর তখন বাইরে যাবার মজাটা টের পাবে ভালো করে। কিন্তু বেদের বাঁশী যে কিশোরের মন কেড়েছে। তাই সন্ধি হলো শেষ পর্যন্ত। বোনের হাত ধরে বললো : চল তা হলে চুপি চুপি।

তাদের বাসার উঠানটা কোন রকমে পা টিপে টিপে পেরিয়ে দু'জনে অমনি ছুটতে আরম্ভ করলেন। ছুটে যে নয়—বোনকে নিয়ে তিনি যেন পক্ষিরাজের পাখায় পাখায় উড়েই গেলেন। এক ছুটে কেয়াবনে এসে তবেই থামলেন তিনি।

Chunati.com Pioneer in village based website

দু'জন বেদে বাঁশীতে ফুঁ দিতে দিতে ঢুকেছে কেয়াবনে। মাঝে মাঝে কি যেন সব মন্ত্রও পড়ছে তারা। তাদের দলের অন্য সবাই দাঁড়িয়ে আছে কেয়া-বনের বাইরে—একটা টিপির ওপর। সেই টিপির ওপর থেকেই বোনের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি দেখলেন বেদের কাণ্ড। মাথা দুলিয়ে, গা' দুলিয়ে ছন্দে ছন্দে একটানা বাঁশী বাজিয়েই চলেছে সাপুড়ে দু'জন। কিন্তু দুত্তোর ছাই—এতদূর থেকে কি দেখা যায় কিছু, না মজা করা যায় কোনো ? অস্থির হয়ে উঠলো কাছে যাবার জন্য—তারপর যেন অন্য কোন স্বপ্ন-জগতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে একপা একপা করে। তেমনি ভাবে ঝোপের মধ্যে ঢুকতে গিয়ে আবার বাধা এলো পেছন থেকে। খুকু যেতে দেবে না তাঁকে—ভাইয়ের হাত চেপে ধরে চীৎকার করে উঠলো : না না ওই ঝোপের মধ্যে যেও না ভাই—সাপ বেরুবে এক্ষুণি, কামড়ে দেবে।

: দূর বোকা, সাপ কি আর সবাইকে কামড়ায় কখনো?

অদ্ভুত কথা! সাপ নাকি সবাইকে কামড়ায় না! সাপ যে তাঁর বন্ধু নয় এবং সামনে যাকেই পাবে তাকেই যে মরণ-ছোবল মারবে সে কথাটাও জানেনা না! জানুক আর না জানুক তাকে ধরে রাখা গেল না। কেয়াবনে গিয়ে ঢুকলেন তিনি। খুকুর কান্না, নিষেধ, কিংবা বেদেদের স-চীৎকার হুশিয়ারি কিছুই তাঁর পথ আগলাতে পারলো না। কিছুক্ষণ পর সাপ ধরার নিষ্ফল প্রচেষ্টায় ক্ষুব্ধ বেদেদের সাথে তিনিও বেরিয়ে এলেন। খুকু কিন্তু ইতিমধ্যে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে গেছে বাড়িতে—বাবা মাকে বলে দিতে ভাইয়ের এই খেপামির কথা।

ব্যস্ত ব্যাকুল হয়ে বাবা এলেন লোকজন নিয়ে, কিন্তু তিনি তখন বেদেদের পেছনে বাঁশীর সুরে পাগল হয়ে চলে গেছেন অন্য কোনো দিকে—কিন্তু কোন দিকে? ঘরে কান্নাকাটির রোল উঠলো। আর এদিক ওদিক লোক ছুটলো বেদেদের সন্ধানে। আতঙ্কে, ক্রোধে অর্ধমৃত বাবা শুধু বেপরোয়া আদেশ দিচ্ছেন—যে বেদেরা আমার পরাণ মানিককে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে তাদের ধরে নিয়ে এসো যেখানে পাও, ওরা সব ডাকাত, কঠোর শাস্তি দেবো ওদের - - - -।

এমন সময় নাটকীয় ভাবেই সকল আতঙ্ক উদ্বেগের শেষ হলো। পরিচিত এক ভদ্রলোক বেদের পেছনে-ধাওয়া সেই কিশোর পাগলকে ধরে নিয়ে এসেছেন জোর করে। ছেলেকে ফিরে পাওয়ায় বাবার দু'চোখ ভরে উঠলো আনন্দাশ্রুতে। মূর্চ্ছিতপ্রায় মাও যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। খুকু, সুলু সাতরাজার ধন ভাইটিকে ফিরে পেয়ে চোখের পানি মুছে হেসে উঠলো খিল খিল করে।

কিন্তু বেদেরা? ছেলে ভুলিয়ে নিয়ে যাবার শাস্তি দেওয়া হবে না তাদের? হাঁ দিতে হবে বৈ কি, ধরে আনো বেটাদের——বাবারই হুঙ্কার। তাদের ধরে আনার সম্ভাবনা দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সকলকে অবাক করে দিয়ে সেই কিশোর পাগলই বাধা দিয়ে বসলেন: আব্বা, বেদেদের কেনো ধরে আনবে? ওরা তো কোনো দোষ করেনি, ওরা আমায় ধরে নিয়ে যায়নি। বাঁশী শুনতে শুনতে আমি নিজেই গিয়েছিলাম ওদের সঙ্গে। ওরা আমায়

Chunati.com Pioneer in village based website

অনেক বার নিষেধ করেছিলো আব্বা। ওদের তো কোন দোষ নেই! কেনো তবে শাস্তি দেবেন ওদের?

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন বাবা। ছেলের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন একদৃষ্টে কিছুই বললেন না, বলতে পারলেন না। হয়তো ভাবতে লাগলেন ছেলে সম্বন্ধে, তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে! মনে মনে হয়তো খুশী হলেন ছেলের ন্যায়-বুদ্ধি দেখে! বাবার একখানা হাত ছেলেটির মাথায় রাখলেন।

দুই

বুলবুলের পিতা মরহুম আজমউল্লা সাহেবের কর্মস্থল ছিল বগুড়ায়। ১৯১৯ সালের পহেলা জানুয়ারি বুলবুলের জন্ম। সুস্থ, সুন্দর, ফুটফুটে একটি ছেলে। দেখলেই ইচ্ছে করে একটু কোলে নিয়ে আদর করতে। টানা টানা চোখ দু'টি সব সময় যেন হাসছে—ছড়াচ্ছে হাসির কিরণ। প্রশস্ত কপাল, ঘন কালো চুল, রাঙা গায়ের রঙ আর সুন্দর স্বাস্থ্য। সব মিলিয়ে বড় সুন্দর ছেলেটি। যেন একটি সুন্দর কবিতা। মা আর বাবার চেহারার অপূর্ব সমন্বয়! দু'য়ের আদল এসে মিশেছে এক মোহনায়!

Ghurati.com Pioneer in village based website

বুলবুলের ছেলেবেলাকার ডাক নাম ছিলো 'টুনু'। ছেলেবেলা থেকে তিনি ছিলেন অস্বাভাবিক রকম চঞ্চল। সেই চাঞ্চল্য এত বেশী যে, তা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। একটুখানি সময়ও স্থির হয়ে থাকতে পারতেন না। শিশুসুলভ দুষ্টুমির মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেও, তাতে নষ্টামি ছিলো না বলে টুনুর দুষ্টুমিতে বিরক্ত হতো না কেউ-ই। বাবার এক বন্ধু ছিলেন, পূর্ণেন্দু গোস্বামী, ভদ্রলোক টুনুর কচি মুখখানার দিকে গভীর স্নেহে চেয়ে বলতেন: টুনু আমাদের রূপকথার রাজপুত্র, ওর দিকে চাইলে দু'চোখ জুড়ায়। কলালক্ষ্মী যেন ওর কপালে জয়তিলক এঁকে দিয়েছেন! উত্তরকালে এই ছেলে যশস্বী না হয়ে যায় না। তোমরা দেখে নিও আমার কথা সত্যি কি-না। নিছক স্নেহের খাতিরে পূর্ণেন্দু বাবু এই ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিলেন কি-না জানি না।

জানি না তিনি আজও বেঁচে আছেন কি-না। থাকলে, নিশ্চয় দেখে খুশী হয়েছেন—তাঁর ভবিষ্যৎ-বাণী কি ভাবে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে উঠেছে।

সাত আট বছর বয়স পর্যন্ত, টুনু এক দরিদ্র সদবংশজাত খিলাই-এর পরিচর্যায় ছিলেন। টুনুর শিশু জগতে স্নেহময়ী 'খিলাইটি' ছিলো এক অদ্ভুত সঙ্গী। তাঁকে ছেড়ে থাকতে পারতেন না এক মিনিটও। তাদের পরিবারে খিলাইটি পরিচারিকা হওয়া সত্ত্বেও দাদী-নানীর মতোই সম্মান পেয়ে এসেছেন সব সময়। বগুড়ার কোনো এক গৃহস্থ ঘরের কন্যা ও ঘরণী ছিলেন তিনি। পরে ভাগ্য-বিপর্যয়ে, স্বামী, পুত্র, বিষয়-সম্পত্তি সব হারিয়ে জীবন-মৃতা হয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময়, টুনুর জন্মমুহূর্তে সূতিকা ঘরে তাঁর ডাক পড়ে। হাতে চাঁদ পাবার মতো, খুশী হয়ে তিনি এসে দাঁড়ালেন নবজাত শিশুটির পাশে। তারপর টুনুকে বুকে তুলে নিয়ে, সন্তান-শোকের জ্বালা ভুলতে চেষ্টা করলেন। চেষ্টা তো নয়—সে যেন সাধনা। সেই সাধনায় তিনি কতটুকু সিদ্ধি লাভ করেছিলেন, তা তিনিই জানেন। তবে টুনুকে বুকে তুলে নেবার মুহূর্ত থেকে, প্রায় ছয় সাত বছর পর্যন্ত, শোকের ভারে মুখ নিচু করে বসে থাকতে তাঁকে কেউ দেখেনি। বরং দেখা যেতো—এটা সেটা নিয়ে টুনুর সঙ্গে কলহাস্যে দিব্বি মেতে আছেন। বিস্মৃতির অতলে এই দুঃখী নারীটিকে কোনদিন হারিয়ে যেতে দেয়নি টুনু।

Chunati.com
Pioneer in village based website

টুনু তাঁর খিলাইকে 'ভট্টি' বলে ডাকতেন। বোল ফুটবার সময় কেনো জানি না, শিশুর মুখ থেকে অতি সহজে, আপনা থেকেই, এই অদ্ভুত শব্দটি বেরিয়ে পরে ছিলো। টুনুর মুখে 'ভট্টি' ডাক নাকি খুব মিষ্টি শোনাতো। তাই খিলাই আর বদলাতে দেয়নি এই ভট্টি ডাকটি।

বড় হয়েও, বুলবুল কোনদিন দরদী 'ভট্টি'কে ভোলেননি। নিজের শিল্পীদল নিয়ে, প্রথমবার বুলবুল বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে নৃত্যনাট্য প্রদর্শন করেন ১৯৫০-৫১ সালে। সে সময় নানা জেলা ও মহকুমা ঘুরে, নিজের জন্মস্থান বগুড়ায় এসে হাজির হন। বগুড়ার মাটিতে পা দিয়ে, সর্বপ্রথম যে ছোট্ট শব্দটি বুলবুলের মনের নিভৃতে অনুরণন তুলেছিলো—সে শব্দটি হলো 'ভট্টি'। বুলবুলের বয়স যখন নয় দশ বছর তখন তার ভট্টি এই পৃথিবীর মায়া কাটায়।

ভট্টি নেই সত্য, কিন্তু বগুড়া তো আছে। আর আজও যে বগুড়ার অনেক কিছুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে ভট্টির স্মৃতিও জড়িয়ে রয়েছে বুলবুলের মনে। শিল্পীদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করে, ম্যানেজারকে স্টেজের ব্যবস্থাপনার তদারক করতে পাঠিয়ে, এক ফাঁকে বুলবুল একাকী বেরিয়ে পড়লেন ভট্টির সমাধির খোঁজে। যারা সংবাদ দিতে পারবে বলে মনে হয়েছে, সে রকম অনেকের সঙ্গে দেখা করেও কোনো লাভ হলো না। কেউ কোনো সন্ধান দিতে পারলো না— সেই নিঃস্ব দুঃখিনী নারীর শেষ স্মৃতি চিহ্নটুকুও কালের নিষ্পেষণে পৃথিবী হতে নিঃশেষে মুছে গেছে! বুলবুল কি করে তার খোঁজ পাবেন। কাজেই অতল নিরাশা নিয়েই তাঁকে ফিরতে হলো। শিল্পীজীবনের সাফল্যের এক গুচ্ছফুল রাখতে পারলেন না সেই স্নেহপ্রাণ ভট্টির সমাধি শিয়রে!

Chunati.com
Pioneer in village based website

তিন

হাওড়ার এক প্রাইমারী স্কুলে ১৯২৩-২৪ সনে সাড়ে চার-পাঁচ বছর বয়সে টুনুর বিদ্যা-শিক্ষা আরম্ভ হয়। মুসলিম পরিবারের রেওয়াজ অনুসারে বাড়িতে মৌলভী সাহেবের কাছে তিনি আরবী ও উর্দু পড়তেন আর স্কুলে পড়তেন বাংলা ও ইংরেজী। কিন্তু তাতেও চঞ্চলমতি টুনুকে ধীর স্থির করতে পারেনি। চঞ্চলতা বরং দিন দিন আরো বেড়ে চললো। দুষ্টুমিতে সমবয়সীদের ছাড়িয়ে গেলেন। কিন্তু সচিত্র গল্পের বই পেলে, সব রকম দুষ্টুমি ভুলে তিনি অস্বাভাবিক গম্ভীর মূর্তি ধরে বইয়ের পাতায় এমন ডুব মারতেন যে তাঁর আর সাড়াই পাওয়া যেত না।

সেই সময়কার কথা—নিজের ঘরে বাবা একদিন কি একটা বই নিয়ে মগ্ন ছিলেন। তারই মধ্যে হৈ চৈ করে টুনু এসে ঢুকলেন সেই ঘরে। নাটাই, লাট্টু, গুলী গুলতি খেলার সাজ সরঞ্জামগুলো একধারে ফেলে রেখে, শেলফের কাছে দাঁড়িয়ে বইগুলোর নামের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন অনেকক্ষণ ধরে। কয়েকটা বইয়ের নামও পড়লেন বানান করে করে। তারপর ছেলেমানুষের

স্বাভাবিক কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : আচ্ছা আব্বা, এই যে এত সব বই—কি লেখা আছে এতে ?

দুরন্ত ছেলেটির মুখে এই ধরনের প্রশ্ন শুনে বাবা চশমা খুলে তার দিকে তাকালেন। তারপর হাত বাড়িয়ে ছেলেকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন : ও সব বইতে অনেক কিছু লেখা আছে বাবা—ভালো ভালো মানুষের কথা, দেশ-বিদেশের কথা, বীর যোদ্ধাদের কথা, রাজপুত্র আর ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর কথা। সে অনেক কথা, অনেক গল্প বাবা, কিন্তু তুমি তো এসব পড়বে না শুনবেও না—সারাদিন কেবল লাট্টু, নাটাই নিয়ে হৈ চৈ করে বেড়াবে—কেনো তবে ও কথা জিজ্ঞেস করছো ?

বাবার কথা শুনে টুনু গম্ভীর হলেন, তারপর ঠোঁট ফুলিয়ে একটু বা মুরব্বি চালে বললেন : যারা খেলা করে, তারা বুঝি এ সব বই পড়তে পারে না ? কিন্তু আমিও যে পড়তে চাই—সত্যি আব্বা, এ সমস্ত বই আমি একদিন পড়বো-ই। চঞ্চলমতি বালকের কণ্ঠ নিঃসৃত সেই 'পড়বো-ই' যেন তার জীবনের প্রথম সূর্য-দীপ্ত শপথবাণী। একদা বালক টুনু, কথাচ্ছলে পিতার সম্মুখে যে শপথ উচ্চারণ করেছিলেন, তা কিন্তু এক অবোধ বালকের কথার কথায় পর্যবসিত হয়নি বরং সেই শপথের সত্যতা ও দৃঢ়তা, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চরিত্রে প্রকটতর হয়ে উঠেছিলো। এবং পরবর্তীকালে তাঁর শিল্পীজীবনের সাফল্যের পথে, সেই দৃঢ়তার দান ছিলো সবচেয়ে বেশী। পড়া এবং নৃত্য ছিলো তাঁর জীবনের দুই নেশা। পড়া তাঁকে জুগিয়েছে নতুন নতুন ভাব ও কল্পনা—যা রূপায়িত হয়েছে নৃত্যে, নব নব রূপ-কল্পে, ছন্দে ও তালে।

Chunati.com
Pioneer in village based website

ছেলেবেলায়, নিজের উদ্ভাবিত অনেক রকম খেলাধূলা নিয়ে মত্ত থাকতেন টুনু। সে সব খেলার, এক একটি বিশেষ নামকরণও করেছিলেন। তার মধ্যে একটি প্রিয় খেলার নাম ছিলো 'রেলরেল' খেলা। ছোট দুটি বোন, স্কুলের সহপাঠি-বন্ধু আর প্রতিবেশীদের দু'চারজন ছেলেমেয়ে ছিলো টুনুর রেলরেল খেলার সাথী। খড়িমাটি দিয়ে, প্রশস্ত আঙিনায় দাগ কেটে তৈরী হতো রেল লাইন। লাইনের ওপর সঙ্গী-সাথীরা 'এ্যাটেনশন' হয়ে দাঁড়াতে।

আর টুনু দাঁড়াতেন সকলের সামনে। তিনি পেছনে দাঁড়াবেনইবা কি করে—তিনি যে 'বেগবান' এক ইঞ্জিন! ইঞ্জিনের একটানা তীব্র হুইসেল বেজে উঠলে, হুস হুস করে সেই জীবন্ত রেলগাড়ীখানা চলতে শুরু করতো। চলতো কখনো সোজা হয়ে, কখনো এঁকেবেঁকে, কখনো ধীরে, কখনো দ্রুত থেকে দ্রুততর বেগে। এমনি ভাবে ইঞ্জিন ও 'বগীগুলো' ক্লান্ত হয়ে না পড়া পর্যন্ত তারা কোথাও থামতো না। টুনুর সেই 'রেলরেল' খেলার মধ্যে একটা গতি, একটা ছন্দ, একটা মত্ততা ছিলো। বাবা তখন আসানসোলে রেলওয়ে পুলিশ ইনস্পেক্টার। কতদিন টুনু ট্রলিতে করে ফাঁকা রেল লাইনে ঘুরে বেড়িয়েছে। ট্রলির ধাতব শব্দ, মুক্ত বাতাসের হু হু শ্বাস আর অবাধ গতির উন্মাদনায় টুনু বিহ্বল হয়ে পড়তেন, হয়তো তারই বিকল্প হিসেবে এই অদ্ভুত 'রেলরেল' খেলা তাঁর এত প্রিয় ছিলো।

অন্যান্য খেলার মধ্যে, ঘুড়ি ওড়ানোর দিকে টুনুর ঝোঁক ছিলো অত্যন্ত বেশী। ঘুড়ি কাটাকাটি কিন্তু একটুও পছন্দ করতেন না তিনি। তিনি দেখেছেন তাঁর সমবয়সীরা ঘুড়ি কাটাকাটি নিয়ে ঝগড়া করে। অনেক সময় আবার মারামারিও করে। ঘুড়ি ওড়ানো পছন্দ করলেও, ঘুড়ি কাটাকাটি তাই বোধ হয় তিনি পছন্দ করতেন না মোটেও। তাই নিজের দলবল নিয়ে, দূরে কোনো ফাঁকা মাঠে চলে যেতেন—যেখানে ঘুড়ি কাটাকাটির বালাই নেই। তারপর নিজের ঘুড়িখানা আকাশে তুলে দিয়ে তিনি মনের আনন্দে শুধু সূতোই ছাড়তেন, যতক্ষণ না শেষ হতো নাটাইয়ের সূতো। ঘুড়ি যত ওপরে উঠতো টুনুর চঞ্চলতাও কমে আসতো। ঘুড়ি উড়ুক—আরো ওপরে—আরো অনেক ওপরে আকাশ-সমুদ্র হারিয়ে যাক তাঁর ওই ছোট্ট ঘুড়িখানা! তাতেই তিনি খুশী।

যখন অনেক অনেক ওপরে উঠে যেতো ঘুড়িখানা, তখন সব কিছু ভুলে, অবাক বিস্ময়ে টুনু চেয়ে থাকতেন সেই ঘুড়ির দিকে—আর কি যেন ভাবতেন গভীর ভাবে। কি ভাবতেন কে জানে। কেউ কোনোদিন জানতে পারেনি তিনি অমন করে কি ভাবতেন অনেক ওপরে উঠে যাওয়া, সেই ছোট্ট ঘুড়িখানার দিকে চেয়ে। সবাই দেখেছে, বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ওপরের

Ghunati.com Pioneer in village based website

দিকে তাকিয়ে আছেন শুধু। একে চপলমতি বালকের নিতান্ত একটা খেয়াল বলা চলে কিনা জানি না, তবে তার চোখে সেই বিস্ময় ঘোরের সঙ্গে, তুলনা দেবার কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না। টুনু হয়তো মনে মনে উড়ে যেতেন ওই ঘুড়ির দেশে—আর সেখান থেকে চেয়ে দেখতেন, সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে পারে মানুষের বিচিত্র সমাবেশের মধ্যে কোথায় সেই রূপকথার রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র আর কোথায় বা সেই সাত মহলের পাষাণপুরী! সেই ছেলেবেলায় মাঝে মাঝে টুনুকে খুঁজে পাওয়া যেতো না, পরে দেখা যেতো—স্টেশনের এক কোণায় দাঁড়িয়ে তিনি মানুষের আনাগোনা দেখছেন। আসানসোল বিরাট একটি জংশন স্টেশন। ভারতের বিভিন্ন জায়গার বিচিত্র মানুষ ট্রেনে যাওয়া আসা করে—বিচিত্র ওই জনসমাবেশে টুনু কি দেখতেন জানি না, তবে ওই জনতা তাঁকে বার বার ঘরছাড়া করছে।

Chunati.com
Pioneer in village based website

চার

সেই ছেলেবেলা থেকেই, টুনু সব সময়, সব জায়গায় নিজস্ব একটি দল নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, নিজেই ছিলেন দলের সরদার। দলের অন্য সকলেও সানন্দে তাঁকে নেতা বলে মেনে নিতো। বিনাবাক্যে টুনুর আদেশ পালন করতো। শুধু তাই নয়—তার হাবভাব আচার-আচরণ পর্যন্ত অনুকরণ করবার চেষ্টা চলতো তাদের মধ্যে। দলের অন্যান্য ছেলের মধ্যে কখনো কখনো ঝগড়াঝাটি, মারপিট যে না হতো তা নয়। সে রকম অবস্থায়, টুনু বেশ মুরব্বির মতো বক্তৃতা শুরু করে দিতেন : ঝগড়াঝাটি করবে না। মিলেমিশে থাকবো। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করলে আমাদের দলই তো ভেঙে যাবে। তারপর ঝগড়া মিটিয়ে দিতেন তাঁর স্বাভাবিক নেতৃত্ব ও ন্যায়-বুদ্ধি দিয়ে। প্রয়োজন বোধে, বিবাদ মিটাবার জন্য অন্যের হয়ে নিজেই নতি স্বীকার করতেন, ক্ষমা চাইতেন। আর বাবার কাছে শেখা নীতিকথা শোনাতেন বন্ধুদের : 'ক্ষমা মহত্বের লক্ষণ'। 'যে নিজের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চাইবে তাকে

ক্ষমা করতেই হবে'। বন্ধুদের মধ্যে যার কাছে ক্ষমা চাওয়া হলো, সে তখন লজ্জিত হয়ে চুপ করে থাকতো। সাংস্কৃতিক নেতা না হয়ে, বুলবুল রাজনৈতিক নেতাও হতে পারতেন—সে সব গুণই ছিলো তাঁর মধ্যে। কিন্তু বুলবুলের যে জন্ম হয়েছিলো সাংস্কৃতিক দূত হিসেবে। দেশের মানুষের সামনে নতুন আলো তুলে ধরবার জন্য। তাই, রাজনীতি তাঁকে তেমন আকর্ষণ করতে পারেনি।

বড় হয়ে যাঁরা খ্যাতিমান হন, ছেলেবেলায় অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা নাকি একগুঁয়ে হয়ে থাকেন। মনীষীরা এ'কথা বলে থাকেন। ছেলেবেলায় টুনুও ভীষণ একগুঁয়ে ছিলেন। সেই বয়সে যখনই কিছু করবার বা পাবার জন্য গোঁ ধরেছেন, তখনই তা করেছেন, অথবা আদায় করে নিয়েছেন। একবার গোঁ ধরলেই হলো। তখন শত যুক্তি, প্রবোধ বা হুমকীতেও টুনু তাঁর গোঁ ছাড়তেন না। তাঁর একগুঁয়েমীর দরুণ অনেক সময় বিচিত্র ঘটনাও ঘটেছে। এবং সে সব ঘটনার প্রত্যেকটিতেই টুনুর ব্যক্তিত্ব ও স্বকীয়তাই ফুটে উঠেছে।

একদিন দুপুরে মা ছেলেমেয়েদের ভাত খাওয়াতে বসিয়েছেন। এমন সময় বাইরের সদর দরজা থেকে, কাতর কণ্ঠের ডাক শোনা গেলো: মাগো, চাট্টি ভাত দেবে মা, সকাল থেকে কিছুই যে খাইনি! চাকরটাকে ডেকে, মা বলে দিলেন ওই লোকটাকে বাইরের বারান্দায় বসিয়ে, ভাত-তরকারি যেন খেতে দেওয়া হয়। মা যা বললেন, টুনু শুনলেন চুপচাপ। তারপর হাতের গ্রাস পাতে রেখে, গম্ভীর ভাবে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন: কেনো শুধু ভাত তরকারি দেবে মা? এত গোস্ত রয়েছে, ভাজা মাছ রয়েছে এসবও দিতে বললেন না কেনো? ছেলের পাকামো দেখে মা বিরক্ত হলেন, বললেন: গোস্ত দিয়ে তরকারি রান্না করা হয়েছে, তাই তো দিতে বললাম। ভাজা মাছ শুধু তোদের জন্যই করা হয়েছে কয়েকখানা, ও দিতে হবে না। টুনু বললেন: কেন দিতে হবে না, শুধু তরকারি দিয়ে সে খাবে কেনো? মা অনেক বোঝালেন: ওরা গরীব মানুষ, ওদের অতসব না হলেও চলে। শুধু ভাত তরকারি হলেই হয়। কিন্তু টুনুর জিদও বেড়ে গেলো—ভাজা মাছ পাঠানো না হলে তিনি আর খাবেনই না। অনেক ধমক, হুমকীর পরেও

Chhunati.com
Pioneer in village based website

টুনুর জিদ পড়লো না। মা অগত্যা ভাজা মাছ পাঠালেন, ফকিরটিকে খাওয়াবার জন্য। তারপর টুনু হেসে উঠলেন প্রশান্ত জয়ের হাসি, তৃপ্তি ও আনন্দের হাসি।

বাবার চিরজীবনের একটা অভ্যেস ছিলো, মফস্বলে বা অন্য কোথাও যাবার সময় ছেলেমেয়েদের কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করা—কার কি জিনিস চাই, কার জন্য কি আনা হবে। সবাই যে যার পছন্দ মতো চাইতো—পুতুল, খেলনা, অথবা লাল জামা। কিন্তু টুনুকে নিয়েই বাধতো মুশকিল। হয় তিনি কিছুই বলবেন না, কিংবা এমন কিছু চেয়ে বসবেন যা সংগ্রহ করাই অসম্ভব। হয়তো আবদার করে বসলেন—তার জন্য এমন একটি দূরবীন আনতে হবে, যার মধ্যে যে কোনো যায়গার, যে কোনো জিনিস দেখতে পাওয়া যায় এবং সেই সঙ্গে এমন একটা ফুলও আনতে হবে, যা শুকলে পরে যে কোনো দুরারোগ্য রোগই সেরে যাবে। এসব ধারণা নিয়েছিলেন সম্ভবতঃ কারো মুখে শোনা গল্প বা রূপকথা থেকে। কিন্তু কেনো এই অদ্ভুত যাচ্ঞা! জিজ্ঞেস করলে বলতেন, দূরবীন দিয়ে দেখবেন কোথায় কে, কি রোগে ভুগছে, তখন ফুলের সুবাস দিয়েই সারিয়ে দেবেন সব রোগ। এই আজগুবী যাচ্ঞার মধ্যে সেই বালকের সুন্দর দরদী মনটিও প্রকাশ পেতো সন্দেহ নেই। কিন্তু কি বিপদ! কোথায় সেই দূরবীন আর কোথায় বা পাওয়া যাবে সেই ফুল? আমাদের কাদা মাটির পৃথিবীতে যে রূপকথায় বলা কোনো জিনিস পাওয়া সম্ভব নয়, আর রূপকথা যে মানুষের স্রেফ কল্পনাসম্ভূত, সেই কথা বুঝাতে গিয়ে নতুন কোনো গল্প ফেঁদে বসতেন বাবা। আবার টুনু চুপ করে থাকলেও বিপদ, কারণ সেই চুপ করে থাকার মানে যে তাঁর কিছুরই প্রয়োজন নেই, তা কিন্তু মোটেও নয়। বাবা তার কারণ জানতেন বলেই, আদর করে করে ছেলের মুখ খোলাতেন।

একবার মফস্বলে যাবার প্রাক্কালে বাবা টুনুকে জিজ্ঞেস করলেন: তোমার জন্য কি আনবো বাবা? একটু সময় চুপ করে থেকে তিনি বললেন: আমার কিছু চাই না আব্বা। মুখখানা একেবারে গম্ভীর—বাবা বুঝলেন কোথাও কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। কিন্তু কি হয়েছে? কেউ কি বকেছে? কিছু বলেনি

Churati.com Pioneer in village based website

তো তোমার মা? ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে, বাবা কিছুক্ষণ পায়চারি করে বেড়ালেন। তাকে অমন অবস্থায় ফেলে তিনি রওয়ানা হতে পারলেন না। যে করে হোক টুনুর অভিমান ভাঙিয়ে না গেলে, কান্নাকাটি করে অসুখ বাধাবে। আগের অভিজ্ঞতা থেকে তা বুঝেছিলেন বাবা। তাই আদরে আদরে, অবশেষে টুনুর মুখ খোলাতে সক্ষম হলেন। টুনু বললেন: আমার একটি ছোট্ট ঘোড়া চাই আব্বা। আপনার সঙ্গে আমিও যেন ঘোড়ায় চড়ে মফস্বলে যেতে পারি। এমনি ছিলো টুনুর নিজস্ব জিদের ধারা। সে জিদ কারো কোনো ক্ষতি করতো না। বরং অনেক সময় তার ফল মঙ্গলজনক হতেই দেখা গেছে।

টুনু বাবার মুখে প্রায়ই দাদার কথা শুনতেন। দাদা, আমাদের পিতামহ। ছেলেবেলায় একদিন টুনুকে বাবা বলছিলেন তাঁরই কথা—দাদার মেহেমান-নেওয়াজি, স্নেহপরায়ণতা ও ন্যায়নিষ্ঠার কথা, সে সব কথা শুনে, কেনো জানি না সেদিন টুনু বড় ছটফট করেছিলেন—বালকটি হয়তো কিছুতেই মানতে পারছিলেন না অমন স্নেহময় দাদাকে সে আর কখনো দেখতে পাবে না। তাই বুঝি সেদিন বাবার গলা জড়িয়ে ধরে টুনু কেঁদে ভাসিয়ে ফেলেছিলেন: দাদা কেনো মারা গেলেন আব্বা? আমি কেনো তাঁকে দেখতে পেলাম না? এই কথা শুনে উপস্থিত সকলের মনই দ্রবীভূত হয়েছিলো। তারপর নানা রকম প্রবোধ দিয়ে বাবা তাকে শান্ত করলেন বটে, কিন্তু রাত্রিতে ঘুমের ঘোরেও টুনু দাদাকে ডেকেছিলেন আর আশ্চর্য! এই ঘটনার দু' এক দিনের মধ্যে তিনি অসুখে শয্যা নিয়েছিলেন। বাবা মা খুব ঘাবড়ে গেলেন। অবশেষে তাঁরা পরামর্শ করে বাবার এক ভাগনেকে, দেশ থেকে আনিয়ে টুনুকে বলেছিলেন: ইনিও তোমার দাদা হন, তোমার কাছে থাকতে এসেছেন। এ দাদা তোমাকে ফেলে আর কোথাও যাবেন না বাবা।

সেই আব্বাস দাদাকে পেয়ে, টুনু যেন হাতে চাঁদ পেলেন। আব্বাস-দাদার স্নেহচ্ছায়ায় টুনুর শৈশব, কৈশোর কেটেছে। তারপর জীবনের বাঁকে বাঁকে যখনই তাঁদের দেখা হয়েছে, দু'ভাই সব ভুলে বসে বসে শৈশবের সেই স্মৃতি রোমন্থন করেছেন শুধু। দু'জনের মধ্যে বয়সের পার্থক্য ছিলো এগারো বারো।

Pioneer in village based website

বছরের। টুনুর জন্যই আব্বাস দাদার জীবনে নাকি উন্নতির সূচনা হয়েছিলো। গল্পচ্ছলে এ'সব কথা তাঁর মুখে বহুবারই শুনেছি। আশ্চর্য এই স্নেহপ্রাণ দাদাও টুনুর মৃত্যুর বছরখানেকের মধ্যে টুনুর মতোই ক্যানসার রোগে মারা যান !

পাঁচ

বাবার কর্মস্থল তখন আসানসোল। সেখান থেকে প্রায় প্রতি শনিবার পরিবারের সকলকে নিয়ে, বাবা কোলকাতা চলে যেতেন। ফিরতেন রোববার বিকেলে, নতুবা সোমবার সকালে। তেমনি একবার বেড়াতে গেছেন কোলকাতায়। সমস্ত দিন, এখানে সেখানে যাওয়া আসা ও কেনাকাটা করে আসানসোল ফিরবার জন্য হাওড়া স্টেশনের দিকে যাচ্ছিলেন তাঁরা। পথের মধ্যে টুনু মাকে বললো : সেই 'যে বড় দোকানটিতে একটা রেলগাড়ী দেখেছিলাম, দম দিলে কেমন এঁকে বেঁকে চলে, তেমনি একটা কিনে দিন না আমাকে। মা বললেন : তোমাকে তো বাবা কেমন সুন্দর মোটরগাড়ী কিনে দিয়েছি, সেইটি দিয়েই এখন খেলো, আবার এলে রেলগাড়ী কিনে দেবো। টুনু গোঁ ধরলো : বা'রে, ওই গাড়ী বুঝি অতদিন থাকবে দোকানে ? কেউ এসে যদি কিনে নিয়ে যায় ? টুনুর যুক্তিতে জোর আছে মন্দ নয়, কিন্তু সময় তো নেই। মা ধমক দিয়ে বললেন : সে দোকান ফেলে এসেছি অনেক পেছনে, এখন অতদূর ফিরে যাবার সময় নেই। তা হলে গাড়ী ধরা যাবে না আজ, চুপ করে বসে থাক। তখন তাদের টেক্সি হাওড়া ব্রীজের ওপর। অগত্যা টুনু জিদের চোটে, মুখখানা কালো করে বসে রইলেন। মা ও ছেলের কথাবার্তা বাবা চুপ করে শুনেছিলেন। এবার তিনি ফিরে তাকালেন টুনুর দিকে। দেখলেন সে মুখ ভার করে বসে আছে। তখন বাবা সকলকে অবাক করে দিয়ে, ড্রাইভারকে বললেন : গাড়ী ফিরাও, ফিরে চলো আবার সেই দোকানে। তারপর দোকান থেকে বেরিয়ে, ঘড়ি দেখে ড্রাইভারকে আদেশ করলেন : আপার সার্কুলার রোড—যে বাড়ি থেকে টেক্সিতে

Chunati.com Pioneer in village based website

উঠেছিলাম, আমার সেই বন্ধুর বাড়িতে চল। অর্থাৎ, ট্রেন ফেল! সোমবারও রাতও বন্ধুর বাড়ি কাটিয়ে পরদিন সকালের গাড়ীতে তাঁরা আসানসোল রওয়ানা হলেন। ঘটনাচক্রে সেদিন বাবার বন্ধুর বাড়িতে এমন একটি পারিবারিক বিবাদ হয়েছিলো, যাতে বাবার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। টুনুর জিদের জন্য ট্রেন ফেল হওয়াতে, আবার বন্ধুর বাড়ি ফিরে গিয়ে বাবা সেই বিবাদ মিটিয়ে দিয়েছিলেন।

বাদ্যযন্ত্রের দিকে, টুনুর একটা স্বাভাবিক টান ছিলো ছেলেবেলা থেকেই। খেলনা মডেলের বাদ্যযন্ত্র কিনতে গিয়ে তিনি বেছে নিতেন শ্রুতিমধুর যন্ত্র—জাইলোফোন, মাউথ-অর্গান, পিয়ানো। বাবা তাঁকে একটা ছোট্ট কলের-গানও কিনে দিয়েছিলেন। ঐক্যতানের বিদেশী রেকর্ড কিনতেন, যখনই সুযোগ পেতেন। বোনদের পুতুল বিয়েতে টুনু ও তার খুদে দল তাই নিয়ে আনন্দে মেতে উঠতেন। তাদের মধ্যে কেউ পিটাতো ড্রাম, কেউবা বেসুরো মাউথ-অর্গান, আর কেউবা জাইলোফোনের দফা শেষ করতো। সুর ও তালের কিংবা আরো সঠিক ভাবে বলতে গেলে, বেসুর ও বেতালের যেন দাঙ্গা বেঁধে যেতো। ছোট্ট কলেরগানটি কিন্তু, নিজের হাতেই রাখতেন টুনু। আজে বাজে, রেকর্ড বাজালে তো চলবে না—অনুষ্ঠানের পরিপ্রেক্ষিতে, বাছাই করা রেকর্ড বাজাতে হবে যে। সে দিকে নজর রাখতে হবে বৈ কি! টুনু এ কাজটি অন্যদের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারতেন না।

পরবর্তীকালে নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরী বিভিন্ন দেশের প্রায় দু'শ অর্কেস্ট্রা জাতীয় রেকর্ড সংগ্রহ করেছিলেন। শুধু সংগ্রহ করা নয়—সে সব রেকর্ডই বুলবুল শুনেছেন নিরিবিলিতে বসে। সঙ্গীত সম্বন্ধে অত্যন্ত আগ্রহ ছিলো বলে, যখনই সুযোগ পেয়েছেন সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছেন সঙ্গীতের নানা বিষয় নিয়ে। বুলবুলের নাচে সঙ্গীত যোজনার সময় বুঝতে পারা যেতো সঙ্গীতজ্ঞান তাঁর কতো গভীর ছিলো। নাচের ভাব ধারার সঙ্গে, সঙ্গীত একাত্ম হয়ে মিশে না গেলে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারতেন না। ছেলেবেলার বেসুরো-যন্ত্র বাজিয়ে দলের নেতা সেই টুনু—বুলবুলের মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করেছিলো।

Chunati.com Pioneer in village based website

যে সব গুণের প্রভাবে মানুষ সুন্দর হয়, মহৎ হয় ছেলেবেলা থেকে, সে সব গুণই বুলবুলের মধ্যে দেখা যেতো। গরীব-দুঃখী বা সাধারণ মানুষের প্রতি, ঐকান্তিক মমতাবোধ হলো তার মধ্যে অন্যতম। তাদের দুঃখ দৈন্য, অভাব-অভিযোগ, ছেলেবেলা থেকে বুলবুলের মনে অমন গভীর ভাবে শিকড় গেড়েছিলো বলেই হয়তো উত্তরকালে মহান শিল্প-দৃষ্টি লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, কারণ সব শিল্পের গোড়ার কথা হলো আন্তরিকতা ও সহমর্মীতা।

বাবা ব্যাণ্ডেলে বদলি হয়ে আসার পর, টুনুকে হুগলীর মডেল স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। তাঁদের বাসা থেকে স্কুলের দূরত্ব ছিলো তিন মাইলের মতো। অতোটা পথ হেঁটে যাওয়া আসা, ছোটদের পক্ষে কষ্টকর ব্যাপার। তাই যাতায়াতের সুবিধার জন্য, বাবা টুনুকে একখানা সাইকেল কিনে দিলেন। সে বয়সের একটা ছেলের পক্ষে, অমন একখানা সুন্দর সাইকেলের মালিক হওয়া খুবই আনন্দের কথা। আনন্দে টুনু লাফাতে লাগলেন! এই ঝকঝকে সুন্দর সাইকেলখানায় চেপে স্কুলে যাবেন, আর এদিক ওদিক খুব ঘুরে বেড়াবেন। বেগে চালাতে শিখে, বোনদের কেমন তাক লাগিয়েও দেওয়া যাবে। আর তখন কতো তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে স্কুলে! টুনুর আনন্দ যেন ধরে না।

Chunati.com Pioneer in village based website

প্রসিদ্ধ 'ইমামবাড়া'র সামনের রাস্তাটা দিয়েই টুনু হুগলী স্কুলে যাওয়া আসা করতেন। ইমামবাড়া সংলগ্ন মুসাফিরখানার আশেপাশে ফকির মিসকিন অন্ধ আতুরের ভিড় লেগে থাকতো সব সময়। স্কুলে যেতে আসতে, টুনু দেখতেন সেই ভিড়। মাঝে মাঝে সাইকেল থেকে নেমে পড়তেন—হয়তো নানা প্রশ্ন জাগতো তাঁর ছোট্ট মনে। আর তখন খুব তাড়াতাড়ি সাইকেল চালিয়ে বাড়ি এসে মাকে প্রশ্ন করতেন: আচ্ছা মা, ইমামবাড়ায় মানুষ অমন ভিড় করে কেনো? মা বলতেন: ওখানে মুসাফিরখানায়, ওদের জন্য দান খয়রাতের ব্যবস্থা আছে কিনা, তাই নিতে ভিড় করে। টুনু আবার প্রশ্ন করতেন: কিন্তু ওরা ভিক্ষা করে কেনো? মা আবার বুঝিয়ে দিতেন: খেতে পায় না বলেই ওরা ভিক্ষা করে বাবা! আবার প্রশ্ন: কেনো ওরা খেতে পায় না মা? আচ্ছা বিপদ! মা ভেবে পান না, কি করে ওইটুকু ছেলেকে এ সব প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায়!

কখনো স্কুল থেকে ফিরবার পথে, নিজের টিফিনের জন্য বরাদ্দ সব ক'টি পয়সাই গুঁজে দিতেন ওদের হাতে। আর নিজে ক্ষুধার্ত হয়ে, বাড়ি ফিরে এসেও খাওয়ার গরজ দেখাতেন না। পাছে বাবা-মা টের পেয়ে যান। হয়তো ওদের কথা, কিছুতেই ভুলতে পারতেন না। তাই বারে বারে, মাকে প্রশ্ন করে অত্যক্ত করে তুলতেন: কেনো ওরা ভিক্ষে করে? কেনো ওরা ছেঁড়া কাপড় পড়ে? কেনো ওদের ঘর বাড়ি নেই? ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেদিন সেই বালকের মনে যে প্রশ্নের জন্ম, বড় হয়ে, দেশ বিদেশের বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থা ভালো করে বুঝবার আগে, সেই প্রশ্নের সঠিক উত্তর তিনি পাননি। রাজনীতিও সমাজনীতিগত, যে দৃষ্টিভঙ্গি বুলবুলের মধ্যে পরবর্তী কালে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিলো—তার উৎস ছিলো, ছেলেবেলাকার সেই জিজ্ঞাসু মনে।

বাবা যখন আসানসোলে বদলি হয়ে আসেন, টুনুর বয়স তখন এগারো বছরের মতো। টুনুদের বাসায় কাজ করতো একজন জমাদারনী। তার কোলে ছিলো আট নয় মাসের একটি বাচ্চা। ছেলেটিকে নিয়েই, সে সাধারণতঃ কাজে আসতো। এসে কমপাউণ্ডে, কোনো গাছের ছায়ায় একখানা চট বিছিয়ে, তার ওপর শিশুটিকে শুইয়ে দিয়ে, তার হাতে দিতো একটি রঙিন ঝুমঝুমি। তারপর জমাদারনী তার নিত্যদিনের কাজ শুরু করতে বাসার ভেতর চলে যেতো। এদিকে ছেলেটি হাত-পা নেড়ে নেড়ে বেশ খেলা করতো। তারি মধ্যে ক্লান্ত হয়ে, একসময় সে ঘুমিয়েও পড়তো। সাধারণতঃ এই ছিলো নিয়ম, নিয়মের ব্যতিক্রমও হতো বৈ কি। তখন অবশ্য জমাদারনী ছুটে এসে শিশুটি সামলাতো—দুধ খাইয়ে শান্ত করে ফের কাজে চলে যেতো।

একদিনের ঘটনা। সেই কমপাউণ্ডের অন্তপাশে বড় একটা গাছের ডালে বাঁধা দোলনায় সেদিন টুনু ও তার দু'বোন খুকু স্বলু মনের আনন্দে দোল খাচ্ছিলো। পাড়া প্রতিবেশীর দু'চারজন ছেলেমেয়েও এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিলো তাদের আশেপাশে। 'দোল-খাওয়া' দলের নেত্রী ছিলো খুকু। 'দোল খাওয়া' ব্যাপারটি মেয়েলী বলেই, হয়তো টুনু তাতে বিশেষ নাক গলাতো

Chunati.com

না। দোলনার দড়ি ছিঁড়ে পড়তে পারে, গাছের ডাল ভেঙে দোল খাওয়ারত দুলাল দুলালি চিৎপটাং হতে পারে, কিন্তু খুকুবিবির হুকুম নড়চড় হবার নয়। সে হুকুম বড্ড কড়া—আরো কড়া খুকুর রাগ। সে যদি কোনো কারণে একবার রেগে যায়, তবে কারো দোল খাওয়া হবে না। কারণ, দোলনাখানা খুকুর বায়না মতো, মা তাকেই করিয়ে দিয়েছেন। খুকুর নির্দেশ মতো, এক দুই তিন করে এক একজন একশত বার দোল খাচ্ছিল, তারপর দোলনা ছেড়ে দিচ্ছিলো অন্য জনকে। খুকুর সতর্কতা ও নির্ভুল গুণতিকে ফাঁকি দেবার কোনো উপায় ছিল না। সঙ্গী সাথীদের দোলার পালা শেষ হয়ে গেলে টুনুর পালা এলো। কিন্তু কোথায় টুনু? ওদের অজ্ঞাতে কবে সরে পড়েছেন। খুকু সঙ্গে সঙ্গে হুকুমজারী করলো: ভাইকে খুঁজে বার কর, নইলে তো পরের জনকে দোল খেতে দিতে পারবো না। কেনো পারবে না সে প্রশ্ন করাই বৃথা, কারণ সবাই জানে খুকু কিছুতেই পাল্টাবে না তার নিয়ম, অথবা নীতি।

সুতরাং যো হুকুম! খুঁজতে লাগলো সবাই। কিন্তু বেশীক্ষণ খুঁজতে হলো না। দলের অন্যতম পাণ্ডা অজিত আবিষ্কার করলো তাঁকে—সেই গাছের তলায়, যেখানে জমাদারনী তার শিশুটিকে শুইয়ে রেখেছিলো। কিন্তু একি কাণ্ড! জমাদারনীর ছেলেটি যে টুনুর কোলে! অজিতের ডাকে সবাই দৌড়ে এলো, আর টুনুর কাণ্ড দেখে থ' হয়ে গেলো। ক্রন্দনরত বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে টুনু নানা রকমে তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করছেন। ভাইয়ের কাণ্ড দেখে রাগে দুঃখে খুকুর চোখ জ্বলে উঠলো। ছিঃ ছিঃ কি ঘেন্না—ভাই কিনা একটা মেথরের ছেলেকে কোলে নিয়েছে! মেথরদের ছুঁলে, তাদের ছেলে কোলে নিলে যে কি হয়, খুকুও ঠিক তা জানতো না। হয়তো সেই রাগ ও ঘৃণার মূলে ছিলো নিছক সংস্কার।

ঘৃণা, উদ্বেগ ও রাগের ঝাঁজ নিয়ে শেষ পর্যন্ত মুখ খুললো: মেথরের ছেলে কোলে নিয়েছো ভাই? মাগো, এখন কি হবে! অজিত মাঝখান থেকে খুকুর কথা লুফে নিয়ে বললো: হবে আর কি, টুনুর তো জাত গেছে, মেথরদের ছুঁলেই জাত যায় তাও জানিস্‌নে?

২—

Chunati.com Pioneer in village based website

টুনু কিন্তু নির্বিকার। এদের এতসব কথা শুনে, শুধু একটুখানি ঝাঁজ দেখিয়ে বললো : কি সব ডেপোমি হচ্ছে তোদের! দেখছিসনে, কি রকম কাঁদছে বেচারা। ভাগ্যিস্ আমি এ দিকে এসেছিলাম, তাই তো কোলে নিয়ে একটু শান্ত করলাম। কিন্তু তাতে দোষটা কি হলো শুনি, তোরা যে অমন করে চেঁচাচ্ছিস? যা যা, সব ভাগ এখান থেকে। আমি এখন যাচ্ছি না, ওর মা কাজ শেষ করে এলে তবেই আমি যাবো।

খুকুর রাগ এবার সপ্তমে চড়লো। ভাইয়ের দোষটা যে কোথায়, তা যে সে ভালো করে বুঝতে পারলো তাও নয়। আবার ভাই একটা মেথরের ছেলে কোলে নিয়ে মস্ত এক দোষ করেছে, সে বোধও সে মন থেকে তাড়াতে পারলো না। তাই ভাবলো মাকেই বলে দেবে ভাইয়ের কাণ্ড! আর মা আচ্ছা করে পিটুনি লাগাবে ওকে! রাগের মাত্রা সপ্তমে রেখেই বললো : বেশ, বারণ করছি তোমার কোলে নেওয়া, এক্ষুনি আমি যাচ্ছি মা'র কাছে। সব বলে দেবো মাকে, মজাটা টের পাবে তখন।

যে খুকুকে টুনু অন্যান্য ব্যাপারে মনে মনে ভয় করে, সেই খুকুর কথায় এখন তারও রাগ চাপলো। গলার পর্দা চড়িয়ে সে জবাব দিলো : যা যা বলগে, দেখবি মা কিছুই বলবেন না। মা তোদের মতো ছোটলোক নন। যা যা, বলগে যা, শিগগীর যা, পালা সব।

Chunati.com
Pioneer in village based website

ভাইয়ের অমন কড়া কথায় দুঃখে অভিমানে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো খুকু। আর খেলার সাথীদের, বিশেষ করে ভাইয়ের কাছে, সেই কান্না গোপন করার জন্য চোখ ভরা পানি নিয়ে সে ছুটে পালালো ওখান থেকে। ওর মুখ থেকেই মা শুনলেন সব। শুনে রাগ করলেন কি-না জানি না, কিন্তু টুনুকে ডেকে বলে দিলেন : গোসল করে এসে তবেই ঘরে ঢুকবে। ছেলের কাপড় জামা গোসলখানায় রেখে তিনি নিজের কাজে চলে গেলেন।

ছয়

এখানে খুকুর একটু পরিচয় না দিলে বুলবুলের ছেলেবেলার পরিচয় সম্পূর্ণ হবে না। তারো চেয়ে বড় কথা—খুকুকে চিনতে না পারলে বুলবুলের শৈশব স্মৃতিমুখর দিনগুলোর মধুর কলগুঞ্জনে ছন্দ পতন ঘটবে।

খুকু ছিলো একাধারে টুনুর বন্ধু ও শত্রু, খেলার সাথী ও প্রতিদ্বন্দ্বী, বোন ও প্রেরণা। খুকুকে না হলে টুনুর খেলা জমতো না মোটেও। আবার খুকুর সঙ্গে খেলতে গিয়ে ঝগড়া বিবাদেরও অন্ত ছিলো না। টুনুর ছেলেবেলার অনেকখানি জুড়ে ছিলো এই খুকু। নতুন খেলা আবিষ্কারের ও ছবি আঁকবার মূলে ছিলো এই বোনটির উৎসাহ ও প্রেরণা। দুটি ভাই-বোন ছিলো যেন কায়া আর ছায়া। ছায়ার মতো খুকু সব সময় টুনুর সঙ্গে সঙ্গেই থাকতো। ভাইটিকে কোথাও একা যেতে দিতে চাইতো না। আবার বোনটিকে ছেড়ে ভাইটিও থাকতে পারতো না বেশীক্ষণ। মধুর আর অনাবিল সেই সব দিনের স্মৃতি আর মধুরতর ছিলো কিশোর ভাই-বোনের সেই নির্মল ভালোবাসা।

ছবি আঁকার নেশায় কতদিন টুনু নাওয়া-খাওয়া ভুলে বসতেন। শালিক, চড়ুই জাতীয় পাখি ঘরে ঢুকলে টুনু বলতেন : দ্যাখ-দ্যাখ খুকু, কি সুন্দর পাখিটা। তুই তাড়াতাড়ি একটু চাল ছিটিয়ে দে, আমি এক্ষুনি পাখিটা এঁকে ফেলবো। সঙ্গে সঙ্গে খাতা পেন্সিল নিয়ে বসতেন। খুকু, সুলু চমৎকৃত হয়ে দেখতো—সত্যি সত্যি টুনু চমৎকার একটা পাখি এঁকে ফেলেছেন। খুকু ছোটবেলা থেকেই পাখি পুষতে ভালোবাসতো, কিন্তু এই পাখি পোষা নিয়ে খুকুর সঙ্গে টুনুর খুব ঝগড়া হতো। টুনু বলতেন : পাখিটাকে কেন খাঁচায় বন্ধ করে রেখে কষ্ট দিবি? ডানা মেলে আকাশে উড়ে বেড়াবে, শিস দেবে। দেখতে কেমন সুন্দর লাগতো। পাখিটা খাঁচায় বন্দী হয়ে কি রকম ছটফট করছে দেখছিস না? কিন্তু না, খুকুকে রাজি করানো যেতো না। খাঁচার পাখি খাঁচাতেই থাকতো। খুব সতর্কতার সঙ্গে খুকু যেন জানতে না পারে তেমনি চুপি চুপি টুনু কতদিন কত পাখি উড়িয়ে দিয়েছেন। খাঁচার পাখি পালাবার রহস্য খুকু বহুদিন জানতে পারেনি। যখন জেনেছিল তখন পাখি পোষার নেশাও কেটে গেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সাধারণত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীদের যন্ত্রণা দিয়ে মজা করতে দেখা যায়। টুনু কিন্তু তাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। মুঠো ভরে চিনি ছড়িয়ে দিতেন

Chunati.com Pioneer in village based website

পিঁপড়ের ঢিপির চারপাশে। মায়ের ভাণ্ডার থেকে খুকুই টুনুকে চিনি জোগাড় করে দিয়েছে।

কখনো ঝগড়া করে, কখনো অনুনয় বিনয় করে ভাইটির ছায়া হয়ে থাকতেই খুকু ভালোবাসতো। দিনের মধ্যে দশবার ঝগড়া করেও একসঙ্গে ভাত না খেলে, ভাই-বোন কারুরই পেট ভরতো না।

ছেলেবেলায় শুধু নয়, বুলবুল যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন ভাই-বোনের এই সম্পর্কও অটুট ছিলো। শৈশবের সেই আসানসোলের দিন থেকে অন্তিমকাল পর্যন্ত, বুলবুলের বহু সমস্যাকে খুকু চিরকাল স্নেহ, দরদ ও ঐকান্তিক অনুরাগ দিয়ে সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে—বুলবুলের দুঃখকে নিজের বুকে নিয়ে, তার চিন্তার ভার নিজের মাথায় বয়ে, এই স্নেহময়ী বোনটি সব সময় ভাইয়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বোনের স্নেহচ্ছায়ায় বসে বসেই শিল্পী বুলবুল রচনা করেছেন 'বিষের বাঁশী, 'সাঁওতালি নৃত্য', 'ভ্রমর', 'চাঁদ সুলতানা' ইত্যাদি নৃত্যরূপ। এ সেই খুকু, আসানসোলের বাসার আঙিনায়, পেয়ারা ডালে দড়ি বেঁধে দোল খাওয়া দলের সেই খুদে নেত্রী—বুলবুলের কায়ার ছায়া সেই খুকু, যার বুকের বেলাবালুতে শৈশব ও কৈশোরের স্মৃতি-সমৃদ্ধ অজস্র ঝিনুক পাথর ছড়িয়ে আছে। আর সেই ঝিনুক আঁচলে কুড়াতে গিয়ে আজো যে আকুল হয়ে কেঁদে ওঠে।

শরৎকালের এক দুপুর। বাবা ছিলেন আফিসে। ছোট ভাইবোনদের নিয়ে মা ঘুমোচ্ছেন। টুনু আর খুকু ঘরে বসে 'ক্যারাম' খেলছিলো। মা'র কঠোর নিষেধ, দুপুরে কেউ বাইরে বেরুতে পারবে না। তাই বিকেল পর্যন্ত ঘরেই বন্ধ থাকতে হতো। পূজোর ছুটিতে তখন স্কুলও বন্ধ। পড়াশোনার চাপ নেই। ঘরে চুপচাপ বসে বসে কি করবে, অগত্যা 'ক্যারাম'-ই সই। দু'ভাই-বোন খেলতে বসে গেলো। টুনুর হাতের তাক ভালো, খুকু পেরে উঠছে না কোনো মতেই। বারবার হারলেও যে লজ্জা। এখন একমাত্র উপায় ঝগড়া, আর তারি জন্য যেন ওঁত্ পেতে রইলো। তারপর টুনুর অব্যর্থ এক 'স্ট্রাইকে'র সুযোগে, খুকু হঠাৎ খিচিয়ে উঠে বাধা দিয়ে বললো : বা-রে, ও কি হচ্ছে, চোট্টামি করছো কেনো? গুটিটা যে দিব্বি হাত দিয়ে সরিয়ে

Chunati.com

দিলে ! তখন আর কি খেলা চলে—রেগেমেগে টুনু এক ঝটকায় বোর্ড-খানাই উল্টে দিলেন। তারপর সটান দাঁড়িয়ে, দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন : চোট্টা বললি আমাকে? মিথ্যাবাদী কোথাকার ! যা, আজ থেকে তোর সঙ্গে সব খেলা বন্ধ। আর কোনদিনই খেলবো না তোকে নিয়ে। রাগে অপমানে, টুনুর চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছে তখন—অন্যায় ভাবে কেউ তাঁকে দোষ দিলে তিনি তা সইতে পারতেন না। ভাইয়ের মুখের দিকে তাকাতেই খুকু তা বুঝতে পেলো। ঘাঁটাবার আর সাহসই হলো না তার।

ক্যারাম খেলা ভেঙে দিয়ে সে পড়ার ঘরে এসে ছবির খাতাখানা টেনে বার করলো। খুকুও ভারীমনে, তার পুতুলের বাক্সের কাছে গিয়ে বসলো। কিন্তু ভাইয়ের মনে কষ্ট দিয়ে, কতক্ষণ সে নীরবে বসে থাকতে পারে! পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, পনেরো মিনিট—না আর থাকা যায় না ! তারপর ধীরে ধীরে, ভাইয়ের পড়ার টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ালো। একটু ভেবে নিয়ে বললো : ভাই মনি, আমার একটা কথা শুনবে? আর কখনো মিথ্যা কথা বলবো না। এই দেখ, নাক কান মলছি। আর যদি কখনো মিথ্যা কথা বলি, তখন তুমি আমার সঙ্গে জন্মের মতো আড়ি করো। মুখ না তুলেই টুনু বললেন : থাক থাক খুব হয়েছে, ন্যাকা সাজতে হবে না আর। যা' এখান থেকে।

Chunati.com
Pioneer in village based website

কিন্তু খুকুও দমবার পাত্রী নয়—মনে মনে মতলব ঠাউরে নিয়ে বললো : জানো ভাই, অনেকগুলো দুর্গা মূর্তি নাকি এনে রেখেছে থানার উঠানে। চলো না ভাই একবার দেখে আসি?

মুখে টুনু যাই বলুন, তখন কিন্তু রাগ পড়ে গেছে। কারণ খুকু দোষ করেছে সত্যি, কিন্তু সে তো অনুতপ্ত হয়েছে। তারপর কি টুনু রেগে থাকতে পারেন? তবুও একটা আপত্তি তুলে, বোনকে দিয়ে আরো সাধাবার ইচ্ছাতেই বললেন : আমি এই দুপুরে কোথাও যাবো না। এখন বেরুলে মা বকবেন। দেখছিস না আমি ছবি আঁকতে বসেছি।

টুনুর কথায় খুকু যেন এবার একটু ভরসা পেলো। কিন্তু রাগ যাতে একেবারে পড়ে যায়, তার জন্য আরো অনুনয় করে খুকু বললো : এবার

নাকি মূর্তিগুলো খুব করে সাজিয়েছে। আমাদের স্কুলের মেয়েরা বলছিলো। কেমন সাজ দেখতাম যদি, তাহলে আমার কনে পুতুলটাও ঠিক তেমনি করে সাজাতাম। চলো না ভাই, একবারটি। তুমি সঙ্গে করে নিয়ে না গেলে আমার যে দেখাই হবে না। মা তো ঘুমিয়ে আছেন, জাগতে এখনো ঢের দেরী। ততক্ষণে আমরা ফিরে আসবো।

এবার টুনু আর না উঠে পারলেন না। কিন্তু নিজের তেমন গরজও দেখালেন না। ওরকম মূর্তি আমি ঢের ঢের দেখেছি, তুই দেখতে চাইছিস বলেই যেতে হচ্ছে, নইলে বেশ তো ছবি আঁকছিলাম। যাবি তো চল শিগগীর। খুকু এক লাফে ভাইয়ের পাশে এসে তার হাত ধরলো। দু' ভাই-বোন হাত ধরাধরি করে চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। ভাইয়ের রাগ ভাঙাতে পেরে খুকু হাতে চাঁদ পাবার মতো খুশী হয়েছে! তাই ভাইয়ের হাত ধরে আনন্দে লাফাতে লাফাতে চলছে থানার দিকে।

Chunati.com
Pioneer in village based website

সাত

দুর্গা মূর্তিগুলো থানায় এনে রাখার পেছনে ছোট্ট একটু ঘটনা আছে। সেবার প্রতিমা নিয়ে স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যে বেশ একটা জেদাজেদির সৃষ্টি হয়েছিলো। কোন গ্রাম কোন গ্রামের চেয়ে বেশী সুন্দর প্রতিমা গড়তে পারে, এ নিয়েই প্রতিযোগিতা, এ নিয়েই জেদাজেদি। এমন কি, এক গ্রামের লোক অন্য গ্রামের প্রতিমা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতেও ছাড়েনি। ফলে দেখা দেয় বিরোধ ও সংঘর্ষ। এমন কি হাতাহাতি পর্যন্ত। ক্রমে ব্যাপার যখন আরও ঘোরালো হয়ে উঠে, রক্তারক্তির সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন থানা অফিসার আদেশ দিতে বাধ্য হন: প্রতিমাগুলো সব থানায় নিয়ে এসো। বিবাদ মিটে গেলে যার যার প্রতিমা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তাই প্রতিমাগুলো এবার থানার প্রাঙ্গণে এনে জড়ো করে রাখা হয়েছে।

ভাই-বোন দু'জন এক রকম দৌড়েই এলো সেখানে। কিন্তু মূর্তিগুলোর

কাছে এসে, মহল্লার ছেলে-ছোকড়াদের কাণ্ড দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলো তারা। থানার উঠানে মূর্তিগুলো পড়ে থাকতে দেখে ছেলেরা সব এসে জুটেছে। তারাও হয়তো দেখতেই এসেছিলো; আশেপাশে লোকজন না দেখে তাদের মাথায় চাপলো নষ্টামি বুদ্ধি। তখন ছেলেদের কেউ চেপে বসলো অসুরের ঘাড়ে, কেউ চড়লো সিংহের পিঠে, কেউ বা গণেশের শুঁড় ধরে টানাটানি করতে লাগলো। আবার কে একজন পেনসিল দিয়ে কার্তিকের রূপ বাড়াবার চেষ্টায় ব্যস্ত।

এসব দেখে টুনুর রাগ হলো ভয়ানক। যাদের জিনিস তারা নিয়ে যাবে। দুষ্টু ছেলেগুলো কেনো এমন করে নষ্ট করছে মূর্তিগুলো? এই কথা মনে হতেই টুনু ছেলেগুলোকে নিষেধ করলো মূর্তিগুলো নষ্ট না করতে। তাতেও ওরা বিরত হচ্ছে না দেখে, থানার লোক ডেকে আনবে বলে ভয় দেখালেন। কিন্তু স্বয়ং বড় দারোগার ছেলে তাদের দলে, সুতরাং কে শোনে টুনুর কথা! ধ্বংসের আনন্দে যারা মাতে, রক্ষার আবেদনে তারা হয়তো কোন-কালেই সাড়া দেয় না। নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া উপায় নাই কিছু। ওর কথা যে তারা শুনবে না, টুনু তখন তা বুঝতে পেরেছেন। তাদের এই কাজ থেকে বিরত করতে হলে গায়ের জোর দেখাতে হবে। কিন্তু গায়ের জোরে অন্যকে হারাবার শিক্ষা তো টুনু পাননি কখনো। ভাইয়ের মনের অবস্থা খুকুও বুঝেছিলো। নিজের হাতখানা দিয়ে ভাইয়ের হাত ধরে বললো: চল ভাই, বাসায় যাই, ওই অসভ্য ছেলেদের সঙ্গে কথা বলো না আর। বোনের সঙ্গে সঙ্গে টুনু দু'পা হেঁটেই মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লজ্জায়, দুঃখে ও ব্যর্থতায় তখন তার দু'চোখে পানি টলটল করছে। বাবার মুখে মুখে মুখস্থ করা কবিতার এই ক'টি লাইন সেদিন মর্মাহত টুনুর কণ্ঠে আকুল হয়ে উঠেছিলো:

'ভিন ধর্মীর পূজা মন্দির
ভাঙ্গিতে আদেশ দাওনি হে বীর
তুমি বলেছিলে ধরণীতে সবে
সমান পুত্রবৎ
তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ
ক্ষমা কর হজরত----'

Chunati.com
Pioneer in village based website

নিতান্ত একটা বালকের পক্ষে অমন উপলব্ধি সাধারণ নিয়মে সম্ভব নয়। কিন্তু টুনুর বেলায় ঘটনাটিকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। আশৈশব তিনি হজরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর দয়া, ক্ষমা ও উদারতার কথা বাবার মুখে শুনেছেন, বড় পীর (রঃ) সাহেবের মাতৃভক্তি, সত্যবাদিতা তাঁর অনন্য-সাধারণ প্রতিভা, বাগ্মিতা ও আধ্যাত্মিক বিপুল ক্ষমতা—বাবা অবসর সময় ছেলেমেয়েদের শোনাতেন। বাবা সুন্দর ভাবে বলতে পারতেন বলেই হয়তো ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঐকান্তিক আগ্রহে চুপচাপ বসে তাঁর কথা শুনতো। তারপর ছেলেমেয়েরা আরো যখন বড় হলো, গল্পের বই হাতে নিয়ে পড়বার আগ্রহ জন্মালো—তখন রূপকথার বই পুস্তকের সঙ্গে নীতিকথামূলক গল্প গাঁথার বইও বাবা ছেলেমেয়েদের কিনে দিতেন। ১৯২৬ সনে টুনু বাবার সঙ্গে এবং ১৯২৮ সনে পরিবারের অন্য সকলের সঙ্গে একবার আজমীর শরীফ খাজা বাবার দরবারে গিয়েছিলেন। হজরত নিজামুদ্দিন আউলিয়ার মাজার শরীফ জেয়ারত করেছেন। তাঁর অত্যাশ্চর্য জীবন কাহিনী শুনেছেন। মহাতাপস, সুর স্রষ্টা আমির খসরুর রওজা মোবারক দেখেছেন। তাঁর সাধনার কথা শুনেছেন। দেখেছেন খাজাবাবার দরবারে ধনী, নির্ধন, অসুস্থ, অথর্ব মানুষের আকুল আবেদন, তাদের বিগলিত অন্তরের ভক্তি ভালোবাসা। সাধারণত ছেলেমানুষের মনে ভালো কথা বার্তার, ভালো কাজের একটা ছাপ স্থায়ী ভাবে থেকে যায়—জীবনে কোন বিশেষ সময়ে, অবস্থা বিশেষে অবচেতন মন থেকে আশ্চর্যজনক ভাবে উঠে আসে প্রেরণা, শক্তি, সান্ত্বনার উৎস হতে—তাই নিতান্ত বালকের পক্ষে আপাতদৃষ্টিতে যা সম্ভব বলে মনে হয় না, তাও অনেক সময় সম্ভব হয়ে ওঠে। সর্বোপরি টুনুর সহজাত সংবেদন-শীল মনে অমন উপলব্ধির স্ফুরণ বাল্যকালেও কিছুমাত্র অসম্ভব ছিলো না। তাই তিনি চোখের ওপর জিনিসটি নষ্ট হতে দেখে বাধা দিতে চেষ্টা করেছিলেন। কৃতকার্য হতে না পেরে, নিজের অক্ষমতাই হয়তো তাঁকে বেদনাহত করেছিলো।

টুনুর সেদিনের আবৃত্তি করা কবিতার ছত্রগুলো বলে খুকু এখনো ভাইয়ের শোকে কেঁদে ওঠে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে শৈশবের সে সব স্মৃতি খুকুর মনের সমুদ্রে মহামূল্য শুক্তির মত ছড়িয়ে আছে। কোনো নিঝঝুম দুপুরে, অথবা কোনো

Chunati.com Pioneer in village based website

মেঘ মেদুর সন্ধ্যায় মনের সেই অতলান্তে ডুব দিয়ে সে সব শুক্তি তুলতে গিয়ে সে আর নিজেকে সামলাতে পারে না।

আট

টুনুদের পৈত্রিক বাড়ি চট্টগ্রাম জেলার বর্ধিষ্ণু একগ্রামে। চট্টগ্রাম শহর থেকে চল্লিশ মাইল দক্ষিণে। সবুজ পাহাড়, শ্যামল সমভূমি, আর বহু পুরানো বড় বড় দীঘি, শাপলা বিল, আর পাহাড়ের বুক চোঁয়ানো ঝিরি ঝরণার মায়ায় ভরা সে গ্রাম। সবুজ বনের ঘন ছায়ায়, আর সোনালী ধানের সোনা রং-এ, চোখ জুড়ানো প্রাণ মাতানো সেই গ্রামের নাম চুনতি। গ্রামের বুক চিরে চলে যাওয়া মোগলশাহী আমলের আরাকান ট্রাঙ্ক রোড। কোথাও লাল লাল মাটি ছড়ানো আঁকাবাঁকা পায়ে চলা সরু পথ, দু'পাশে ছোট ছোট ঝোঁপ ঝাড়ে নানা বর্ণের নানাগন্ধের ফুল। সেই পথ দিয়ে চলতে গেলে কি রকম একটা আদিম ভাব অকৃত্রিম গন্ধে মনটা হঠাৎ উতলা হয়ে ওঠে। ১৯৫২ সনে বাবার জন্য একটা জেয়াফত দিতে বুলবুল চুনতি এসেছিলেন। তখন একদিন বলেছিলেন : জানিস্ দুলু, আমাদের গ্রামের কতগুলো জায়গাতে ঘুরে বেড়ালে মনে হয়—বিংশ শতাব্দীর চরম সভ্যতা বিচ্ছিন্ন পৃথিবীর বাইরে অন্য কোন জগতে যেন পরিভ্রমণ করছি। শান্তি আর সৌন্দর্য ছাড়া আর কিছুই অনুভব করা যায় না!

Chunati.com Planet...village based website

চুনতির প্রতি গভীর আকর্ষণ, চুনতির প্রাকৃতিক শোভা—বুলবুলের শিল্প প্রতিভা বিকাশের পথে পরম সহায়ক ছিলো বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। বুলবুল নিজেও তা একান্ত ভাবে বিশ্বাস করতেন। বলতেন : মাতৃভূমির ঋণ শোধ করা যায় না। চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ঐতিহ্য আমাদের গর্ব। আমার গ্রাম থাকবে আমার শিল্পে সাহিত্যে। চুনতির মত নৈসর্গিক শোভা আমি আর কোথাও দেখিনি।

তাই বোধ হয়, চুনতির প্রাকৃতিক ছবি ও সামাজিক জীবনকে বুলবুল অমরতা দান করবার চেষ্টা করেছেন তাঁর সাহিত্য প্রচেষ্টায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্য পর্যায়ে, জাপানী আক্রমণকারীদের বর্মা দখলের সাথে সাথে, ভারতীয় বাস্তুহারাদের যে মিছিল দিনের পর দিন, রাতের পর রাত পায়ে হেঁটে, দুর্গমপথে স্বদেশের মাটিতে পৌছাবার জন্য মরণপন করে যাত্রা করেছিলো—তাঁদের দুঃখময় জীবনকে কেন্দ্র করে বুলবুল 'প্রাচী' নামে যে উপন্যাস লিখেছেন তাতেও ফুটে উঠেছে মাতৃভূমির প্রকৃতি ও পরিবেশ।

টুনুর জীবনের ১৫-১৬ বছর কেটেছে বাইরে বাইরে—বাবার বিভিন্ন সময়কার কর্মস্থলে। কিন্তু তিনি সব সময় মা-বাবার কাছে শুনেছেন দেশের কথা, তাঁদের গ্রাম চুনতির কথা। আর ছেলেমানুষের স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা নিয়ে টুনু নিজেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতেন, জানতে চাইতেন চুনতি সম্পর্কে। কোথায় আর কি রকম সে দেশ? কে কে আছেন সেখানে? এ সব প্রশ্নের উত্তর শুনতে শুনতে নিজের অজ্ঞাতেই তাঁর মনের গভীরে চুনতির জন্য একটা আকর্ষণ ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠেছিলো। খুব ছোট থাকতে তিনি অনেকবার বাবা-মার সঙ্গে দেশে গেছেন। কিন্তু সেখানে তাঁর অবস্থান এতই সংক্ষিপ্ত আর বয়স এত কম ছিলো যে, চুনতি স্বপ্নের মতোই নাগালের বাইরে থেকে যেত। তাই চুনতি বলতে চোখে ভাসতো একখানা আবছা আবছা সবুজ স্বপ্নে ভরা গাঁয়ের ছবি, আর অনেকগুলো স্নেহকোমল মুখের মায়া। তার ওপর হয়তো টুনু নিজের কল্পনার রঙ বুলাতেন। এমনি করে নিজের দেশ, নিজের গ্রাম ও নিজের আত্মীয়-স্বজন দেখবার জন্য টুনু মনে মনে পাগল হয়ে উঠলেন।

Chunati.com Pioneer in village based website

কিছুদিনের মধ্যে সে সুযোগ মিলে গেলো. লম্বা ছুটি নিলেন বাবা দেশে যাওয়ার জন্য। উপলক্ষ ছিলো, টুনু ও তার চাচাতো ভাইয়ের খৎনা। স্মৃতির মণিকোঠায় বিভিন্ন ঘটনা আবদ্ধ করে রাখার ক্ষমতা জন্মাবার পর, এই প্রথমবার অনেকদিনের জন্য নিজের গ্রামে, নিজের বাড়িতে নিজের দেশে যাচ্ছেন তিনি। সনটা ছিলো ১৯২৬।

চুনতির মাটির স্পর্শে, আর তার অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে তিনি যেন আত্মহারা হয়ে গেলেন। চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখে বললেন: আহা কি সুন্দর!

অগুনতি আত্মীয় স্বজন, ভাই-বোন, পাড়া প্রতিবেশী পরিবেষ্টিত হয়ে, আবেগপ্রাণ টুনুর দিন কাটতে লাগলো স্বপ্নের মতো। আজ পুষ্পপুকুরে

জাল ফেলে মাছ ধরা, কাল অদূরে সবুজ-সুষমা ভরা পাহাড়ে বনভোজন, পরশু ছোট চাচার সঙ্গে শিকারে যাওয়া, তরশু 'কইয়ের ঢেবায়' পানি সেঁচে মাছ মারা। তারপর ভোরে উঠে কোনোদিন পাহাড়ি পথে পথে নানার বাড়ি যাওয়া, আর দাদীর হাতে হামানদিস্তার ছেঁচা পান খেয়ে ছোট চাচা মেজো চাচার কোলের কাছে বসে বসে রাতে গল্প শোনা। এমনি করে দিন এলো আর গেলো। তারই মধ্যে কোনোদিন বাবার সঙ্গে টুন্নুও চলে যেতেন, আরাকান রোডের পশ্চিম পাশের পাহাড়ে, ছবির মতো পরিপাটি বড় ফুফুদের বাড়িতে। কিংবা কোনোদিন যেতেন আরাকান রোড ধরে সোজা দক্ষিণ দিকে—যেখানে রাস্তাটা হঠাৎ বেঁকে আবাদি ছেড়ে 'ঢালার' বুক চিরে এগিয়ে গেছে—আরও দক্ষিণে। তিনি শুনেছেন, এই রাস্তা বর্মাদেশের সীমান্তে গিয়ে মিশেছে। সে দেশ যে কত দূর কে জানে! টুন্নুর যাত্রা বাঁকটার কাছাকাছি এসে থেমে যেতো। মুগ্ধদৃষ্টিতে তিনি দেখতেন চারদিকের নৈসর্গিক সৌন্দর্য, আর গ্রহণ করতেন শান্ত পরিবেশের স্পর্শ। সেখান থেকে পায়ে চলা সরু সরু পথগুলো আরাকান রোড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এঁকেবেঁকে রাস্তার দু'পাশে, পাহাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ছোট ছোট পাহাড়ি ঝিরি ও 'ছরা' নানা রঙের পাথরের নুড়ি আর বালির স্তরের ওপর দিয়ে তরতর করে বয়ে চলেছে। রাস্তার দু'পাশে পাহাড়ে পাহাড়ে জঙ্গলের ঘন বিস্তৃতি। সোনালু, বয়রা, হরিতকি, নটকন, আমলকি, গর্জন, পিয়াল ও বনমাদারের বড় বড় গাছের ফাঁকে ফাঁকে, 'কচই', 'কুঁচবিচি' আর 'গিলার' লতা গুল্মে ভরা আদিগন্ত বিস্তৃত সেই অরণ্য। আর তারই কোলে কোলে গ্রামীণদের পায়ে চলা-পথ সর্পিল গতিতে চলে গেছে এক গাঁ থেকে অন্য গাঁয়ে! কোথায় গেছে এই রাস্তাটা আব্বা?

টুন্নুর দিকে চেয়ে, বাবা টের পেলেন যে কোন কারণে এই রাস্তাটা টুন্নুর চোখে রহস্যময় হয়ে উঠেছে। বাবা বললেন: এই পথ দিয়ে গ্রামের অনেক লোক আরাকান নামে একটা দেশে যায়।

: অনেক দূর সেই দেশ, না আব্বা? অনেক দূর বৈ কি বাবা। ছোট ছেলেটির কল্পনাকে সাহায্য করবার জন্যই হয়তো বাবা আর কিছু না বলে চুপ করে

Chunati.com
Pioneer in village based website

থাকতেন। সে দিন পথের প্রান্তে দাঁড়িয়ে, কল্পনার রঙ-ফানুস জ্বালিয়ে, এই পথটাকে তিনি কি ভাবে দেখেছিলেন জানি না, সেদিন কে জানতো বর্মাদেশ থেকে এই পথ ধরে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে আসা জনতা নিয়েই টুনু একদিন রচনা করবেন একখানা বলিষ্ঠ আলেখ্য ! সে দিন তার ছায়াই কি পড়েছিলো, তার অচেতন শিশুমনে ? কে জানে, হয়তো তাই ! তাই হয়তো ছেলেবেলা থেকেই সেই পথ তার মনে অমন বিস্ময়, অমন জিজ্ঞাসা জাগিয়েছিলো ! বাবা আর কিছু বললেন না। টুনুও চুপ করে রইলেন। ছেলের নীরবতা তিনি আর ভাঙালেন না। রাস্তার দু'পাশে পাহাড়ে, জঙ্গলে ফুটে থাকা অসংখ্য অনাদৃত লাল, নীল, সাদা বুনো ফুলের অরণ্যে, আর ছোট বড় নানা জাতের পাখীর কলকূজনে, ঝরনার ঝিরিঝিরি শান্ত শব্দে, প্রজাপতির রঙিন পাখায় পাখায় টুনুর মনটাও যদি উড়ে গিয়ে থাকে—তবে থাক না সে চুপ করে !

টুনু ও তার চাচাতো ভাইয়ের খৎনা উপলক্ষে উৎসব আনন্দ, মেলা মেজবান, হৈ হুল্লোড়, আর টুনুর খেপা মনের স্বপ্ন রচনার মধ্যে, দেখতে দেখতে একদিন বাবার লম্বা ছুটি ফুরিয়ে গেলো। চুনতি ছাড়ার মুহূর্তে আত্মীয়স্বজন, জ্ঞাতি কুটুমদের কাছে বিদায় নিতে গিয়ে, মা ও বোনদের সঙ্গে টুনুও কেঁদেছিলেন। হঠাৎ পাওয়া অনেক অনেক ভাইবোন, আর নিজের দেশ ছেড়ে যাওয়ার বেদনা, সেবারই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন তিনি।

টুনু চুনতিতে যে কয়টি দিন ছিলেন সে দিনগুলো ছিলো তাঁর কৈশোর জীবনের সবচেয়ে আনন্দমুখর দিন। তাই চুনতি থেকে ফিরে এসে, উৎসব শেষের নির্জীবতায় তিনি যেন ঝিমিয়ে পড়লেন। আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত একান্ত মধুর ক'টি দিনের মাঝখান থেকে এসে টুনুর বোনেরাও কেমন যেনো মনমরা, বাবা-মা ছেলেমেয়েদের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করলেন। তাই তাঁরা কিছুদিনের মধ্যে আবার ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে। দিল্লী, আগ্রা ও আজমীর শরীফে মাসেককাল কাটিয়ে বাবা স্বপরিবারে ফিরে এলেন নিজের কর্মস্থলে। ফিরবার পথে কোলকাতায় স্টার থিয়েটারে বাবা-মা ছেলেমেয়েদের নিয়ে নাটক দেখলেন। এ হলো টুনুর কিশোর জীবনের আর এক বিস্ময় !

Chunati.com
Pioneer in village based website

চুনতির স্মৃতিতে এতদিন টুনুর মন বিভোর ছিলো। সেই স্মৃতির আবেশ জড়ানো চোখে, এবার লাগলো আর এক বিস্ময়ের ছোঁয়া—সেই আর এক বিস্ময় হলো নাটক! 'সাজাহান'! সাজাহান টুনুর মনকে ভীষণ ভাবে নাড়া দিলো—সে যেন এক নতুন জগৎ নতুন রূপে উদ্ভাসিত হলো। টুনুর সমস্ত মন-প্রাণ জুড়ে বসলো নাটকের দৃশ্য! কিছু একটা করে মনের সেই অস্থিরতা দূর করতে না পারলে কিছুতেই যেন মন শান্ত হচ্ছে না। সুতরাং একটা কিছু করা চাই—কিন্তু কি? নাটক? ঠিক তেমনি করে হাতমুখ নেড়ে অভিনয় করলে কেমন হয়।

তারপর একদিন দুপুর বেলায় দেখা গেলো টুনু বাসায় নেই, সেই সঙ্গে খুকু সুলু দু'বোনও উধাও। কোথায় গেছে কেউ জানে না। ছেলেপুলে চোখের আড়াল হলেই মায়ের মন ছটফট করতো—কি জানি, কোথায় আবার অনর্থ বাধিয়ে বসে। যেমন টুনু, তেমনি হয়েছে বোন দু'টিও। বিশেষ করে টুনুতো হেঁটে কখনো পথ চলে না—চলতে গিয়ে হয় দৌড়ায় নতুবা লাফিয়ে চলে। এমনি করে কতবার যে হাত-পা ছিঁড়ে গেছে, তার ডাণ্ডাগুলি খেলতে গিয়ে চোট লেগেছে, কপাল কেটে রক্ত ঝরেছে, তার হিসেব নেই। সাইকেল চালাতে গিয়ে উল্টে পড়ে, মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে বিছানাতে শুয়েও থাকতে হয়েছে কতবার, তবুও ছেলের হুঁশ হয় না। তাই টুনু সামনে না থাকলে মা বড় অস্থির হতেন। ছেলেমেয়েদের খুঁজে আনার জন্য তিনি চাকরটাকে পাঠিয়ে দিয়ে অস্থির ভাবে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ ধরে খোঁজা-খুঁজির পর ঠিকানা মিললো টুনুদের। চাকরটা যে খবর নিয়ে এলো তা বড় কৌতুকপ্রদ। বাসার পেছনে, মাঠের মতো ফাঁকা জায়গাটার ওপাশে বটগাছের তলায় বড় ভাই 'টিয়েটার' করছেন। বড়বুবু ছোট বুবু আর তেনার সঙ্গী সাথীরা 'তেনার' সঙ্গে রয়েছেন। শুনে মা আশ্বস্ত হলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছা হলো, টুনু তাঁর কেমন থিয়েটার করছেন একটিবার দেখলে বেশ হয়। তাই তিনি বাসার পেছন দিকের দুয়ারটা একটু খুলে সেই বটগাছটার দিকে তাকালেন। ওদিকে টুনুর থিয়েটার তখনো চলছিলো। মা দেখলেন: গাছের নিচে অনেকগুলো

Chunati.com
Pioneer in village based website

ইট জড়ো করে. বেশ একটু উঁচু মতো করে নিয়েছে ওরা। আর ওই উঁচু জায়গাটাকে করেছে স্টেজ। তারই ওপর দাঁড়িয়ে মুখ-হাত নেড়ে, অভিনয় করছে টুনু। দেখে মায়ের মনে হলো 'সাজাহান'কে অনুকরণ করবার চেষ্টা করছে সে। কিন্তু দূর থেকে টুনুর হাত নাড়া ছাড়া মা কিছুই শুনতে পেলেন না। তবে কথার ওজনের স.ঙ্গ, ক্ষুদে অভিনেতাটির ভঙ্গির যে তারতম্য ঘটছে, দূর থেকেও মা তা বুঝতে পারলেন। কখনো গম্ভীর, কখনো উৎফুল্ল হয়ে উঠছে সে। ক্ষুদে দর্শকদের সঙ্গে দু'বোন তন্ময় হয়ে দেখছে ভাইয়ের আশ্চর্য অভিনয়! আর আধখোলা খিড়কি দুয়ারে দাঁড়িয়ে মা'ও তাকিয়ে আছেন অপলক চোখে। সেদিনের সেই ক্ষুদে অভিনেতার অভিনয় যে অনাগত দিনেরই এক উজ্জ্বল প্রতিভার পূর্বপ্রকাশ তা তিনি অনুভব করলেন কি-না কে জানে। হয়তো নিতান্ত ভালো লাগলো বলেই চেয়ে রইলেন।

Chunati.com
Pioneer in village based website

নয়

ব্যাণ্ডেল থেকে বাবা বদলি হয়ে গেলেন বাঁকুড়া। এতদিন টুনু ভাবতো সারা পৃথিবীটা বুঝি সবুজ স্নেহে ভরা। বিশেষ করে, চুনতির কাঁচা সবুজের স্বপ্ন তখনও টুনুর চোখ থেকে মুছে যায়নি। সে যেন এক মায়ার দেশ! চুনতির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য টুনুর কচিমনে মায়ের মমতার মতোই মনে ছিলো জড়িয়ে।

আর বাঁকুড়া! গেরুয়া মাটিতে ঢাকা বিস্তীর্ণ প্রান্তর---অনেক অনেক দূর বিস্তৃত। সেই প্রান্তরের দিগন্তে শাল পিয়াল আর মৌ-মহুয়ার বন। এমন শূন্য খাঁ খাঁ প্রান্তরের শেষে, সেই সবুজবন যদি না থাকতো—বাঁকুড়ার রিক্ত প্রান্তরে বাউল-সুর হয়তো হারিয়ে যেতো। হয়তো বনে বনে বাউলসুর এমন করুণ হয়ে উঠতো না। বাঁকুড়ার বিশাল মাঠের শেষে, তাল তমাল শাল পিয়াল, মৌ-মহুয়ার সবুজ শান্ত বন, নতুন করে টুনুর চোখে মায়া

অঞ্জন পরালো। চুনতি, সেই একদেশ! আর বাঁকুড়া, এই একদেশ! চুনতি আর বাঁকুড়া! দু'টোর আকর্ষণ দু'রকম।

টুনুদের বাসা ছিলো বাঁকুড়ার এক মুক্ত পরিবেশে। বাসার সামনে আঁকা-বাঁকা রাঙামাটির পথ—সে পথ 'লেদি' আর 'মশক' পাহাড়ের গা ঘেঁষে, কোথা থেকে কোথায় চলে গেছে তার ঠিক ঠিকানা নেই। সেই ধুলো ওড়ানো রাঙামাটির পথ ধরে, শ্লথগতিতে ছই দেওয়া গরুর গাড়ী যাওয়া আসা করে। ছইয়ের মধ্যে মোটমাট নিয়ে, গুটি গুটি হয়ে বসে থাকে যাত্রীর দল। গাড়োয়ান বাউলসুরে গান ধরে—আর সেই সুরের রেশ বাতাসে বাতাসে ভেসে যায় দূর দূরান্তে। তখন পথচারী পথিকের মন উদাস শান্তিতে ভরে ওঠে। চাকায় চাকায় রাঙামাটির ধুলো ওড়াতে ওড়াতে, গাড়ীখানা পথের বাঁকে মোড় নেয়। গাড়ীর নিচে দড়ি দিয়ে বাঁধা, কালিপড়া হারিকেন লণ্ঠনটা অনবরত হেলতে দুলতে থাকে আর গরুর গলায় বাঁধা ঘন্টাটি মিষ্টি শব্দ করে।

সেই পথেই আবার সাঁওতালের মিছিল যায়—এক জায়গায় ওরা বেশীদিন টিকতে পারে না। ওদের স্বভাব যাযাবরের, তাই বারবার পথের ডাকে সাড়া দেয়। টুনুদের বাসার সামনে, সেই রাঙামাটির পথ ধরে ছেলেপুলে, পোটলা-পুটলি, তীর ধনুক নিয়ে সুদিনে ওরা চলে যেতো বীরভূম, মানভূম, বর্ধমান ও আসানসোলে কাজ কর্মের খোঁজে। কয়লার খনিতেই ওরা কাজ করতো বেশীর ভাগ। ওই বলিষ্ঠ জোয়ান, নিকষ কালো মেয়ে পুরুষগুলোর কাপড় চোপড়, কথাবার্তা, চালচলন সবই ছিলো আলাদা। বাসার সামনে দাঁড়িয়ে সেই দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন টুনু। ছই দেওয়া গরুরগাড়ী থেকে সাঁওতাল অভিযাত্রীর দল সবই পরম বিস্ময়ের মতো টুনুর চোখে ছায়া ফেলতো। সেই বিস্ময়ের মূলে যা নিহিত ছিলো সে হলো বাঁকুড়ার রিক্ত সৌন্দর্য, বাঁকুড়ার গৈরিকরূপ। বাঁকুড়ার পথ-প্রান্তরের দিগন্তে শাল শিমুল বনের আলো আঁধারিতে ছড়িয়ে থাকা, সাঁওতালদের কুঁড়েঘরের প্রশান্তি আর পাথুরে পাহাড়ের বুক চুইয়ে চুইয়ে ঝিরিঝিরি বয়ে যাওয়া ঝরনার ধারা—এ সবই অপূর্ব মনে হতো টুনুর। মনে হতো বাউলের মতো একটা উদাস সুরের রেশ, বাঁকুড়ার বাতাসের স্তরে স্তরে, কেঁপে কেঁপে ভেসে বেড়াচ্ছে যেন—তখন

Chunati.com Pioneer in Village based website

অকারণ আনন্দে ও বেদনায়, টুনুর বুকের সমুদ্রে আবেগের জোয়ার ফুলে ফুলে উঠতো। নিজের ছোট সাইকেলখানা নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন, বাঁকুড়ার পথে পথে—ধু ধু মাঠের বুকে, পাহাড়ের ধারে, দূর দূরান্তে। এই ঘুরে বেড়ানোর কোনো সময় অসময় ছিলো না—ছিলো না কোনো ঠিকানা, ছিলো না ক্লান্তি, শ্রান্তি অথবা বিরক্তি। সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়তেন।

কারণে অকারণে সাইকেলে ঘুরে বেড়ানো টুনুর সঙ্গে, ক্রমে সাঁওতালদের একটা ছেলের পরিচয় হয়। আর সেই পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হতে দেরী হলো না। সুগঠিত সুস্থ মিশমিশে কালো একটি ছেলে,—নাম ঝমরু। উঁচু সুরের বাঁশী বাজাতো সে। সাপুড়ের বাঁশী থেকে যে কোনো বাঁশীর সুরেই টুনু পাগল হতেন। ঝমরুর বাঁশীও পাগল করলো তাঁকে। আর সেই বাঁশের বাঁশীটিই রচনা করলো দু'জনের মাঝখানে বন্ধুত্বের সেতু বন্ধন। সাধারণত একজনের সঙ্গে আর একজন যেমন ভাবে দেখা সাক্ষাৎ করে থাকে—সেই চিরাচরিত পন্থায়, দেখা শোনা করবার মধ্যে তো কোনো নতুনত্ব নেই, রোমাঞ্চও নেই কিছু। তাই মামুলী দেখা-সাক্ষাৎকে, রোমাঞ্চকর করে তোলার জন্য টুনু সুন্দর আর অভিনব এক পন্থা উদ্ভাবন করলেন। ঠিক হলো ঝমরু শিমুল গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে চড়া সুরে বাঁশী বাজাবে, তখন সেই সুর শুনে টুনু ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে। ঝমরু তাই করতো—সময় মতো, সেই নির্দিষ্ট গাছতলায় দাঁড়িয়ে, সে বাঁশীতে ফুঁ দিতো—আর সেই সুর শুনে টুনু ছুটে যেতেন ঝমরুর কাছে। তারপর দুই বন্ধু গলাগলি করে চলতেন একদিন এক একদিকে—যেদিন যেদিকে মন চায়। পায়ে পায়ে চলতে চলতে, ঝমরু টুনুকে শোনাতো সাঁওতালীদের কথা, আর টুনু শোনাতেন, কোলকাতা আর নিজের দেশ চুনতির কথা। চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে, দু'জনে বসে পড়তো সুবিধামতো কোনো জায়গায়। ঝমরু তখন কোঁচরে করে আনা 'কুদরী' মাদার' খেতে দিতো টুনুকে। আর টুনু পকেট থেকে লজেন্স বিস্কুট বের করে দিতেন ঝমরুকে। তারই মধ্যে বাঁশীতে সাঁওতালী ধুন বাজিয়ে শোনাতো ঝমরু। আর টুনু তন্ময় হয়ে শুনতেন।

ঝমরুর সঙ্গে টুনু কখনো কখনো সাঁওতাল পল্লীতে চলে যেতেন—সেখানে

Ghunati.com
Pioneer in village based website

সবাই তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানাতো। ঝমরুর বন্ধু বলেই শুধু নয়—টুনুর সুন্দর সপ্রতিভ ব্যবহার তাদের ভালো লাগতো বলেও। অমন ফুটফুটে চেহারা, অমন টানাটানা সুন্দর দু'টি চোখ, অমন রাঙা গায়ের রঙ, আর অমন মিষ্টি স্বভাবের টুনুকে ওরা ভালো না বেসে পারতো না। টুনু সাঁওতাল পাড়ায় গেলেই তারা আদর করে ডেকে বসাতো; তাদের ভুঁই থেকে তুলে এনে ফল পাঁকুড় খেতে দিতো। নিজেদের মনের মতো করে টুনুকে একটা নামও দিয়েছিলো তারা। তাকে সেই নামেই ডাকতো। এই সরল আদিবাসীরা অন্তরের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও সম্ভ্রম ঢেলে টুনুকে ডাকতো রাজাবাবু বলে। তাদের মনসা পুজায়, ইন্দু পুজায় আর নানা রকম আচার অনুষ্ঠানে তাদের রাজাবাবুর নিমন্ত্রণ ছিলো বাঁধা। এই অর্ধসভ্য মানুষগুলোর সরল ও আন্তরিক ব্যবহার কিশোর টুনুর মনে দাগ কেটেছিলো গভীর ভাবে। কিশোর মনে যে ছাপ পড়েছিলো—কখনোই তা আর মোছেনি। কিশোর টুনু বড় হয়ে শিল্পী বুলবুল হলেন, তখনও তিনি সাঁওতালদের অফুরন্ত আনন্দ ও অকৃত্রিম জীবনযাত্রার ছবি ভুলতে পারেননি। তাই হয়তো তাদের জীবনের সবচেয়ে আনন্দমুখর ঘটনা নিয়ে রচনা করেছিলেন, দ্রুত তাল লয় ও ছন্দ সমৃদ্ধ প্রাণোচ্ছল নৃত্য—'সাঁওতালের বিয়ে'।

Chunati.com
Pioneer in village based website

ঝমরুর সঙ্গে টুনুর কোনো দিক দিয়েই মিল ছিলো না। কিছুটা মিল ছিলো শুধু মনের দিক থেকেই। দু'জনেরই মন ছিলো কাঁচা, কোমল আবেগে ভরা। ওইটুকুই শুধু। না হয় শিক্ষা-দীক্ষা, ধ্যান-ধারণা, অবস্থা-পরিবেশ, সব দিক দিয়েই দু'জন ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের মানুষ। কিন্তু তাতে কি এসে যায়—প্রাণ যে দুজনেরই আবেগে ভরা। তাই সব গড়মিল থাকা সত্ত্বেও, তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিলো গভীর ভালোবাসা। দুই বিপরীত সমাজের এই দুই কিশোরের বন্ধুত্বে কিন্তু এতটুকু ফাটল ধরেনি কোনো দিন, বরং গাঢ়তর হয়ে উঠেছিলো দিনদিন।

১৯৩১ সালে বাবা মানিকগঞ্জে বদলি হন। সেই যে চোখের ধারায় নেয়ে ঝমরু টুনুকে বিদায় দিয়েছিলো—তারপর আর দু'জনের দেখা হয়নি কখনো। কিন্তু ঝমরুর স্মৃতির ফুলটি কখনো ম্লান হয়নি টুনুর মনে। তাকে টুনু যে

ভুলতে পারেননি, তার প্রমাণও রেখেছিলেন। ঝমরুর একখানা প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন টুনু। কিশোর মনের দর্পণে ধরে রাখা ঝমরুর চেহারার সঙ্গে যথা সম্ভব মিল রেখে এঁকেছিলেন সেই প্রতিকৃতি। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, তাতে রঙিন গামছা বাঁধা। হাঁটুর ওপরে ধুতি পরা, গলায় কালো তাগায় বাঁধা বড় মাদুলি, আর বাহুতে বাজু পরা ঝমরু, ঝরনার ধারে বসে পাথরে হেলান দিয়ে বাঁশী বাজাচ্ছে। ছবিখানার পটভূমি গোধূলীরাঙা ঝরনার স্বচ্ছ ধারাতেও রাঙা আকাশের নেশা। দূরে বিসর্পিল পথের চিহ্ন। ছবিটির নিচে উদ্ধৃতি চিহ্ন দেয়া কয়েকটি কবিতার লাইন :

'অচল শিখর ছোট নদীটিরে
চিরকাল রাখে স্মরণে
যতদূরে যায় স্নেহধারা তার
সাথে যায় দ্রুত চরণে

তেমনি তুমিও থাক নাই থাক
মনে কর মনে কর না
পিছে পিছে তব চলিবে ঝরিয়া
আমার আশিস ঝরনা।'

Chunati.com
Pioneer in Village based website

একটি কিশোরের কাঁচা হাতে আঁকা এই ছবিটির দিকে তাকালে তার শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া যায়। টুনুর শুভাকাঙ্ক্ষী ও বাবার বন্ধুবান্ধব যাঁরা সেই ছবিখানা দেখেছেন, তাঁরা সকলেই ছবিটির অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। কিন্তু ছবিটি দেখে যে সবচেয়ে বেশী খুশী হতো, সেই ঝমরু কিন্তু ছবিটি দেখেনি কোনোদিনও।

অমানিশার অন্ধকারে কবি যে সৌন্দর্য ও কাব্যের সন্ধান পান—ধূসর রুক্ষতার মধ্যে টুনুও যেন সন্ধান পেয়েছিলেন অনুরূপ সৌন্দর্যের। গেরুয়া মাটির দেশ বাঁকুড়া ছিলো বুলবুলের শিল্পীজীবনের অন্যতম উন্মেষ ক্ষেত্র। বাঁকুড়ার উদাস প্রকৃতির মধ্যে তিনি যেন এক অবারিত সৌন্দর্য ও সুরের সন্ধান পেয়েছিলেন। অনাগতকালের এক শিল্পীর মনে সেই সুর যেন

ঝঙ্কৃত হয়ে উঠতো। তিনি ছটফট্ করতেন সেই সুর বাইরে প্রকাশ করার জন্য। কিন্তু কি ভাবে আর কিসের মাধ্যমে যে তা প্রকাশ করবেন, তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারতেন না তখন। তাই অপ্রকাশের বেদনায়, অব্যক্ততার যন্ত্রণায় তাঁর মন-প্রাণ কেঁদে উঠতো।

বাঁকুড়ার মৌ-মহুয়ার বন, চাতকের কান্না, শাল পিয়ালের ঘন বিথারে আলোছায়ার কাঁপন, দিন ও রাতের প্রশান্তি আর দিগন্তে হারিয়ে যাওয়া রাঙামাটির পথরেখা—টুনুর মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে যেন তুলে ধরতো অলিখিত একটি কবিতা। সেই কবিতা টুনুর শিল্পীমনকে করেছিলো পাগল, দিয়েছিলো সৃষ্টির প্রেরণা। সেই সময় থেকে ব্যক্ত করবার, প্রকাশ করবার যন্ত্রণায় তুলি হাতে নেন টুনু, আর লিখবার জন্য তুলে নেন কলম। তারপর মৌ-মহুয়ার শীর্ষে শীর্ষে, আকাশের গায়ে গায়ে, মেঘ ডাকার সঙ্গে মনও যেন তাঁর পেখম মেলতে লাগলো। সেই থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্যন্ত টুনু কখনো হলেন চিত্রশিল্পী, কখনো কথাশিল্পী, কখনো বা কবি।

Ghunati.com
Pioneer in village based website

শিল্পের এক অদম্য আবেগে, যখন টুনুর হৃদয় মন টগ বগ করে ফুটছিলো, তখন তিনি বাঁকুড়াতে দু'জন স্নেহশীল ও গুণী ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেলেন। এঁদের একজন হলেন আবুল কাসেম সাহেব, আর একজন হলেন রাজেনবাবু (রাজেন বাবুর পদবী আজ আর মনে নেই)। ১৯২৮-২৯—দু' বছরের কিছু বেশি বাবা বাঁকুড়ায় ছিলেন।

আবুল কাসেম সাহেব ছিলেন সে যুগের একজন বলিষ্ঠ লেখক। তিনি শুধু সংস্কৃতিবানই ছিলেন না, ছিলেন পদস্থ সরকারী কর্মচারীও। কিন্তু সে ছিলো তাঁর বাইরের পরিচয়, আসল সংস্কৃতিবান মানুষটি লুকিয়ে ছিলো কাসেম সাহেবের মনের অন্তরালে। সেইটি হলো তাঁর সত্যিকার রূপ, সত্যিকার পরিচয়। ব্যক্তিগত জীবনে কথায় কাজে, আলাপে আলোচনায় তিনি ছিলেন রুচিবান মানুষ। ছবি আঁকাতেও তাঁর খুব ঝোঁক ছিলো, দক্ষতাও ছিলো। প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকতেই তিনি ভালো বাসতেন। নিজের বাড়িতে একটা পাঠাগার করেছিলেন—পাঠাগার তো নয়, সে ছিলো যেন তাঁর প্রাণ। বাড়ির মধ্যে সব-চেয়ে প্রশস্ত কামড়াটিতে ছিলো তাঁর পাঠাগার। সময় ও সুযোগ পেলে

তিনি বেরিয়ে পড়তেন দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে—সে দিকে তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিলো। ভ্রমণ বৃত্তান্তই তিনি লিখতেন বেশী। পুরোনো সওগাত, মোহাম্মদী, স্বদেশ ইত্যাদি পত্রিকাতে তাঁর সে সব লেখা আজও দেখতে পাওয়া যায়। লেখাপড়া করা, ছবি আঁকা ছাড়া বাগান করার সখও ছিলো তাঁর। বাগানের পেছনে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করতেন, প্রচুর অর্থও ব্যয় করতেন। তাঁর বাগানখানা দেখলে মনে হতো—বাঁকুড়ার রুঠা মাটির বুকে যেন এক টুকরো 'ওয়েসিস'। কাসেম সাহেবের পাঠাগার আর তার সামনে বাগানের অবস্থান দেখে মনে হতো যেন অপার কৌতূহল নিয়ে একে অপরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে—কে জানে, অন্যের মধ্যে কত রহস্য কত সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে!

প্রায় প্রতিদিন অফিস থেকে ফিরে কাসেম সাহেব বাগানে গিয়ে বসতেন। মাধবীলতার ঝাড় যেখানে অজস্র ফুলের ভারে বিনত হয়ে ছায়া রচনা করছে, তারই নিচে একখানা ইজিচেয়ারে বসে পড়াশোনা করতে দেখা যেতো তাঁকে। তাঁর দু'পাশে থাকতো দুটো ছোট্ট টুল—একটাতে থাকতো খান কয়েক বই, অন্যটাতে থাকতো কালো পাথরের রেকাবিতে কয়েকটা ফুল, আর রেঙ্গুনলতার দু'চারটি পাতা। অফিসের একঘেয়ে কাজের পর এই সময়টির জন্য তিনি উন্মুখ হয়ে থাকতেন। তাঁর মতে, নিবিষ্টচিত্তে বই পড়বার এই হচ্ছে প্রশস্ত সময়। তাঁর হাতের বইটি হয়তো বিখ্যাত কোন কবি-দার্শনিকের, কবি তাঁর অতলান্ত অনুভবের মুহূর্তে এক সময় যা লিখেছিলেন—কত শতাব্দী পর শান্ত বিকেলে মুগ্ধ হৃদয় এক ভক্ত পড়ছেন সেই কবিতা। বিকেলে সেই সুস্মিত শান্তির মধ্যে টুনুও কখনো এসে বসতেন কাসেম সাহেবের পাশটিতে। তিনি নিজের পছন্দ মতো বই টুনুকে পড়তে দিতেন। একজন প্রবীণ আর একজন নবীন—দু'জনের বাঁচার জগৎ, চিন্তার জগৎ, পড়ার জগৎ সব কিছুই ভিন্ন। অথচ তারই মধ্যে দু'জনের মনে ঐক্যের একটা সেতু যেন গড়ে উঠেছিলো। হয়তো সেই সেতুর দুই দিকের ভিত্তি ছিলো উভয়ের নিষ্ঠা ও প্রবণতার ঐক্য। কোনো কোনোদিন তেমনি বসে বসে কাসেম সাহেব টুনুকে গল্প শোনাতেন, কোনদিন ছবি আঁকাতেন। তেমনি করে বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এলে তিনি টুনুর হাত ধরে বাড়ি পৌছে দিয়ে আসতেন। টুনুর প্রতি তাঁর ভালোবাসা

Chunati.com
Pioneer in village based website

ছিলো এমনি গভীর ও ঐকান্তিক। এইভাবে এক প্রবীণ ও এক নবীন মনে গড়ে উঠেছিলো নিবিড় ভালোবাসা—স্নেহ ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক। টুনুর সঙ্গে কাসেম সাহেবের পরিচয় হয় নাটকীয় ভাবে। নিজের অফিসে বসে তিনি দেখতেন—একটি মিষ্টি ছেলে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে স্কুলে যাওয়ার পথে, তাঁর অফিসের সামনে রোজ একবার করে থমকে দাঁড়ায়, আর সেইখানে বসে যে অন্ধ ফকিরটি ভিক্ষা করে, তাকে পয়সা দিয়ে যায়। প্রায় দিনই এই দৃশ্য তিনি দেখতেন। ছেলেটি যেতে যেতে ওইখানটাতে এসে দাঁড়াচ্ছে, আর ফকিরটিকে পয়সা দিচ্ছে। এ'টি যেন তার নিত্যকার রুটিনেরই অঙ্গ। এমন কি যেদিন স্কুল ছুটি থাকতো, সেদিনও ছেলেটি আসতো পয়সা দিয়ে যেতে। কাসেম সাহেব প্রায় রোজই দেখতেন সেই একই ব্যাপার। রোজ দেখতেন বলেই তাকে উপেক্ষা করতে পারলেন না তিনি। তাঁর শিল্পীমন, দয়ালু ও স্নেহশীল মন আকর্ষিত হলো ছেলেটির দিকে। হয়তো তাঁর মনে এক অদম্য কৌতূহল জাগলো—কে এই অদ্ভুত ছেলেটি?

অভ্যাস মতো ছেলেটি একদিন ওখানে দাঁড়াতেই কাসেম সাহেব অফিস থেকে বেরিয়ে একেবারে ওর সামনে এসে দাঁড়ালেন। কচি কচি হাত দুটো টেনে নিয়ে, সে স্নেহে জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কে বাবা? নাম তোমার? কার ছেলে তুমি?

সেই হলো প্রথম আলাপ,—পরিচয়ের সূত্রপাত। সেই থেকে টুনুর সঙ্গে নিঃসন্তান কাসেম সাহেবের ঘনিষ্ঠতা, বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা। তাঁকে টুনু চাচা বলে ডাকতেন। টুনুর দেখা পাবার আগে, যখনই তিনি ছুটি পেয়েছেন ভেসে বেড়িয়েছেন এক জায়গা অন্য জায়গায়; কিন্তু পরে তাকে ছেড়ে কোথায়ও যাননি তিনি। সে সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে বলতেন: টুনু তো আমাকে একদিন ছেড়ে যাবেই, তাই ওকে ছেড়ে কোথাও আর যাচ্ছি না। এই ছেলে সব কিছুর ওপরে। আমি যেন শুনতে পাই, ওর বুকে 'কিটস্' 'শেলি'র কাব্য উচ্ছ্বাস স্পন্দিত হচ্ছে। ওকে ছেড়ে কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই আর।

কাসেম সাহেবের লাইব্রেরী, কাসেম সাহেবের বাগান, কাসেম সাহেবের চিত্রাঙ্কন আর তার সঙ্গ, টুনুর সুপ্ত প্রতিভাকে সোনার কাঠির পরশ দিয়ে

Chunati.com
Pioneer in village based website

জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিলো। তাঁর স্নেহে ও সান্নিধ্যে, তাঁর বিদগ্ধ মনের স্পর্শে, টুনুর মনের মুকুল, দল মেলেছিলো—তারপর সেই পাপড়ি আর কোনোদিন ঝরে পড়েনি বরং অনুকূল আলো বাতাসে ধীরে ধীরে পূর্ণ বিকশিত হয়ে সুবাস ছড়াতে শুরু করেছিলো।

বাঁকুড়া ছাড়বার অনেক দিন পর টুনুর সঙ্গে একবার কাসেম সাহেবের দেখা হয়েছিলো। তিনি পথের ডাকে পশ্চিম দিকে ধাওয়া করছিলেন তখন। হাওড়া স্টেশনে টুনুকে দেখামাত্র চিনতে পেরে বুকে জড়িয়ে শিরশ্চুম্বন করে সেই যে বিদায় নিলেন—তারপর টুনুর সঙ্গে অথবা টুনুদের পরিবারের আর কারো সঙ্গে তাঁর আর দেখা হয়নি। কিন্তু তাঁকে তারা কেউ ভুলতে পারেনি। কোনো দিন ভুলতেও পারবে না। তাঁদের স্মৃতিতে কাসেম সাহেব অমর হয়ে থাকবেন।

চুনতির সবুজ প্রকৃতি, আর বাঁকুড়ার রিক্ত সৌন্দর্য টুনুকে মুগ্ধ করেছিলো। হয়তো তারই ফলে হাতে তুলে নিয়েছিলেন ছবি আঁকার তুলি। চোখে দেখা সৌন্দর্যকে রঙে রেখায় ধরে রাখবার প্রয়াস। [illegible] প্রথম হাতে খড়িও হয়েছিলো কাসেম সাহেবের [illegible] গন্থ একজন স্নেহশীল শিল্পীর সান্নিধ্যে আসেন, তিনি হলেন টুনুর 'রাজেন-দাদা'।

Chunati.com
Pioneer in village based website

টুনুর রাজেনদা'র পুরো পরিচয় দিতে যাওয়া অপচেষ্টামাত্র। কারণ—প্রথমতঃ তিনি যে জগতের মানুষ, তার সঙ্গে আমার পরিচয় অত্যন্ত কম। তা ছাড়া তাঁর 'স্বদেশ' ও দেশের 'জনগণ' নিয়ে বিস্তৃত জীবনের বিশদ বর্ণনা এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকও হবে না। তিনি ছিলেন অন্য দশজনের চাইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র—সে যুগের আদর্শনিষ্ঠ এক স্বদেশী বিপ্লবী'। তাঁর বাড়ি ছিলো বাংলাদেশে। আঠারো উনিশ বছর বয়স থেকেই শুরু হয় তাঁর বন্দীজীবন। তাঁর ব্যক্তিত্ব, নির্ভীক চরিত্র, রাজনৈতিক আদর্শ এবং কর্মপন্থা এমন ছিলো যে, তৎকালীন ইংরেজ সরকার তাঁকে কারাগারের বাইরে স্বাধীন ভাবে ঘোরাফেরা করতে দিতে ভয় পেতো। যখন বন্দী করবার মতো তেমন সুবিধাজনক কোনো ছল-ছুতো পেতো না, তখন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মীদের কাছ থেকে দূরে, অন্য কোনো শহরে বা গ্রামাঞ্চলে সরকারী তত্ত্বাবধানে তাঁকে

রাখা হতো। তাদের নির্দিষ্ট একটি বাড়িতে তাঁকে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হতো। 'বাউণ্ডারি'র বাইরে যাওয়ার হুকুম ছিলো না। সরকারী অভিধানে এ অবস্থাকে 'কারাবন্দী' বলা হতো না—বলা হতো 'নজরবন্দী'।

বাঁকুড়ার থানা অফিসের কাছাকাছি, ছোট্ট একটি বাড়িতে, তখন টুনুর রাজেনদা ছিলেন নজরবন্দী হয়ে। একদিন বিকেলে ওই বাড়ির সামনে অকারণে ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে টুনু প্রথম আবিষ্কার করলেন রাজেন বাবুকে। বাড়ির সামনে একটুখানি জায়গায়, তখন পায়চারি করছিলেন তিনি। রাজেনদা'র দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন টুনু। দৃঢ় দৃপ্ত এই লোকটিকে আগেতো কখনো দেখেননি তিনি! টুনুর সেই দৃষ্টি হয়তো এ কথাই বলতে চাইলো। রাজেন বাবুও হঠাৎ টুনুকে দেখে খুশী হলেন। টুনুর সপ্রতিভ হাবভাব ভালো লাগলো—পায়চারি বন্ধ করে তিনি টুনুকে কাছে ডাকলেন। পাহারারত সান্ত্রী টুনুকে চিনতো বলেই ভেতরে ঢুকতে বাধা দিলো না।

সেই থেকে টুনু প্রায়ই রাজেন বাবুর কাছে যেতেন। মায়ের হাতের তৈরী নাস্তা, আচার মোরব্বাও নিয়ে যেতেন সঙ্গে করে। প্রথম দিকে বাবা তেমন খেয়াল করেননি, পরে অবশ্য বুঝতে পারলেন টুনু কোথায় যায়। তখন তিনি অবশ্যই নিষেধ করলেন টুনুকে। কিন্তু তিনি ঘোর আপত্তি করে বললেন : রাজেন বাবু যে খুব সুন্দর ছবি আঁকতে পারেন আব্বা। আমি যে ওঁর কাছে ছবি আঁকতে শিখছি। আমাকে রাজেনদা খুব ভালোবাসেন।

: কিন্তু উনি নজরবন্দী বাবা, ওঁর কাছে অত আসা-যাওয়া না-ই-বা করলে? প্রবলভাবে মাথা নেড়ে আপত্তি করে টুনু বললেন : কিন্তু উনি তো খারাপ লোক নন, উনি তো আমাকে ভালোলোকদের কথা শোনান। জানেন আব্বা? রাজেনদা'র কাছে কত বড় বড় সব বই আছে! ওই বই থেকেই তো আমায় গল্প বলেন। বাবা বুঝলেন টুনুর আগ্রহ কোথায়—তাই তিনি পুত্রের অনুসন্ধিৎসু মনের কাছে সানন্দে হার মানলেন।

বাবা ছিলেন পুলিশ ইনস্পেক্টর এবং একই সঙ্গে তিনি ছিলেন নির্ভেজাল দেশপ্রেমিক। সেই অগ্নিক্ষরা স্বদেশী যুগে বাবা কত বিপ্লবীকে গোপনে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। কত রাজবন্দী নজরবন্দীকে কৌশলে পালাবার পথ করে

Chunati.com Pioneer in village based website

দিয়েছেন। একজন দায়িত্বপূর্ণ পুলিশ অফিসারকে মস্ত ঝুঁকি নিয়েই সরকারী নীতিবিরুদ্ধ কাজ করতে হয়েছে। আর তার খেসারতও দিতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর প্রমোশন বন্ধ করে রাখা হয়ছিলো। ডি. এস. পি. ও এস. পি.র দপ্তরের দায়িত্বে সাময়িকভাবে থাকা সত্ত্বেও, তাঁকে প্রমোশন দেওয়া হয়নি। অবশ্য এ কথা নিতান্তই সত্যি যে, বাবার গভীর দেশ প্রেমের কাছে ক্ষমতার লোভ, যশের মোহ ছিলো অতি তুচ্ছ!

নিজের ছোট্ট ঘরটিতে একলা বসে রাজেন বাবু বই পড়তেন, কখনো বা ছবি আঁকতেন। কিংবা প্রশান্ত ছুটো চোখ মেলে, নীরবে জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকতেন। গুণগুণিয়ে গান গাইতেও শোনা যেতো মাঝে মাঝে। তাঁর গলার আওয়াজ ছিলো গুরুগম্ভীর। আস্তে আস্তে অথচ খুব জোর দিয়ে কথা বলতেন তিনি। মোটা খাদি ছিলো তাঁর পরিধেয়। রাজেন বাবুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, খদ্দরে আরো যেন ফুটে উঠতো। তখন তাঁর বয়স ত্রিশের মতো। সাধারণ মানুষ কেউবা ভয়ে, কেউবা শ্রদ্ধায় তাকিয়ে দেখতো রাজেন বাবুর বাড়ির দিকে।

রাজেন বাবুর সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত কথা শোনা যেতো। তাঁর নিজের আলাপ আলোচনায়ও বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেতো। টুন্নু বালক হলেও হয়তো বুঝতে পারতেন, রাজেন বাবুর গরজহীন লেখাপড়া, ছবি আঁকা ও তাঁর চিন্তামগ্নতার মধ্যে একটা বিশেষত্ব রয়েছে। যা হলো স্বতন্ত্র জীবনচেতনা ও সর্বত্যাগীর আদর্শ। তাই হয়তো রাজেন বাবুর সেই গম্ভীর পরিবেশে তিনি স্বাচ্ছন্দ্যে অনেক সময় কাটিয়ে দিতে পারতেন। আরো একটা বড় আকর্ষণ ছিলো—সে হলো গল্পের আকর্ষণ। সিরাজদ্দৌলা, ডিভ্যালেরা ও টিপু সুলতানের মতো আরো অনেক দেশ প্রেমিকের কথা টুন্নু রাজেন বাবুর মুখে শুনতেন। রাজেন বাবুর উপলব্ধি দিয়ে টুন্নু সে সব কথা বুঝতে পারতেন না সত্য—কিন্তু তবুও তাঁর সহজাত স্পর্শকাতর মন নিয়ে নিজের মতো করে সব কথা বুঝে নিতে চেষ্টা করতেন নিশ্চয়। তাই তাঁর মনের কাছে এই দেশপ্রেমিকের সান্নিধ্যটুকু পরম আনন্দের হয়ে উঠেছিলো। সব রকম বালক-বালিকার অবচেতন মনের ওপর তাদের প্রিয়জনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একটা ছাপ পড়ে থাকে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে

Chunati.com Pioneer in village based website

সঙ্গে কোনো কোনো বালক-বালিকার প্রত্যক্ষ জীবনে তার সুন্দর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। টুনুরও তাই হয়েছিলো—রাজেন বাবুর প্রভাব পড়েছিলো তাঁর স্বভাবে চরিত্রে ও আচার-আচরণে।

রাজেন বাবু প্রতিকৃতি আঁকাতেই দক্ষ ছিলেন অধিকতর। গান্ধীজী, শ্রী অরবিন্দ, লেলিন, ডাঃ আনসারী, সান ইয়াত সেন এবং আরো অনেক কালজয়ী পুরুষের ছবি তাঁর তুলিতে মূর্ত হয়ে উঠেছিলো। টুনুর ছবি আঁকার হাতেখড়ি আগেই হয়েছিলো। এবার রাজেনদা'র হাতে প্রথম পাঠ নিলেন ফিগার আঁকার। রাজেন বাবু সস্নেহে, সযত্নে টুনুকে শেখাতেন ফিগার আঁকার টেকনিক। এই কৌশলটুকু টুনু অতি সহজে শিখে নিয়েছিলেন।

রাজেন বাবু বাঁকুড়ায় নজরবন্দী অবস্থায় থাকা কালেই বাবা বদলি হয়ে গেলেন মানিকগঞ্জে। সেখানে এসে টুনু কেমন যেন মনমরা হয়ে গেলেন। বাঁকুড়ায় থাকার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় পর, বহু চেষ্টাতেও রাজেন বাবুর কোনো খবর আর পাননি কোনোদিন। বাঁকুড়ার ঠিকানায় টুনু চিঠি লিখতেন, রাজেন বাবুর কাছে। কিন্তু জবাব আর কোনোদিনই আসেনি। হয়তো সেসব চিঠি রাজেন বাবুর হাতেই পড়েনি। হয়তো বা, রাজেন বাবুর জবাব, কারাপ্রাচীরের বাইরে বেরুবার সুযোগ পায়নি। হতে পারে—তিনি হয়তো একটি নবনীত প্রাণের মায়ায় নিজকে আর বাঁধতে চাননি। যে কারণই হোক—টুনু জীবনে আর কখনো রাজেন বাবুর দেখা পাননি। সেই সময় টুনু রাজেন বাবুর বাড়ির ঠিকানা খোঁজ করবার কথাও ভেবেছিলেন, কিন্তু রাজেন বাবু তো কোনোদিন সঠিকভাবে বলেননি—কোথায়, কোন গ্রামে, কোন জেলায় তাঁর বাড়ি। শুধু বলেছিলেন: 'পূর্ব বাঙ্গলার এক পাড়াগাঁয়ে আমার বাড়ী।' কিন্তু বাংলাদেশের অগুনতি গ্রামের মধ্যে সে গ্রাম কোথায়! কোনটি? পরে অবশ্য মনে হয়েছে বাবা হয়তো রাজেন বাবুকে পালাবার পথ করে দিয়েছিলেন।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে টুনুর উপলব্ধি যত গভীর হতে লাগলো—ততই ওই নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিকটির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছিলেন। দুঃখ, বেদনা আর ব্যর্থতা অনেক সময় সৃষ্টির প্রেরণা দিয়ে থাকে। রাজেন বাবুর

নৈকট্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে টুন্নুর জীবনে একথা সত্য হয়ে উঠেছিলো। রাজেন বাবুর স্মৃতির সঙ্গে জড়িত সেই দিনের অনেক ঘটনা টুন্নু নিজের মনের মতো করে লিখে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ভরে তুলতেন। রাজেন বাবুকে উদ্দেশ করে কবিতাও লিখেছিলেন। তার মধ্যে একটি কবিতার কয়েকটি লাইন ছিলো:

তোমার কথা ভাবতে গিয়ে
নিজেই আমি যাই হারিয়ে
মোর সুরের ধারা হয় যে হারা
ব্যথার মরু মাঝে- - -

১৯৩০ সনের দিকে বাবা বাঁকুড়া থেকে মানিকগঞ্জ বদলি হয়ে আসেন। '৩২-'৩৩ সনের দিকে টুন্নু খাদি পরিধান করতে শুরু করেন। তারপর একটানা ৪/৫ বছর তিনি খাদি পরিধান করেছেন। এটা প্রত্যক্ষভাবে রাজেন বাবুর প্রভাব বলেই আমার ধারণা। অবশ্য সে যুগে তার সহপাঠিদের মধ্যে অনেকেই খাদি পরতেন।

Chunati.com
Pioneer in village based website

কাসেম সাহেব আর রাজেন বাবুর সান্নিধ্য থেকে টুন্নু যা পেয়েছিলেন, তার মধ্যে ছবি আঁকার প্রতি ঐকান্তিকতা বেশী করে প্রত্যক্ষ গোচর হতো প্রথম দিকে। নিজের খেয়াল-খুশি মতো অবিরাম আঁকতেন। ছবির নির্দিষ্ট খাতাখানা শেষ হয়ে গেলে তাঁর ছবি আঁকাতে ছেদ পড়তো না। ভাই-বোনদের খাতাপত্র, বই পুস্তকের সাদাপাতা, আর ক্যালেণ্ডারের উল্টো পিঠ কিছুই আর বাদ গেলো না টুন্নুর তুলির আঁচড় থেকে।

ঘরবাড়ি, পশুপাখি, গাছপালা, সবই আঁকতেন। শালিক চড়ুই ধরনের ঘরোয়া পাখির ছবি আঁকার ব্যাপারে নিজের খেয়াল মতো সুন্দর এক পন্থার আশ্রয় নিয়েছিলেন। বাড়ির উঠান, বারান্দা, অনেক সময় ঘরের মধ্যেও শালিক জাতীয় পাখি নির্ভয়ে চড়ে বেড়ায়। যখন ওরা ঘরের ভেতর চরে বেড়াতো— টুন্নুর নীরব ইশারায় আর অনুনয়ে খুকু মুঠো মুঠো চাল ছড়িয়ে দিতো ঘরের

মেঝেতে। চকিত চঞ্চল পাখিগুলো, খুঁটে খুঁটে খেতো খাদ্যকণা, আর সেই সুযোগে টুনু আড়ালে, আবডালে বসে এঁকে ফেলতেন অবিকল সেই পাখি!

প্রথমদিকে বিক্ষিপ্ত ভাবে পাখি, ফুল, পাহাড়, নদী, ঘরবাড়ি আঁকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো টুনুর প্রচেষ্টা। ক্রমাগত আঁকতেন বলে হাতও খুলে গেছে তখন। মানিকগঞ্জে আসার পর প্রাকৃতিক দৃশ্য, মানুষের ছবি আঁকার দিকে ঝোঁক চাপে। তার ফলে ১৯৩৪ সালে মানিকগঞ্জের এক চিত্র-প্রদর্শনীতে টুনুর আঁকা দুটো ছবি প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলো। তার মধ্যে একখানা নিজের প্রতিকৃতি, অন্যখানা শ্যামল বাংলার একটি নদীর দৃশ্য—নদীর বুকে পালতোলা ছোট্ট একখানা নৌকা ভেসে চলেছে।

সে সময় কয়েকখানা ব্যঙ্গচিত্রও টুনু এঁকেছিলেন। তার মধ্যে একখানা ছবিতে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি টুনুর মনের ওপর যে ছাপ ফেলেছিলো, তারও স্পষ্ট স্বাক্ষর রয়েছে। ভারতের একখানা মানচিত্রের নিচে একটি হৃষ্টপুষ্ট বিড়াল, সঙ্কুচিত অথচ লুব্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে ভারতবর্ষের দিকে, একপাশে একটি চরকা, মানচিত্রের শীর্ষে একখানা রঙিন পতাকা উড়ছে। বিড়ালটির নিচে লেখা—'সোনার ভারতে বিড়াল বাচ্চা'। এই ছবিখানাতে টুনুর রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বিড়াল বাচ্চাটি হচ্ছে 'বিদেশী'—যে ভারতের ওপর তখনো লোভাতুর। ভারত ছাড়তে সে রাজী নয়—ছলে-বলে-কৌশলে ভারতবর্ষ কুক্ষিগত করে রাখাই হলো তার লক্ষ্য। অন্যদিকে রঙিন পতাকা ও চরকা হলো তৎকালীন ভারতবাসীর গণচেতনার প্রতীক। তখনো লীগের জয়যাত্রার জোয়ার আসেনি ভারতের রাজনৈতিক জীবনে। চরকাই ছিলো তখন ভারত-বাসীর প্রতিরোধ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের মৌলিক প্রতীক। টুনুর শৈশবের স্মৃতি সমৃদ্ধ নানারকম জিনিসপত্রের মধ্যে সেইসব ছবির কয়েকখানা আজও দেখতে পাওয়া যায়।

টুনুর মনের ওপর এই রাজনৈতিক প্রভাব ফেলেছিলেন রাজেনদা। গল্প কাহিনী ও ইতিহাসের ঘটনাবলীর মধ্যে তিনি কৌশলী-শিল্পীর মতো টুনুর মনে দেশাত্মবোধটি জাগিয়ে তুলতেন। সাধারণ কথা বার্তায়ও তিনি টুনুর

মনে যেন বাণী পৌঁছাতেন: 'দেশকে ভালোবাসো', 'দেশের মানুষকে ভালোবাসো', 'অত্যাচারীকে ঘৃণা কর'…। রাজেন বাবু হয়তো টুনুর চোখে প্রতিভার দীপ্তি দেখেছিলেন, হয়তো বা টুনুর মধ্যে অনাগত শিল্পপ্রতিভার আভাষ পেয়েছিলেন—তাই পরম যত্নে টুনুকে নিজের মনের সুরভি ঢেকে অভিসিক্ত করতেন।

টুনু যেসব ছবি এঁকেছেন তার মধ্যে ছ'চারটি ছবি ছিলো, যা টুনুর নিজের চোখেও খুব ভালো লাগতো। নিজের আঁকা সেই ছবির দিকে চেয়ে বোনদের বলতেন: জানিস, এসব ছবি কেমন সুন্দর হয়েছে? মনে হয় কোনো বড় চিত্রকরের আঁকা। নিজের আঁকা সে সব ছবিতে নামের পাশে লিখতেন 'দি গ্রেটেষ্ট বয় আর্টিষ্ট অব দি ঈষ্ট'। তিনি প্রাচ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কিশোর শিল্পী হয়তো ছিলেন না, কিন্তু বড় হবার স্বপ্ন ছিলো তাঁর অবচেতন মনে। হয়তো সেই স্বপ্ন কোনো আবেগময় মুহূর্তে তাঁর চোখে ধরা দিয়েছিলো। পরবর্তীকাল প্রমাণ করেছেন যে, সেদিন টুনু 'দি গ্রেটেষ্ট আর্টিষ্ট অব দি ঈষ্টে'র যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সে স্বপ্ন বিফল হয়নি—সফল ও সার্থক হয়েছিলো তাঁর সেই সুন্দর স্বপ্ন।

Ghunati.com
Pioneer in village based website

দশ

প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার কিছুদিন আগে টুনু সেই যে রঙ তুলি রেখে দিলেন—তা আর কোনো দিন হাতে নেননি। হঠাৎ কোন খেয়ালের বশে যে তিনি ছবি আঁকা ছেড়ে দিলেন, কাউকে তা বলেননি। সে সম্বন্ধে নিজে কি বুঝেছিলেন জানতে চাইলে ঠিক উত্তরটি পাওয়া যেতো না।

ছোটবেলা থেকেই টুনু গল্পের বই, কবিতার বই পড়তে খুব ভালবাসতেন। তাঁর অতিরিক্ত চঞ্চলতা স্থির শান্ত হয়ে যেতো একখানা বই হাতে পেলে। ছেলেবেলা থেকে টুনু দেখেছেন, অবসর পেলেই বাবা একটা না একটা বই খুলে বসেছেন। আর তাতেই মগ্ন হয়ে আছেন। বাবার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেও পড়াশোনার ব্যাপারে অনুরূপ অনুরাগ দেখতে পেতেন। তারপর

একটু বড় হয়ে, তিনি নিজেও ছোটদের নানা ধরনের বই পড়ে আনন্দ পেতে লাগলেন। পরে কাসেম সাহেব আর রাজেন বাবুর সাহচর্যে এসে সেই আনন্দ আরো গভীর আরো বিস্তৃত হয়েছিলো।

কৌতুকপ্রিয়তা চরিতার্থ করতে গিয়ে ছোট ছোট ছড়া লেখার মধ্যেই, টুনুর প্রথম সাহিত্য প্রচেষ্টার সূচনা। বোনদের নিয়েই লেখা হতো ছড়াগুলো। টুনুর বোনদের মধ্যে খুকুকে সে কিছুটা ভয়ই করতো, কারণ খুকুর মেজাজ একবার বিগড়ে গেলে রক্ষে থাকতো না। তাই খুকুকে বেশী ঘাঁটাতে সাহস হতো না। সুতরাং সুলুকে নিয়েই লাগতেন। সুলুর নামে ছড়া লিখে, তাকে খেপিয়ে, কিংবা তার পুতুলের নামে ছড়া লিখে, তাকে কাঁদিয়ে টুনু খুব আমোদ পেতেন। তাতে করে এক কাজে দু'কাজ হতো। চেঁচিয়ে আবৃত্তি করে নিজের লিখিত ছড়াগুলো অন্যদের শোনানো, আর যে উদ্দেশ্যে ছড়া লেখা, তার সাফল্য যাচাই করে দেখা। অর্থাৎ—বোনটিকে কাঁদিয়ে প্রমাণ করা। সুলু কাঁদলে তিনি পরম কৌতুকে হেসে উঠতেন হাততালি দিয়ে। বোনের কান্না যদি মাত্রা ছাড়িয়ে উঠতো, তখন আবার নিজের টিফিন খরচা থেকে, রঙিন পুঁতি, 'লেবেনচুষ' কিনে দিয়ে তার মুখে হাসি ফোটাতে ব্যস্ত হয়ে উঠতেও দেরী করতেন না।

বোনটিকে কাঁদাবার খেয়াল হতেই টুনু তাঁকে লক্ষ্য করতেন—কখন সুযোগ আসে। হয়তো ছোট বোনটি আপন মনে হেলেদুলে তালি বাজাচ্ছে, অথবা গুণগুণ করে গান গাইছে, নয়তো আপন মনে কথা বলছে। সেই অবস্থায় তাকে দেখে টুনু ভাবলেন: আচ্ছা, এই অবস্থায় ওকে কাঁদালে কেমন হয়, হাসি মুখখানা কেমন হাঁড়িপানা হয়ে যাবে! তারপর এক মুহূর্ত দেরী নয়—কেমন খাঁ করে, সুলুর সামনে এসে দাঁড়াতেন আর হাত নেড়ে, ভঙ্গি করে স্বরচিত ছড়া আওড়াতেন:

সুলুমনি দিগম্বর
শাড়ীখানা নিলাম্বর
মুখখানা তার রাক্ষস
সবাই ডাকে খোক্কস।

ব্যাস—কাঁদাবার জন্য ওইটুকুই যথেষ্ট। অমনি সেই হাসিমুখ নিমেষে কালো হয়ে যেতো, আর সেই সঙ্গে চীৎকার ও কান্নার তুফান বইতে শুরু করতো। টুনুর কাজ হয়ে গেছে—এবার শান্ত করবার পালা। তাই দৌড়ে এসে বোনের গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে, মিষ্টি কথা বলে তাকে শান্ত করার চেষ্টা চলতো। কিন্তু এত সহজে শান্ত হবে কেনো স্থলু—অনর্থক তাকে কাঁদানো হয়েছে! তাই নকুলদানা, পুঁতিরমালা কিংবা জলছবি কিছু একা কিনে দেবার জন্য বোনের হাত ধরে টুনুকে যেতে হতো সেই মনোহারী দোকানটার দিকে।

ছড়া কেটে, বোনটিকে কাঁদিয়ে আর কাঁদাবার জন্য খেসারত দিয়েও আবার তাকে খেপানোর সুযোগ টুনু কিছুতেই ছাড়তেন না। কোনো দিন হয়তো, স্থলু আপনমনে তার পুতুলের ঘর সংসার গোছাতে ব্যস্ত। নিজের মনে তখন হয়তো পুতুলের সঙ্গে কথা বলছে—বকছে, ধমকাচ্ছে আবার কখনো আদর করছে। চোখে-মুখে যেন মেঘ আর রোদের লুকোচুরি। টুনুর মাথায় তখন আবার কৌতুক চাড়া দিয়ে উঠতো। পা টিপে টিপে স্থলুর পেছনে গিয়ে ওকে হঠাৎ চমকে দিয়ে বলতো : এই স্থলু! সে চমকে ফিরে তাকাতেই ভঙ্গি করে শুরু করতেন :

এক যে ছিলো ধাড়ী মেয়ে
পুতুল খেলায় মত্ত
মুখখানা তার পেঁচার মত
নাকের মাঝে গত্ত।

তারপর আবার সেই কান্না আর কান্না থামাবার সেই খেসারত।

বোনের নামে ছড়া লেখার মধ্যে কিন্তু টুনুর সাহিত্য প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ থাকেনি। সপ্তম শ্রেণী থেকে প্রবেশিকা পর্যন্ত তিনি অনেক গান, কবিতা ও গল্প লিখেছেন। স্কুলের বিভিন্ন খাতাপত্রের মধ্যে, সে সব গান, কবিতা ও গল্প ইতস্তত ছড়িয়ে থাকতো। তার মধ্যে কতগুলো গল্প সে বয়সের লেখা হিসেবে বেশ ভালোই বলতে হবে। 'ভ্রান্তি' 'মা' 'শিকারী' এবং আরো দু'একটা অনামা গল্পের পাণ্ডুলিপি টুনুর স্কুল-জীবনের খাতাপত্রের মধ্যে

Chunati.com Pioneer in village based website

আজও দেখতে পাওয়া যায়। স্কুল-জীবনে থাকতে টুনু দুটো হাতে লেখা বই লিখেছিলেন, তার মধ্যে একটি হলো কবিতা ও অন্যটি গানের বই। কবিতার বইয়ের নামকরণ হয়েছিলো 'শেফালিকা', গানের বইটির নাম 'বুলবুলি'।

সে যুগের তরুণদের মধ্যে যারাই কবিতা লেখায় হাত দিয়েছে—তাদের কেউই রবি ঠাকুরের প্রভাব এড়াতে পারেনি। শুধু তরুণ কেনো—প্রবীণদের অবস্থাও অনেক ক্ষেত্রে তাই ছিলো। কবিতার জগতে রবীন্দ্রনাথ বিরাট মহীরুহরূপে দাঁড়িয়ে ছিলেন বলে সে যুগের কোনো কবির পক্ষেই তাঁর প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিলো না। শব্দ চয়নে, ভাব ও আবেগ প্রকাশে, রবির প্রতিফলন সে যুগের সব কবিতাতেই প্রায় লক্ষ্যগোচর ছিলো। টুনুর ওপরও রবি ঠাকুরের প্রভাব পড়েছিলো অত্যন্ত প্রগাঢ় ভাবে। তাঁর লেখা কবিতার বই 'শেফালিকা' তিনি কবিগুরুকেই সমর্পণ করেছিলেন। উৎসর্গ পত্রে প্রাণের আবেগ ঢেলে লিখেছিলেন :

Chunati.com Please visit our website

'......হে বিশ্বকবি, হে কবিগুরু
তোমার [illegible] দিয়ে লেখা
কবিতার সংকলন 'শেফালিকাকে'
সমর্পণ করে ধন্য হলুম......
তোমার অজয় কুমার'

কবিতার বই শেফালিকার লেখক হিসেবে, টুনু নিজের নামকরণ করেছিলেন 'অজয় কুমার'। সেই শেফালিকা ছাড়া 'অজয় কুমার'কে আর কোথাও কেউ দেখেনি—কেনো না এই নাম টুনু আর কোথাও ব্যবহার করেননি কোনোদিন। যে নামে তিনি কবিগুরুর জন্য কবিতা লিখেছিলেন, সেই নাম অন্য কোনো ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হয়তো সেই মনের সম্মতি পাননি। নতুবা সেই নামে তার কিছু না লেখার, অন্য কোনো কারণও হয়তো ছিলো—যা কেউ জানে না।

তরুণ মনের আবেগ দিয়ে লেখা কবিতায় যেমন কবিগুরুর প্রভাব পরিলক্ষিত—তেমনি তারুণ্যের প্রাণোচ্ছলতায় রচিত গানের মধ্যে পড়েছিলো

বুলবুল-কবি নজরুলের ছাপ। সেই জন্য হয়তো, টুনু তাঁর গানের বইয়ের নামকরণ করেছিলেন 'বুলবুলি'। শেখ সা'দি, হাফিজ, রুমির কাব্য-মালঞ্চে যে বুলবুলিই অতীতে গান গেয়ে গেছেন, নজরুলের অসংখ্য গীত-গজলের মধ্যে সেই বুলবুলি যেন আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছে আর মনের আনন্দে শিস দিয়ে দিয়ে উড়ে বেড়িয়েছে, দিয়েছে 'ফুল শাখাতে দোল'। টুনুর 'বুলবুলি' পড়লে সেই বুলবুলির মিষ্টি শিস বুঝি আচমকা কানে বাজে। বুলবুলির উৎসর্গ-পত্রে লিখেছেন :

'- - - - - - - -শেফালী,

তোকেই এই বইখানা দিয়ে

শরতের এক স্নিগ্ধ প্রভাতের স্মৃতি জাগিয়ে রাখলুম- - - - :

এই দু'টি লাইনের পরেই রয়েছে আবার কয়েক ছত্র কবিতা :

'তোর বিরহী-কবির হৃদয় পটে
বুলিয়ে রঙিন তুলি
ডাকিয়া আমায় শোনালি তুই
মধুর প্রেমের বুলি।
তারপরে তুই ঘোমটা খুলে
চাইলি দুই নয়ন তুলে
দেখলি সে চোখে মুগ্ধ ছবি
আমায় রে—তোর ভোমরা কবি - - - -'

Chunati.com
Pioneer in village based website

উৎসর্গ-পত্র ছাড়া বইটির আর কোনো পাতায় কোনো অংশে সেই 'শেফালী'র নাম নেই। শেফালী যে কে—তা কেউ জানে না। হয়তো কোনো এক শরতের স্নিগ্ধ প্রভাতে, শিউলী তলা দিয়ে যেতে যেতে, শিশিরসিক্ত শিউলী ফুল তাঁকে মুগ্ধ করেছিলো—তারপর সেই আবেগ সুন্দর মুহূর্তে তরুণ মনের মুঠো মুঠো ভালোবাসা দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর মানস-প্রতিমাকে। টুনুর ধ্যানের জগতে, কল্পনার জগতে যে ছিলো—শিশিরসিক্ত শেফালীর

মতোই শুভ্র, সুন্দর, পবিত্র। সেই সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর মোহ ছিলো স্বাভাবিক, সেই পবিত্রতার প্রতি আকর্ষণ ছিলো আন্তরিক। বুলবুলির প্রথম গানটিতেও তার আভাষ রেখে গেছেন :

ফুলের সাথে আজকে আমায় ফুটিয়ে দাও
গানের পরাগ বুকে আমায় লুটিয়ে দাও - - - - -

ফুলের মতো পবিত্র মন নিয়ে ফুলের মতো ফুটে থাকাই তাঁর কামনা। একটু একটু সুর-সমন্বয়ে যে মহাসঙ্গীতের সৃষ্টি, তার সাথে নিজের সত্তাকে, একান্ত ভাবে মিলিয়ে দেবার মধ্যেই তাঁর শান্তি, তাঁর তৃপ্তি। তার পরেই রয়েছে :

ফুটিয়ে দাও পুষ্পবনে
মাতিয়ে তোলো হাওয়ার সনে
গানের প্রলয় ঝঞ্ঝা বুকে
ছুটিয়ে দাও - - - - -

Chunati.com
Pioneer in village based website

এক মুঠো ফুলের সঙ্গে মিশে গেলেই শুধু চলবে না—শুধু মিশে যাওয়ার মধ্যেই এর শেষ নয়। এই মিশে যাওয়াকে, একাত্ম হয়ে ফুলের মাঝে বিলীন হয়ে যাওয়াকে, মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করতে না পারলে, কবি-প্রাণের কামনাই যে ব্যর্থ! ফুলের মতো ফুটে উঠে আর ফুলের প্রতিটি অণুপরমাণুর সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেবার মধ্যেই এর শেষ নয়। তারপরেও প্রবল হাওয়ার বেগে মেতে উঠতে হবে, ঘূর্ণির বেগে উড়ে যেতে হবে, ঝঞ্ঝার মতো ছুটে যেতে হবে। প্রবল বেগে চলার মধ্যেই তো প্রাণের উন্মেষ ও আবেগময়তা॥ আর সেই সচলতার মধ্যেই তো অনুভব, আর সেই অনুভবেই তো জীবন॥ তারপরে রয়েছে সমাপ্তি স্তবক :

জীবন আমার ধন্য করে
রাখো তোমার চরণ পরে
ফুলের মত তোমার পূজায়
ডালায় আমার বিলিয়ে দাও।

শুরুর আগেও যেমন শুরু আছে—তেমনি শেষের পরেও আছে শেষ। তৃপ্তির পর যেমন সুপ্তি—তেমনি শান্তির পরে প্রশান্তি। স্বপ্নের পরে যেমন জাগৃতি—তেমনি গতির পরে প্রগতি। অস্তের পরে যেমন উদয়—তেমনি বিলুপ্তির পরে উন্মেষ। এই কথাগুলো সম্ভবতঃ সত্য। কিন্তু সেই তৃষ্ণার্ত আত্মা তো আপাতঃ তৃপ্তিতে পূর্ণ তৃপ্ত হতে পারে না—তিনি যে অতৃপ্ত কবির আত্মা! তাই নিজেকে বিলুপ্ত করে দেওয়ার পরেও, সেই আত্মা আবার অতৃপ্তির কান্নায় ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। সুরভিত, প্রস্ফুটিত, পবিত্র পুষ্পের মতো তাই নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে, ধন্য হওয়ার কামনায় তিনি বলেন: 'তোমার পূজার ডালায় আমায় বিলিয়ে দাও'।

শৈশবকাল থেকেই টুনুর মনে হয়তো একটা উদাসীনতা, একটা ধর্মীয় সত্তা প্রচ্ছন্ন ছিলো। বাবা-মা আর সেই পারিপার্শ্বিকতায় টুনুর ধর্মীয় সত্তাটি পুষ্টি লাভ করেছিলো সন্দেহ নেই, তার ওপর নজরুলের ইসলামী গীত, গজলে সেই সত্তার উপলব্ধি যেন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলো। তাই দেখা যায়, তারুণ্যের প্রাণোচ্ছলতায় মানুষ যখন অকারণ হর্ষে উৎফুল্ল—সেই বয়সে টুনু লিখছেন:

Chunati.com
Pioneer in village based website

দিনের শেষে সাঁঝের আঁধার
আঁখির পরে পড়বে এবার
আর চেও না দিল পেয়ারী
ফুরায়ে এলো মোর দিন
'আল্লাহু আকবর' এমনি সাঁঝে
বাজবে আমার হৃদয় মাঝে
দিল আজ খোদার রহম মাগে
আমি তার দুঃখী মিস্কিন
শুধু 'লা-ই-লাহা' পড়ি
এ ধূ ধূ মরু দিব গো পাড়ি
শুধু চোখের পরে আমার রসুল
আর রোজ কেয়ামতের দিন।

টুনুর স্কুলজীবনের লেখা সেই বই দু'খানা এখনো রয়েছে। 'শেফালিকা'র কবিতা আর 'বুলবুলি'র গানের ওপর এখনো মধ্যে মধ্যে টুনুর প্রিয়জনেরা চোখ বুলান, আর টুনুর সেই কাঁচা বয়সের অনুভবের গভীরতা দেখে বিস্মিত হন, শ্রদ্ধান্বিত হন।

মানিকগঞ্জে তখন টুনুর মেজো বোনটিকে গান শেখাতেন মানিকগঞ্জ নিবাসী স্বর্গত শ্রীযুক্ত বেনীমাধব বন্দোপাধ্যায়। তিনি টুনুর কতগুলো গানে সুর দিয়েছিলেন। 'বুলবুলি'তে আধুনিক গান যেমন ছিলো, তেমনি ছিলো গজল ও ইসলামী গানও। শেষোক্ত দুই শ্রেণীর গানের মধ্যে কয়েকটি গানে সুর দিয়েছিলেন টুনুদেরই গ্রামের বিখ্যাত 'কাওয়াল' জনাব বদরুল কবীর খাঁ সিদ্দিকী। সেকালে মধ্য চট্টগ্রাম থেকে চট্টগ্রামের সর্ব দক্ষিণ সীমান্ত পর্যন্ত এবং বর্মার আকিয়াব পর্যন্ত কাওয়াল হিসেবে জনাব বদরুল কবীর সাহেবের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিলো। তিনি এখনও বেঁচে আছেন। চট্টগ্রাম থেকে আকিয়াবের মংদো ভুথিডং পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় উর্দু গজল ও কাওয়ালীর সঙ্গে সঙ্গে তিনি টুনুর লিখিত ইসলামী গানও গাইতেন। তাঁর কণ্ঠ-নিসৃত সেই সব গান আগের মতো এখনও হয়তো লোকের মুখে মুখে ফিরছে। কিন্তু গ্রামের জনসাধারণ কোনো দিন জানেনি, এখনো জানে না যে এ গান তাদেরই কোনো প্রিয়জনের, তাদের দেশেরই কোনো ছেলের লেখা!

টুনু নবম শ্রেণীতে পড়বার সময় 'বকুল' নামে একটি হাতে-লেখা পত্রিকা বের করেছিলেন। কোনো প্রতিষ্ঠান বা স্কুলের মুখপত্র হিসেবে 'বকুল' প্রকাশ পায়নি। পেয়েছিলো ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত উৎসাহ ও প্রচেষ্টায়। তাই টুনুই ছিলেন একাধারে বকুলের সম্পাদক, পরিচালক, হস্তলিপিকার ও রূপসজ্জাকার। পুরো গোষ্ঠীর মধ্যে টুনুর হাতের লেখাই সবচেয়ে ভালো ছিলো বলে আগাগোড়া পত্রিকাটি তাঁকেই লিখতে হয়েছিলো। তেজেন, নাসির, নিরোদ, গোপাল প্রমুখ টুনুর বন্ধুরা অবশ্য অন্য সব দিকে সাহায্য করতেন তাঁকে। চাঁদা তুলে কাগজ কেনা, রান্নাঘরের ঝুল দিয়ে নিজেদের হাতে কালি তৈরী করা এবং বাঁধাই করার কাজ বন্ধুরা নিয়েছিলেন নিজেদের হাতে। তা ছাড়া তাঁদের প্রধান কাজ ছিলো নিজেদের লেখার-

Pioneer in village based website

বাইরে স্থানীয় লেখকদের লেখা জোগাড় করা। টুনুদের শিক্ষকমহল ছাত্রদের এই সৎপ্রচেষ্টায় উৎসাহ দিতেন সবচেয়ে বেশী এবং তাঁদের লেখা দিয়ে সাহায্যও করতেন। মোটামুটি তিনমাস অন্তর দু'টি সংখ্যা পত্রিকাটি বেরিয়েছিলো। কিন্তু এদিকে প্রবেশিকা পরীক্ষার দিন ঘনিয়ে আসাতে, প্রস্তুতির জন্য স্বভাবতই টুনুকে পত্রিকার কাজ বন্ধ রাখতে হলো। বন্ধুরা নিয়মিত কাজ চালাতে না পারায় পরে পত্রিকাখানা একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো।

Chunati.com
Pioneer in village based website

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এক

১৯৩৪ সালে মানিকগঞ্জ হাই স্কুল থেকে টুনু ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়।* পরীক্ষার কিছু দিন পর, মানিকগঞ্জের শিল্পানুরাগীদের উদ্যোগে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্যোক্তাদের মধ্যে স্বনামধন্য গিরিণ চক্রবর্তী ছিলেন প্রধানতম। এই অনুষ্ঠানটিতেই বুলবুল তাঁর জীবনের প্রথম নৃত্য পরিবেশন করেন। সেই নৃত্য পরিবেশনের পেছনে একটু ইতিহাসও আছে।

অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলার সময় টুনু প্রায়ই উদ্যোক্তা ও শিল্পীদের মধ্যে গিয়ে বসতেন। বসে থেকে তাঁদের রিহার্সেল দেখতেন। সেদিনও তেমনি করে তাঁদের রিহার্সেল দেখছিলেন। হঠাৎ কি জানি কেনো, তাঁর মনে হলো—তিনিও এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারেন। কিন্তু কেমন করে? গান তো তিনি গাইতে পারেন না—কোনো যন্ত্র বাজানো? নাঃ, তাও এত তাড়াতাড়ি শেখা সম্ভব নয়। কিন্তু নাচলে কেমন হয়? ভালো বাজনা হলে নিশ্চয় তিনি নাচতে পারবেন। এই খেয়াল মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গে উদ্যোক্তাদের কাছে গিয়ে বললেন—'আপনাদের এই অনুষ্ঠানে আমারও একটা নাচ থাকবে কিন্তু। তাঁদের মধ্যে কেউ অবাক হয়ে চাইলেন টুনুর দিকে—কেউ একটু হাসলেন শুধু—আর কেউ বা টুনুর কথা যেন শোনেননি, এমন ভান করে যে যার কাজে মেতে রইলেন। অবশ্য তার কারণও ছিলো—এ যুগের মতো তখন কোনো ভদ্রঘরের সন্তান, বিশেষ করে মুসলমানের ছেলে স্টেজে উঠে নাচবে—এ যেন কল্পনা করাও অসম্ভব ছিলো। নাচটা তখনও জমিদারের অবসর বিনোদনের, অলস বিলাসের উপকরণ হিসেবেই বিবেচিত হতো। তখন সবেমাত্র নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর সুধী সমাজের চিত্ত বিনোদনের

* বুলবুলের মৃত্যুর পর উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক বুলবুলের স্মৃতি রক্ষার্থে একখানা ছবি স্কুলে রেখেছেন এনলার্জ করে।

Ghumati.com
Pioneer in village based website

দায়িত্ব নিয়ে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছেন। আর বিশ্ব ভারতীতে রবীন্দ্রনাথ নৃত্যকে তখন শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে স্থান দিয়েছেন সত্য, তবুও আজকের মতো এমন ব্যাপকভাবে নৃত্যশিল্প জনপ্রিয় হয়নি তখনও। সমাজের একটা বৃহৎ অংশ তখনও নৃত্যকে 'শিল্পে'র মর্যাদা দিতে নারাজ ছিলেন। তাই টুন্নুর মুখে 'নাচের কথা' শুনে তাঁরা পাত্তাই দিলেন না তাঁকে। কিন্তু টুনুও সহজে দমবার ছেলে নন—ওই এক কথাই বলতে লাগলেন তিনি: 'আমার একটা নাচ থাকবে কিন্তু—নাচটার নাম হবে 'চাতক নৃত্য'। এর জন্য চাই একটা বাঁশী আর একটা ঢোল। আর কোনো যন্ত্র না হলেও চলবে। আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তায়, দাবির সুরে, যে বারবার এক কথাই বলে—তাকে তো উপেক্ষা করা যায় না। এবারে তাঁরা একটু যেন উৎসুক হয়েই জিজ্ঞেস করলেন: তুমি ছবি আঁকতে পারো জানি, গল্প কবিতা লেখো শুনেছি, কিন্তু নাচ? তুমি নাচো বলে তো জানি না। শেখা নেই, জানা নেই, হুট করে মঞ্চে নাচতে উঠলে কিছু একটা কেলেঙ্কারী হয় যদি?

: না, কেলেঙ্কারী কিছুই হবে না, বিশ্বাস করে ঠিক করে নেবো। টুন্নুর বিশ্বাস দৃঢ় জবাব শুনে শেষ পর্যন্ত তাঁকে একটা সুযোগ দিতে রাজী হলেন কর্তৃপক্ষ। তখন মানিকগঞ্জের এক মুন্সেফের দুই ছেলেমেয়ে শান্তি-নিকেতন থেকে মানিকগঞ্জে এসেছিলেন। তাঁদের নাচ দেখার সুযোগ হয়েছিলো বুলবুলের। সম্ভবত: নাচের প্রথম প্রেরণা তিনি তাঁদের নাচ দেখেই পেয়েছিলেন। অবশ্য নৃত্য-প্রতিভা ছিলো তাঁর সহজাত, তাই নাচ দেখার পর, নিজে নাচার জন্য তিনি অমন চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন।

এই 'চাতক নৃত্যের' পরিকল্পনা ও রচনা টুন্নুর একান্তই নিজস্ব। এই বয়সের ছেলেরা সাধারণতঃ অন্যের রচনা হুবহু নকল করে, আর সেই অনু-করণে স্টেজ্ মাত করার চেষ্টা করে। কিন্তু টুনু ছিলেন সে দলের বাইরে। প্রথম থেকেই তাই তিনি তাঁর নিজস্ব রচনা, নিজস্ব আঙ্গিকের মাধ্যমে স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ ঘটাবার দিকেই মনোযোগী ছিলেন।

'চাতক নৃত্যের' বিষয়বস্তুটি অত্যন্ত সাধারণ, অথচ গভীর ভাব-ধর্মী। বৈশাখের বাংলাদেশ—প্রখর সূর্য-তাপে বাঙলার শ্যামল বুক শুকিয়ে যায়,

Chunati.com Pioneer in village based website

মাটিতে ফাটল ধরে। সজীব সবুজ গাছপালার ওপর একটা রুক্ষ ধূসরতা নেমে আসে। চারিদিকে রুদ্ররুক্ষতার মুখ ব্যাদনে চোখ যায় ঝলসে। মধ্যাহ্নের ঝাঁঝাঁলো রৌদ্রে বাঙ্গলার মাঠ, ঘাট, পথ প্রান্তরও ঝিমিয়ে পড়ে। কোথাও কোথাও শ্যামল মাটির বুক ফেটে চৌচির হয়ে যায়। থেকে থেকে তেতে ওঠা মাটির বুক থেকে যেন তপ্ত ভাপ বেরিয়ে আসে।

বৈশাখের এই নিষ্করুণ পরিবেশে সকলের মনই স্নিগ্ধতার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তাদের সেই ব্যাকুলতার প্রতিধ্বনিই বুঝি ওঠে 'চাতকের' সকরুণ উদাস সুরে 'ফটিক জল' 'ফটিক জল'। তৃষ্ণার্ত চাতক মহাশূন্যের পানে চেয়ে করুণ মিনতি জানায়—এই শুষ্কতা যে আর সহ্য হয় না, তৃষ্ণায় যে বুক ফেটে যায়—হে আকাশ! হে ক্রন্দসী! বৃষ্টি দাও। প্রাণীর তৃষ্ণা, মাটির তৃষ্ণা, উদ্ভিদের তৃষ্ণা মিটাবার জন্য বৃষ্টি দাও, পানি দাও—দাও 'ফটিক জল'। চাতকের করুণ মিনতি বাঁশীর সুরের মতো কেঁপে কেঁপে ভেসে যায় দিকে দিকে। তারপর একদা সত্যি সত্যি, কাল বৈশাখীর ডানা ঝাপ্‌টানিতে থর থর করে কেঁপে ওঠে চারিদিক। আকাশে বাতাসে তখন সে কি উদ্দাম মাতামাতি! মেঘে মেঘে বিদ্যুতের ঝিলিক আসন্ন বৃষ্টির সঙ্কেত দেয়। তারপর আর দেরি নয়—বৃষ্টির করুণাধারায় বৈশাখের তপ্তমাটি শান্ত শীতল হয়ে ওঠে। আর চাতক? মনের আনন্দে পাখা ঝাপটিয়ে তখন উড়ে বেড়ায় ঘনঘোর আকাশের নীচে নীচে। চাতকের সেই আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে, গাছে গাছে, নদী নালায়, জীবনে আর মাটিতে।

বর্ষার অগ্রদূত চাতক টুনুর অনুভবের সমুদ্রে যে ঝড় তুলেছিলো—তারই নৃত্যরূপায়ণ হলো 'চাতক নৃত্য'। নৃত্যশিল্পী বুলবুলের জীবনের প্রথম নৃত্য-নিবেদন। সে দিন দেহের ছন্দে, পায়ের গমকে তিনি নিজের মনের অনুভবকে সংক্রমিত করে দিতে চেয়েছিলেন বিমুগ্ধ দর্শকের মনে মনে।

সেই হলো টুনুর শিল্পজীবনের সূচনা। কবি ও স্রষ্টার প্রথম প্রচেষ্টা, প্রথম প্রকাশ এবং প্রথম সাফল্য। কারো কাছে কেনো তালিম না নিয়ে, মনের অনুভবকে দেহের লীলায়িত ছন্দে আর তালের মাধ্যমে, এমন সুষ্ঠু ও সফল রূপদানের উদাহরণ সত্যই বিরল।

চাতক হলো বর্ষার অগ্রদূত—বর্ষার ছোঁয়া পেয়ে রুক্ষ ধূসর ধরিত্রী হয়ে ওঠে সতেজ সবুজ। তাই বোধ হয়, টুনু 'চাতক নৃত্যের' সজ্জা হিসেবে নিয়েছিলেন মাথায় বাঁধবার একটুকরো লাল সিল্ক আর সবুজ রঙের একখানা বেনারসী। জীবনের প্রথম নাচে এই ছিলো তাঁর সজ্জা।

নাচটিতে সঙ্গীত সংযোজনা করেছিলেন মানিকগঞ্জের প্রবীণ সঙ্গীতজ্ঞ স্বর্গীয় বেনীমাধব বন্দোপাধ্যায়। টুনুর প্রস্তাব অনুযায়ী শুধু বাঁশী আর ঢোলের সাহায্যে এই নাচে সঙ্গীত পরিবেশিত হয়েছিলো।

দর্শকবৃন্দ চাতক নৃত্য দেখে মুগ্ধ হলেন, আর বিপুল করতালির মধ্যে টুনুর প্রথম নৃত্য প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করলেন। যে উদ্যোক্তারা বহুবার রিহার্সেল দেখেছেন—স্টেজের ওপর সেই একই নাচ দেখে তাঁরাও আবার নতুন করে মুগ্ধ হলেন। সকলের সঙ্গে তাঁরাও স্বতস্ফূর্ত ভাবে নবীন শিল্পী টুনুর 'প্রতিভার উন্মেষ'কে স্বাগত জানালেন। তাঁরা এই ভেবে বিস্মিত হলেন যে, কোনো শিক্ষকের কাছে নাচের কোনো তালিম না নিয়ে টুনু কি করে নিজের 'অনুভব'কে এমন চমৎকার ভাবে নৃত্যের মতো কঠিন মাধ্যমে প্রকাশ করতে সক্ষম হলেন!

Chunati.com
Pioneer in village based website

দুই

টুনুর পৈতৃক গ্রাম চুনতি সাতকানিয়া থানার অন্তর্ভুক্ত। আদালত, ফৌজদারী, থানা, সাবরেজিস্ট্রারি অফিস ও অন্য কয়েকটি সরকারী অফিস, বড় রকমের একট পোস্ট ও টেলিগ্রাম অফিস, সরকারী ডাক্তারখানা, একটি হাই স্কুল, চার পাঁচটি প্রাইমারী স্কুল, মেয়েদের এম. ই. স্কুল, প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষাদানের জন্য একটি নৈশবিদ্যালয় আর ছোট বড় অনেক দোকান-পাট ও বসতবাড়ি নিয়ে সাতকানিয়াকে উপশহর বলা চলে। এখন একটি কলেজও হয়েছে। হাজার কয়েক লোকের বসবাস। দাতব্য-চিকিৎসালয়ের বাঁ দিকে বিরাট একট দীঘির পাড় সংলগ্ন সাতকানিয়া-ক্লাব। অনেক রকম খেলাধুলার

ব্যবস্থা নিয়ে একটি পাঠাগারও আছে ক্লাবে। ক্লাবের হলটি নির্দিষ্ট শুধু সভা-সমিতির জন্য। নাটক অথবা বিচিত্রানুষ্ঠানের উপযোগী স্টেজও রয়েছে একটি। ক্লাবের আনুষ্ঠানিক ও সরকারী নাম হলো—'টাউন হল'। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার পর দেশের বাড়ি যাওয়ার পথে, টুনু সেবার সাতকানিয়ায় কয়েকদিন থেকে যান। তখন সেখানে একটি বিচিত্রানুষ্ঠান হচ্ছিলো স্থানীয় হাই স্কুলের রি-ইউনিয়ন উপলক্ষে। কয়েকজন পরিচিত ছাত্রের অনুরোধে টুনু সেই অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে 'চাতক নৃত্য' পরিবেশন করেন। ইতিপূর্বে এই নাচটি তিনি মানিকগঞ্জে নেচেছিলেন—তখনও যেন টুনুর চরণে নাচের সেই ছন্দ কেটে যায়নি। এই অনুষ্ঠানে সাতকানিয়ার অন্যতম কৃতী সন্তান, বিখ্যাত সাহিত্যিক আবুল ফজল সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীকালে বুলবুল সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে তিনি সেদিনের কথা স্মরণ করে লিখেছেন: 'বুলবুলকে আমি প্রথম দেখেছিলাম সেই প্রায় সতর আঠারো বছর আগে। তখন বুলবুল কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে। বোধকরি প্রবেশিকা পরীক্ষা শেষ করে তিনি দেশে বেড়াতে এসেছিলেন। সেদিন এই প্রাণচঞ্চল কিশোরের মধ্যে প্রতিভার যে অরুণোদয় দেখেছিলাম তার স্মৃতি আমি কোনদিন ভুলতে পারিনি। সেদিন প্রথম দর্শনে তাঁর প্রতি মনে যে গভীর স্নেহ ও হৃদয়ে যে একটি প্রশংসপ্রবণতা বোধ করেছিলাম তা কখনো ম্লান হয়নি—এখন পর্যন্ত তা তেমনি উজ্জ্বল ও অটুট রয়েছে। পরবর্তী জীবনে বুলবুলকে নানা অবস্থায় দেখেছি, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁর নাচ দেখার সুযোগ আমার ঘটেছে। তাঁর বিশেষ অনুরোধে খুব নিকট থেকে মঞ্চের উপর বসেও তাঁর নাচ আমি দেখেছি। কিন্তু তাঁকে প্রথম দেখার ও তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের স্মৃতি আমার মনে চিরঅক্ষয় হয়েই রয়েছে। যখনি বুলবুলের কথা মনে হয়েছে, তখন আমি সেই কিশোর বুলবুলের ছবিই আমার মনের পটে মুদ্রিত দেখতে পাই। সুগঠিত দেহ, মাথায় অনতিদীর্ঘ বাবরী চুল, রঙ যে তাঁর খুব ফর্সা ছিল তা নয়, কিন্তু সারা অঙ্গব্যাপী একটি অনন্যসাধারণ প্রতিভার দীপ্তি ছিল। এই দীপ্তিই আমাকে আকর্ষণ করেছিল। কোন এক উৎসব উপলক্ষে তাঁর বয়সের শত শত ছেলে সে দিন এক জায়গায় একত্রিত হয়েছিল এবং সকলে এক সঙ্গে

Chunati.com Pioneer in village website

কয়েকদিন কাটিয়েছিল। এই শত শত ছেলের মাঝে বুলবুল ছিল একক ও অদ্বিতীয়। তাঁর প্রতিভার অনন্যসাধারণতা শুধু আমার চোখে নয়, উপস্থিত সকলের চোখে তাঁকে করে তুলেছিল অনন্যসাধারণ। সেবারই সর্বপ্রথম আমি তাঁর নৃত্য দেখার সুযোগ পাই। তখনো তিনি নৃত্যশিল্পী হিসেবে পরিচিত হননি। তখন শুধু নিজের প্রাণের আনন্দে ও মনের সখেই তিনি নাচতেন। নাচ সম্বন্ধে আমি কোনো কালেই বিশেষজ্ঞ নই এবং তখন পর্যন্ত কোনো ভাল ও খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পীর নাচ দেখার সুযোগও আমার ঘটেনি। তবুও কিশোর বুলবুলের অপূর্ব নৃত্য দেখে আমি সেদিন মুগ্ধ হয়েছিলাম এবং নৃত্য যে আনন্দের কত বড় উৎস, সেদিন বুলবুলের নৃত্য দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম। দেখে আরো আশ্চর্য হয়েছিলাম, অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত গ্রাম্য দর্শকগণও তাঁর নৃত্য দেখে আমার মত আনন্দে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিল'।* কিন্তু সাতকানিয়ার মুসলিম সমাজের প্রবীণ ব্যক্তিরা ছিলেন অতিরিক্ত রকমের রক্ষণশীল। টুনুকে সেখানে প্রায় সকলেই চিনতেন বলে সামনা সামনি কেউ কিছু বললেন না বটে, কিন্তু আড়ালে-আবডালে থেকে, ক্রমেই রক্ষণশীল গোষ্ঠী প্রকাশ্য ভাবে টুনুর নাচের সমালোচনা শুরু করলেন। যথা সময় বাবার কানেও সে কথা উঠলো। তিনি জানতেন যে, মুসলমান ছেলের নাচ বরদাস্ত করার মতো মানসিকতা মুসলমান রক্ষণশীল-দের কাছে আশা করা যায় না। যদিও রক্ষণশীলদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিলো না, তবুও ছাত্র-জীবনের সেই অধ্যায়ে টুনু নাচের দিকে ঝুঁকে পড়ুক তাও তিনি চাইলেন না। অথচ মানিকগঞ্জে টুনুর নাচ দেখে তিনি আনন্দও পেয়েছিলেন। তাই তাঁর প্রগতিশীল মন টুনুর নাচের বিরূপ সমালোচনায় সেদিন দুঃখ পেয়েছিলেন সত্য, তবুও সব দিক ভেবে চিন্তে তিনি বললেন : সাতকানিয়ায় তুমি না নাচলেই ভালো করতে—আমাদের দেশের মুরব্বিরা নাচ, গান কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেন না। তাঁদের এই বিরূপ সমালোচনা তেমন অস্বাভাবিক কিছু নয়। ছবি এঁকে, গল্প লিখে টুনু সব সময়

* আবুল ফজলের লেখা—'সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা' নামক গ্রন্থের বুলবুল চৌধুরী প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

বাবার আন্তরিক উৎসাহ পেয়ে এসেছেন। তাই যে কারণেই হোক, নাচ সম্বন্ধে বাবার মনের প্রচ্ছন্ন দ্বিধাটুকু টুনু বুঝতে পারলেন, কিন্তু বাবার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলে, তিনি মনের সত্যকে গোপন করতেও চাইলেন না। তাই বললেন : সাতকানিয়ায় নাচা যে উচিত হয়নি, তখন আমি তা বুঝতে পারিনি আব্বা। কিন্তু সুযোগ সুবিধা পেলে আমি যে আবারও নাচতে চাই—এই পর্যন্ত বলে, খানিকটা ভয়ে, খানিকটা সম্ভ্রমে, টুনু বাবার দিকে চাইলেন—অনুমতি বা অনুমোদনের আশায়। কিন্তু বাবা তখন তাঁর চিরাচরিত অভ্যাসমতো নিজের মনে নীরব হয়ে গেছেন। কোনো গুরুতর কিছু নিয়ে চিন্তা করবার সময় বাবা চিরদিন এমনি ভাবে নিজের মনে চুপ করে থাকতেন। তখন তাঁকে কেউ বিরক্ত করতো না।

সেই থেকে টুনুর নাচের বিরূপ সমালোচনা মাত্র শুরু। রক্ষণশীল মুসলিম সম্প্রদায়, দেশের মুরব্বিস্থানীয় ব্যক্তিগণ, এমনকি আত্মীয় স্বজন পর্যন্ত সকলেই টুনুর নাচের বিরুদ্ধে কটূক্তি করতে লাগলো : শরিয়ৎ বিরোধী কাজের জন্য টুনুর সমস্ত পরিবারকে ভুগতে হবে। 'নাউট্টাছেলে'র* মতো এই জঘন্য পাপ কাজ করাতে, হুমকি হুশিয়ারী আসতে লাগলো নানা দিক থেকে। ভবিষ্যতে যেন এমন জঘন্য কাজ আর না করে, তার জন্য আদেশ উপদেশও দিলেন অনেকে। অনমনীয় মনোবল যদি টুনুর না থাকতো, যদি তিনি শিল্পী মানসের অধিকারী না হতেন, আর প্রগতিতে বিশ্বাসী বাবা যদি ছেলেকে আড়াল দিয়ে না রাখতেন, তবে সেই তুমুল সমালোচনার ঘূর্ণিবত্যায় ভাবীকালের এই 'বিস্ময়কর প্রতিভা' চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতেন। তবে তখন তরুণ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ও ছাত্র সমাজ টুনুকে আন্তরিক ভাবে সমর্থন করেছিলো। এও স্বীকার করতে হবে।

একদিকে অবজ্ঞা আর আক্রমণ, অন্যদিকে সমর্থন আর অভিনন্দন। দুটোই টুনুর মনকে গভীর ভাবে নাড়া দিলো—মনে মনে একটা দ্বন্দ্বও দেখা দিলো বৈকি। নাচতে নেমেছিলেন নিতান্ত খেয়ালের বশেই। খারাপ ভালোর

* যাত্রাদলে অথবা পথে ঘাটে যারা মেয়ে মানুষ সেজে অঙ্গভঙ্গি করে নেচে বেড়ায়—চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় তাদের 'নাউট্টাছেলে' বলা হয়।

Chhupati.com
Pioneer in village based website

কোনো প্রশ্নই তখন ওঠেনি। তাই এর আগে. কোনো দিন নাচের ভালো মন্দ নিয়ে, চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। কিন্তু এখন যে সত্যি ভাবিয়ে তুললো তাঁকে। নিজেকে তিনি প্রশ্ন করলেন: কেনো এমন করে নাচের বিরূপ সমালোচনার ঝড় উঠলো? নাচের মধ্যে খারাপ কি দেখলেন তাঁরা? কিন্তু নেচে আমি যে আনন্দ পেয়েছি—সে যে অপূর্ব।

এমনি খেপা চিন্তার মধ্যে একদিন খুঁজে পেলেন সেই প্রশ্নের জবাব: না, এই নাচের মধ্যে কিছুই খারাপ থাকতে পারে না। নিজে নেচে যে আনন্দ আমি পেয়েছি—তেমনি আনন্দ তো দর্শকেরাও পেয়েছে। নির্মল আনন্দ দানের মধ্যে খারাপ কাজের অবকাশই যে নেই। যাঁরা নাচের বিরুদ্ধাচারণ করছেন, তাঁরা নাচ বলতে 'নাউট্টা' অথবা বাইজীর নাচই কেবল বোঝেন হয়তো—শিল্প ও সংস্কৃতির দিকে কোনোদিন তাঁরা চেয়ে দেখেননি। তাঁরা ধর্মের খোলসটাকেই চরম সত্য বলে বিশ্বাস করেন। ধর্মের আসল সত্য ও সুন্দর অনুভূতির সন্ধান তাঁদের নাগালে আসেনি। নাচের শুধু বাইরের দিকটাই তাঁদের চোখে পড়ছে—নাচের 'ভাব' ও 'অনুভবের' দিকটা তাঁদের কাছে থেকে গেছে চির অজানা।

আশ্চর্য! এঁদেরই তিরস্কারে তাঁর মন দুশ্চিন্তা ও দ্বন্দ্বের ভারে এমন নুয়ে পড়েছিলো! কিন্তু কেনো? কারণ—আত্মীয় স্বজনের প্রতি টুনু সব সময় শ্রদ্ধাবান ছিলেন। প্রবীণদের কথা অনেক ক্ষেত্রে মেনে চলতেন। তাছাড়া, বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে এই পর্যন্ত আপামর সকলের মুখে টুনু নিজের চাল চলন, মেধা, বুদ্ধির সাধুবাদই শুধু শুনে এসেছেন। বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে এবারই তিনি প্রথম শুনতে পেলেন বিরূপ সমালোচনা। এই জন্য আঘাতটা টুনুর মনে প্রচণ্ডভাবে লেগেছিলো। আর এই জন্যই তাঁর মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিলো।

মানিকগঞ্জের সেই বিচিত্রানুষ্ঠানে, নিতান্ত খেয়ালের বশে নাচতে গিয়ে, তিনি যেন তাঁর আসল শিল্পী-মানসের নাগাল পেয়ে গেলেন। তাঁর অবচেতন মন এতদিন বুঝি এই পরশ পাথরের খোঁজই করছিলো। তারপর ঠিক সময়, ঠিক জায়গাটিতে এসে পরশ পাথরের যাদুস্পর্শে তাঁর আসল শিল্প-মানস সোনার

Chunati.com Pioneer in village based website

মতো ঝলমলিয়ে উঠলো—কবি নয়, লেখক নয়, চিত্রকর নয়, নৃত্যশিল্পীই হবেন তিনি!

ছেলেবেলা থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রাক্কাল পর্যন্ত, টুনু কখনো হয়েছেন চিত্রশিল্পী, কখনো বা লেখক। এমনিভাবে শিল্পের অনুশীলন সাধ্যমত তিনি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। সেই সময় একটি মুহূর্তও অনর্থক নষ্ট করেননি। তাঁর মনে একটা বিশ্বাস ছিলো যে—সুকুমার শিল্পের যে-কোনো একটিতে সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হবেন। এই ধরনের আত্মবিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও, চিত্রাঙ্কনে তাঁর মনের তৃষ্ণা মেটাতে পারেননি। তাই অবচেতন মনের তাগিদেই বুঝি মনের সেই তৃষ্ণা নিয়ে তাকিয়েছিলেন অবারিত আকাশের দিকে। চাতকের মতো তাঁর অন্তরের আবেদনও বুঝি কেঁদে উঠেছিলো—'ফটিকজল' 'ফটিকজল' বলে। অবশেষে তিনি পেয়েছিলেন ফটিকজল—আকণ্ঠ পান করলেন সেই প্রাণ-সঞ্জীবনী সুধা। আর সেই সুধা মেটালো তার প্রাণের পিপাসা, আত্মার তৃষ্ণা। তারপর মনের আকাশে এবার শুধু লক্ষ কোটি তারা নয়, মুহূর্তে যেন জেগে উঠলো এক জ্যোতির্ময় [illegible]। সেই হলো শিল্পীর নবজীবনের সূচনা।

এমনি সময় একদিন খবর এলো, ছ'খানা লেটার নিয়ে টুনু প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেছেন। তারপর বাবা আর মায়ের পায়ে কদমবুচি করে একদিন কোলকাতায় রওয়ানা হয়ে গেলেন কলেজে ভর্তি হবার জন্য। সেটা ছিলো ১৯৩৫ সাল।

তিন

কোলকাতা! তৎকালীন বাঙলা তথা সারা ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র কোলকাতা। সেখানে সুযোগ অপরিসীম, পরিধি দিগন্ত বিস্তৃত। সেখানে ঘরে ঘরে আর্টের অনুশীলন, ঘরে ঘরে নাচ গানের আসর—নৃত্য আর ছন্দ, ছন্দ আর সুর। এবারে তিনি অধিকতর ছন্দের পাগল হয়ে উঠলেন। ছন্দই যেন তাকে টেনে নিয়ে এলো কোলকাতায়।

কোলকাতা এসে টুনু প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হলেন আই. এ. ক্লাসে। ভর্তি হবার কিছুদিন পরে কলেজের এক বিচিত্রানুষ্ঠানে টুনু একটি নৃত্য পরিবেশন করার সুযোগ পেলেন। নাচটির নাম হলো 'সূর্য'। বলাবাহুল্য এই নৃত্য পরিকল্পনা ও আঙ্গিক বুলবুলের সম্পূর্ণ নিজস্ব। সেই অনুষ্ঠানে অন্য অতিথিদের মধ্যে স্বনামখ্যাতা শ্রীযুক্তা হেমলতা মিত্র• উপস্থিত ছিলেন। টুনুর নাচ দেখে তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং এই প্রাণচঞ্চল তরুণের আশ্চর্য প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাঁকে অকুণ্ঠ স্বীকৃতিদান করেন। এই শ্রদ্ধেয়া মহিলাই হলেন বুলবুল প্রতিভার আবিষ্কারক। হিন্দুদের অধিরাজ্য কোলকাতার সাংস্কৃতিক-জীবনে একটি মুসলমান ছেলের প্রথম নৃত্য প্রচেষ্টায় এই সার্থকতাকে বিরাট কৃতিত্ব বলতেই হবে।

তখন কোলকাতার 'ফ্রেশ-এয়ার এক্সকারসন সোসাইটি'র সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহের জন্য একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলছিলো। শ্রীযুক্তা হেমলতা মিত্র ছিলেন এই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তাদের অন্যতমা। প্রেসিডেন্সী কলেজে টুনুর নাচ দেখে তিনি এত মুগ্ধ হন যে, তৎক্ষণাৎ তাঁকে আমন্ত্রণ জানান এক্সকারসন সোসাইটি'র অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করার জন্য। তাঁর আমন্ত্রণে টুনুও অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেন এবং সাগ্রহে সম্মতি জানান। সাধনা বসুর বিপরীতে তিনি এই অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেন। এই নৃত্যানুষ্ঠানটি হলো খ্যাতির পথে টুনুর প্রথম পদক্ষেপ। সমবেত দর্শকমণ্ডলী টুনুর নাচ দেখে তাঁকে বিপুল ভাবে অভিনন্দন জানায়। কোলকাতার মতো মহানগরীতে, পাবলিক স্টেজে প্রথম আবির্ভাবেই এরকম অদ্ভুত সাফল্যলাভ টুনু ছাড়া সম্ভবতঃ আর কোনো নৃত্যশিল্পীর ভাগ্যেই ঘটেনি। সেটা ছিলো ১৯৩৫। সেবারই তিনি প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী সাধনা বসুর বিপরীতে নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন।

• ইনি প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার ও রাজনৈতিক নেতা স্বর্গত শ্রীযুক্ত মনমোহন ঘোষের কন্যা, ও খ্যাতনামা সার্জেন স্বর্গত ডাঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্রের স্ত্রী। নিজেও কোলকাতার সমাজকল্যাণমূলক কাজের জন্য প্রখ্যাত।

আশাতিরিক্ত সাফল্যে টুন্নুর অনুপ্রেরণা হাজার গুণ বেড়ে গেলো। সেই অনুপ্রেরণাতেই কয়েকজন বিশিষ্ট ও উৎসাহী শিল্পীবন্ধু ও সুরুচি স্থানীয় উৎসাহদাতার সাহায্যে তিনি একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় 'কলিকাতা কৃষ্টি কেন্দ্র'। সে যুগে কোলকাতার সাংস্কৃতিক অঙ্গনের এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব স্যার প্রদ্যোৎ কুমার ঠাকুর বুলবুলের 'কলিকাতা কৃষ্টি কেন্দ্রের' অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৯৩৫-'৩৬ সনে কলিকাতা কৃষ্টি কেন্দ্র গঠিত হয়। সে সময় থেকে টুন্নুর মনে ধীরে ধীরে এই সিদ্ধান্ত দানা বাঁধতে থাকে যে 'শিল্প'ই হলো তাঁর 'নেশা' এবং 'নৃত্য'ই হলো তাঁর 'ক্ষেত্র'। এই সিদ্ধান্তে আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের শক্তি ও সাধনাকে যথার্থ পরিণতির দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য যত্নবান হলেন।

নতুন জীবন শুরু করার সময় টুন্নু একটি নতুন নামও গ্রহণ করেন। হয়তো নিজের শিল্পীসত্তার সঙ্গে মিল রেখে গ্রহণ করেছিলেন সুন্দর প্রাণ-চঞ্চল একটি নাম—'বুলবুল চৌধুরী'। এই নাম গ্রহণ করার সময় তিনি কারো সঙ্গে পরামর্শ করেননি, সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায়, নিজেরই নির্বাচিত এই নামটি তিনি শুধু শিল্পে ও সাহিত্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর আসল নাম রশীদ আহম্মদ চৌধুরীই ব্যবহার করেছেন। তবুও খুব অল্প সংখ্যক লোকই জানেন যে, বুলবুলের আসল নাম রশীদ আহম্মদ চৌধুরী। আত্মীয়-স্বজন ও স্নেহভাজনদের কাছে তিনি ছেলেবেলার আদরের নাম টুন্নু বলেই পরিচিত ছিলেন। আর বুলবুল চৌধুরী নামে দেশে ও বিদেশে তিনি খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁর নিজের দেশবাসীর মতো বিদেশী শিল্পানুরাগীরাও জানেন যে, প্রাচ্যের শিল্পাকাশে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের, এক মৃত্যুঞ্জয়ী প্রতিভার আবির্ভাব ঘটেছিলো—যে নূতন বিষয়বস্তু সমন্বিত, নূতন পদ্ধতি সমৃদ্ধ, সম্পূর্ণ নূতন ধরনের নৃত্যনাট্যের প্রবর্তন করে অমরত্ব লাভ করেছেন তাঁর নাম—'বুলবুল চৌধুরী'।

বেছে বেছে টুন্নু কেনো যে এই বিশেষ নামটি গ্রহণ করেছিলেন—তা স্বাভাবিক ভাবেই সকলের মনে প্রশ্ন জাগায়। টুন্নুর অনেক কবিতায়, গানে ও প্রীতি উপহার রচনার মধ্যে এই 'বুলবুল' নামের পাখিকে তিনি বার

Chunati.com
Pioneer in village based website

বার আহ্বান করেছেন, কখনো নিঃসঙ্গ হৃদয়ের সঙ্গী হিসেবে, কখনো বিরহী প্রিয়ার দরদী হিসেবে, কখনো বা মিলনের আনন্দদূত হিসেবে. তাঁর জীবনে এই ছোট্ট পাখিটি অনেকটা স্থান জুড়ে আছে। ছেলেবেলার সেই সবুজ স্বপ্নের দেশ চুনতিতে বসে কোনো এক শান্ত বিকেলে তিনি পাখিটির প্রতি মনের নিরুদ্ধ জিজ্ঞাসায় কি ভাবে আকুল হয়ে উঠেছিলেন, টুনুর এই কবিতাটি তার প্রমাণ :

চট্টগ্রাম নভেম্বর ১৯৩৬,

'ওগো পাখি, ওগো আনন্দদূত
একি পুলক শিহরণ তুমি জাগাও আমার প্রাণে
তব বিশ্ব-বিমোহন-কণ্ঠ-গানে। কোন সে জগৎ পানে
বয়ে নিয়ে যায় তব ছন্দ রথ আমার এ মন
সেথা যে নাই কোনো দুঃখ, পৃথিবীর কোলাহল
নাই সেথা বিরহীর ক্রন্দন
অভিশপ্ত মানবের আকুল ব্যাকুলতা।
সন্ধ্যা নেমে আসে ধীরে অলক্ষিতে
চারিদিক রঙিন স্বপ্নের আবেশে বিভোর
পাহাড়ের বুক বেয়ে নব দূর্বাদল শ্যামল বন্যা
নিস্তব্ধ চারিদিক--শুধু দখিনা মলয়ার নৃত্য উচ্ছল চরণ ছন্দ
আর আমি একা, মহুয়াবীথি তলে
মোর আঁখি খুঁজে তোমায় হল সারা। অদৃশ্য তুমি,
কোনো এক কুঞ্জের শ্যামল অঞ্চল ভেদি
আসে তব কণ্ঠের গভীর পুলক ছন্দ!
কার অনুপ্রেরণায় মাতি ওগো অদৃশ্য বন্ধু
এ ধরণীর শোক-দুঃখ কাতর মানবের মনে
ঢালে এক অপার্থিব অলৌকিক সুধাধারা
তব কণ্ঠমাত্র হতে—যে ধারায় নেয়ে

Eliunati.com
Pioneer in village based website

অভিশপ্ত-মানব ভুলে যায় পৃথিবীর যত কিছু
ভুলে যায় অতীতের দুঃখ-দ্বন্দ্ব-দ্বেষ
তনু-মনে মম কিসের আবেশে যেন
খেলে যায় শুধু বিদ্যুৎ শিহরণ
অপার্থিব নবীন-অনুভূতির চঞ্চলতা।
তুমি না সেই পাখি যে ছিলো হাফিজের মন-দেউলের দেবী
তুমি না তার কবিপ্রাণে জাগিয়েছিলে নবীন উন্মাদনা?
তুমিই কি মরমী ওমরের ছিলে গোপন সাথী
তার শূন্য-দ্রাক্ষালতা-ঘেরা-কুঞ্জ কানন মাঝে?
তুমিই কি শিখিয়েছিলে ইরাণের অমর দু'জনে
সেই অপার্থিব প্রেম, যার কাহিনী আজো
মানবের মনে গেঁথে আছে যুগযুগান্তর পরে।
শ্যামল-মায়ায় ঘেরা প্রাসাদের কক্ষে বসি
শিল্পী শুনিত নাকি তব কুঞ্জ হতে ভেসে আসা গীতি
প্রাতে, তুহীন কুহেলী আবরিত
দূর মিনারের পানে চেয়ে- - - - - - -

Chunati.com
Pioneer in village based website

এই অসমাপ্ত কবিতাটির প্রতি ছত্রে, পাখিটির উদ্দেশ্যে টুনুর ভাব-গভীর মনের একান্ত জিজ্ঞাসা পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। কিন্তু কেনো এই জিজ্ঞাসা? হয়তো বুলবুল নামের পাখিটির কৃতিত্ব সম্বন্ধে তিনি নিজের মনে এমনি ভাবে প্রশ্ন করে করে সন্তুষ্ট হতে চেয়েছিলেন, আশ্বস্ত হতে চেয়েছিলেন, আর শিল্পী-জীবনের প্রেরণার আধার করতে চেয়েছিলেন। মরমী কবি ওমর খৈয়ামের দ্রাক্ষাকুঞ্জের আর দরদী কবি হাফিজের গুলবাগের স্বপ্ন জড়ানো ছিলো নামটির মধ্যে। নজরুলের অনুদিত রুবাইয়াৎ কবি তাঁর পুত্র বুলবুলকে উৎসর্গ করেছিলেন। হতে পারে বুলবুলের মৃত্যু টুনুকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছিলো। তাঁর বোন সুলু একদিন জিজ্ঞেস করেছিলো: আচ্ছা ভাই, তুমি নিজের আসল নামে পরিচিত না হয়ে বুলবুল নামে

কেনো পরিচিত হও? টুনু জবাব দিয়েছিলেন: নজরুলের প্রাণ-প্রতিম বুলবুলকে আমার মধ্যে বাঁচিয়ে রাখবো বলে। যে কোনো কারণেই হোক, এই নামটির মধ্যে টুনুর ধ্যানীমনের স্বপ্ন এসে বাসা বেঁধেছিলো।

জীবনের সব কিছুর জন্য যারা পাশ্চাত্ত্যের দিকে তাকিয়ে থাকে, বুলবুল তাদের করুণা করতেন। অবশ্য পাশ্চাত্ত্যের প্রতি কোনো রকম অশ্রদ্ধা ছিলো না তাঁর মনে। কিন্তু অন্ধভাবে পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণ করাকে তিনি সর্বান্তকরণে ঘৃণা করতেন। পাশ্চাত্ত্যের কাছে আমাদের শিখবার আছে অনেক কিছু, তেমনি তাদের শেখবারও আছে যথেষ্ট। বুলবুলের দৃষ্টিতে প্রাচ্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্থান ছিলো গগনচুম্বি। এই মহান সভ্যতা ও সংস্কৃতির সুষ্ঠু রূপায়নের প্রশ্ন ছিলো তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সুকুমার শিল্পের মাধ্যমে নিজের দেশের শিল্প ও সংস্কৃতির সুষ্ঠু রূপায়নের উদ্দেশ্যে বুলবুল 'কলিকাতা কৃষ্টিকেন্দ্র' ভেঙে দিয়ে আর একটি নয়া প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। নামের ব্যাপকতায় যেন প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্রকাশ পায়, তারই জন্য এই প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া হলো—'ওরিয়েন্টাল ফাইন আর্টস এসোসিয়েশন'। বুলবুলই ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এবং ডাঃ এন. জে. জুডা ছিলেন সভাপতি। কলেজের একজন মুসলমান ছাত্রের পক্ষে সেই যুগের কোলকাতায় কোনো সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করা ও তার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কথা ভাবলেই বুলবুলের দৃঢ় মনোবল, অদ্ভুত গঠন ক্ষমতা, কর্মদক্ষতা, বিশ্বস্ততা, স্থৈর্য ও তাঁর সুন্দর মার্জিত ব্যবহার প্রত্যক্ষগোচর হয়ে ওঠে। ১৯৩৭ সালের শুরুর দিকে ও. এফ. এ বা 'ওফা' প্রতিষ্ঠিত হয়।

Ebunati.com
Pioneer in village based website

চার

১৯৩৮ সালে বাঙলাদেশে এক সর্বধ্বংসী বন্যায় ডুবে যায়। সারা দেশের আকাশে বাতাসে বন্যা-পীড়িতদের মর্মভেদী হাহাকার ওঠে। দেশ-

দরদী নেতৃবৃন্দ ভারতবাসীর কাছে আকুল আবেদন জানান—বন্যা-পীড়িতদের সাহায্যার্থে মুক্তহস্তে দান করতে। দেশপ্রেমিক বুলবুলও সেই চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠলেন, কি ভাবে দুঃস্থ মানুষের সাহায্য করা যায়। তারপর মুহূর্তের জন্য নির্বিকার ভাবে বসে না থেকে একটি 'চ্যারিটি শো' করার সংকল্প নিয়ে তার প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন, ঠিক হলো—'ওরিয়েন্টাল ফাইন আর্টস এসোসিয়েশনে'র পক্ষ থেকে একটি নৃত্যানুষ্ঠান মঞ্চস্থ করে টিকেট বিক্রির টাকা 'বন্যা সাহায্য তহবিলে' দান করা হবে। 'চ্যারিটি শো' করা অনেক অসুবিধা—আর্থিক আনুকূল্য কোথায়? কিন্তু বুলবুল দমবার পাত্র ছিলেন না। সব রকম বাধা-বিপত্তি সামলিয়ে অবশেষে 'চ্যারিটি শো' মঞ্চস্থ করলেন। পর পর দু'রাত্রি এই অনুষ্ঠান চলে। প্রথম রজনীতে বাঙলার তদানীন্তন বিপ্লবী নেতা সুভাষচন্দ্র বসু অনুষ্ঠানের উদ্বোধন এবং সভাপতিত্ব করেন। দ্বিতীয় রজনীর অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বাঙলার প্রধান মন্ত্রী জনাব এ. কে. ফজলুল হক। কোলকাতার বিখ্যাত 'ফার্স্ট' এম্পায়ার মঞ্চে' এই অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ হয়। তখন বাঙলার গভর্নর ছিলেন ব্রাবোর্ন। তাঁর পত্নী লেডি ব্রাবোর্নও বুলবুলের নৃত্যানুষ্ঠান দেখতে আসেন। এই প্রিয়দর্শন তরুণের নাচ দেখে তিনি এতই মুগ্ধ হন যে, অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সোজা গ্রীনরুমে চলে এসে তিনি বুলবুলকে অভিনন্দন জানান। বুলবুল তখন পূর্ণ সাফল্যের সঙ্গে শো'টি শেষ করতে পেরে আনন্দে কলরব করছিলেন। এমন সময় গভর্নর পত্নীর ডাক শুনে সেখানে এসে দাঁড়ালেন সগর্বে। লেডি ব্রাবোর্ন এই প্রতিভাবান তরুণের সঙ্গে করমর্দন করতে গিয়ে শুধু তিনটি মাত্র কথায় তাঁর সপ্রশংস মনোভাব প্রকাশ করেন: 'ইটস্ সিম্প্লি ওয়াণ্ডারফুল'!

বাঙলাদেশে, বিশেষ করে কোলকাতার মতো জায়গায় শিল্প ও সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি সেবককেই কঠোর সমালোচনার উত্তাল তরঙ্গ সঙ্কুল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে নিজের লক্ষ্যস্থানে পৌঁছাতে হয়েছে। এই তরঙ্গের আঘাতে কত সংস্কৃতি ও সাহিত্যসেবীর তরণী যে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ডুবে গেছে তার হিসাব কেউ দিতে পারবে না। অনেক ক্ষেত্রে সমালোচনার ধরন ধারণ

Chunati.com

প্রায় আক্রমণের পর্যায়ে নেমে আসতেও দেখা গেছে। এই আঘাত আরো রূঢ়, আরো কঠিন। বাঙালী সহজে কাউকে সাহিত্যিক বা শিল্পীর স্বীকৃতি দিতে রাজী নয়। বাঙালীদের এই মনোভাবের দরুণ প্রায় প্রত্যেকটি প্রতিভাবান কবি, শিল্পী, সাহিত্যিককেই স্বীকৃতি লাভের জন্য গোড়ার দিকে কঠোর সমালোচনার মোকাবেলা করতে হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। অপেক্ষাকৃত সহজে যাঁরা স্বীকৃতি পেয়েছেন তাঁদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। আর যাঁরা আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই স্বীকৃতি পেয়েছেন তাঁরা সংখ্যায় খুব কম। বুলবুল চৌধুরীও ছিলেন সেই অতি অল্প সংখ্যক ভাগ্যবানদের অন্যতম।

সে যুগের কোলকাতায় মুসলিম সম্পাদিত ও পরিচালিত অভিজাত বাঙলা সাহিত্যপত্র 'বুলবুল'—বুলবুল চৌধুরীর প্রতিভাকে অকুণ্ঠ স্বীকৃতিদান করেন। সে যুগের মুসলিম পরিচালিত পত্র-পত্রিকার মধ্যে 'বুলবুল' পত্রিকাই একজন মুসলমান ছেলের 'সুকুমার শিল্পকলা'কে প্রথম অভিনন্দন জানাবার উদার মানসিকতা দেখিয়েছিলেন। সুসাহিত্যিক জনাব হাবিবুল্লা বাহার ও বেগম সামসুন্নাহার মাহমুদ এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন। বুলবুলের বিভিন্ন নৃত্যভঙ্গির আলোকচিত্রসহ বুলবুল চৌধুরীর নাচের ওপর বিশেষভাবে লিখিত দীর্ঘ প্রবন্ধ 'বুলবুল' এ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে লেখক বুলবুলকে অনস্বীকার্য 'শিল্পপ্রতিভা' বলে আখ্যায়িত করেন। তৃতীয় বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৪৩ সনের উক্ত পত্রিকায় ভারতীয় নৃত্যের ওপর বুলবুল চৌধুরীর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিলো।

Chunati.com Pioneer in village based website

পাঁচ

১৯৩৬ সাল থেকে বুলবুল নিয়মিত নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্যে তার প্রার্থিত পথে ক্রমশঃ এগিয়ে যেতে থাকেন। তখন 'স্টেটসম্যান' থেকে 'দীপালী'—তৎকালীন কোলকাতার শ্রেষ্ঠ পত্র-পত্রিকাগুলো বুলবুলকে 'বাঙলা তথা

ভারতের শিল্পগগনের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক' বলে অভিহিত করেন। সত্যিকার প্রতিভা কখনো চাপা থাকে না—পারে না কেউ তাকে চেপে রাখতে। বুলবুলের সৃষ্টিশীল প্রতিভাও নিজের সাধনা ও চেষ্টায় ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠলো। আপন ঔজ্জ্বল্য ও স্বকীয়তায় বুলবুল সংস্কৃতি-সেবীদের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও স্বীকৃতিলাভ করতে সক্ষম হলেন।

তখন কোলকাতার 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার শিল্প-সমালোচনাকে উড়িয়ে দেবার ক্ষমতা কারো ছিলো না। তাকে নির্ভুল ও খাঁটি সমালোচনা বলে সকলেই একবাক্যে মেনে নিতেন। অর্থাৎ যে ভাগ্যবান শিল্পী 'স্টেটসম্যানে'র স্বীকৃতি পেতেন, তিনি শিল্প-জগতে স্থায়ী আসনও লাভ করতেন। বুলবুলের নৃত্য-সমালোচনা করতে গিয়ে স্টেটসম্যান তাঁর কয়েকটি নাচের বিশেষ প্রশংসা করেন। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'কচ ও দেবযানী' নৃত্যরূপায়নে স্টেটসম্যান বুলবুলকে যে সম্মান দেন, তা সকল শিল্পীর পক্ষে পরম গৌরবের বিষয়। স্টেটসম্যান বলেন : 'প্রাচীন টেকনিকের 'সিম্বোলিজম' ত্যাগ না করে 'মডার্নিজ্‌'মের সার্থক পরিবেশ সৃষ্টিতে বুলবুল 'টেগোরকে' আশ্চর্য ভাবে সাহায্য করেন ··· ··· ···' তারপর পত্রিকাটি বুলবুলের রচিত 'সাধনা' 'ইন্দ্রসভা' 'সাপুড়ে' ও 'মরুভূমির গানে'র ভূয়সী প্রশংসা করেন।

Chunati.com Pioneer in village based website

তখনকার ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইংরেজি দৈনিক—'অমৃতবাজার পত্রিকা' বলেন : অপরূপ নৃত্য ভঙ্গিমার মাধ্যমে হল ভর্তি দর্শকদের মনে বুলবুল যে রকম বিমল আনন্দ দান করেছেন, তা দেখে আমাদের এ কথাই মনে হয়েছে যে—ভারতের শিল্প-গগনে আর একটি 'উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কে'র আবির্ভাব ঘটেছে। চিরা-চরিত রক্ষণশীল নৈতিকতার মায়াজাল ভেদ করে, বিষয়বস্তুর দিকে বুলবুল যে মৌলিকত্ব দেখিয়েছেন, তা শুধুমাত্র প্রতিভাবান শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব ······'।

'স্টার অব ইণ্ডিয়া' এবং 'দীপালি' বুলবুলকে উদয়শঙ্করের সঙ্গে তুলনা করেন। এই তরুণ শিল্পীকে উদয়শঙ্করের সমকক্ষ প্রতিপন্ন করতে গিয়ে দীপালি বলেন, 'এই অনুষ্ঠানটি বুলবুলের না হয়ে যদি উদয়শঙ্করের হতো, তা হলে তাতেও তিনি যে সাফল্য অর্জন করতেন, গতরাত্রে বুলবুলও অনুরূপ সাফল্যই লাভ করেছেন······।'

এমনি করে বাঙলাদেশের শিল্পী-জগতে বুলবুল একটি স্থায়ী আসন লাভ করেন। আসন তো নয় সে হলো তাঁর প্রতিষ্ঠা। ১৯৩৫-'৩৬ সনে বুলবুল কয়েকটি 'শো'-তে স্বনামখ্যাত সাধনা বসুর সহশিল্পীরূপে অংশ নেন এবং সে বছরই তিনি সাধনা বসুর গ্রুপ ত্যাগ করেন। ১৯৩৭ সনের প্রথম দিকে বুলবুল 'ওরিয়েন্টাল ফাইন আর্টস এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিভা মোদক, কমলেশ কুমারী, মণিকা দেশাই, প্রতিমা দাশগুপ্তা প্রমুখ সে যুগের অভিজাত নৃত্যশিল্পীরা বুলবুলের এই প্রতিষ্ঠানে সানন্দে যোগদান করেন।

নিতান্ত খেয়ালের বশে, চাতকের রূপে একদা 'ফটিক জলে'র সন্ধান করতে গিয়ে যে আনন্দ তিনি পেয়েছিলেন সেই আনন্দই করেছিলো তার সত্যিকার শিল্পী-জীবনের উন্মোচন। তারপর মাত্র অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিভাবান নৃত্যশিল্পী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে ঘটলো তার স্থায়ী প্রতিষ্ঠা। উন্মেষের মুহূর্তে শিল্পী হিসেবে বুলবুল নিয়েছিলেন জন্ম, আর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে সেই নবজাতক লাভ করলেন অমরত্ব।

Chunati.com
Pioneer in village based website

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এক

বুলবুল জীবনের শিল্প-রূপ দেখেছিলেন নৃত্য-শিল্পের মুকুরে। নিজের জীবনকে তিনি যখন শিল্পের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে ফেলেন, তখন শিল্পকে বুলবুল শুধু শিল্পরূপেই দেখেছিলেন। তখন তাঁর ধারণা ছিলো, শিল্প রাজনৈতিক বা দার্শনিক মতবাদ প্রচারের হাতিয়ার নয়। শিল্প হলো মানুষের মনের আবেগ ও ভাব, অনুভব ও সৌকুমার্য প্রকাশের একটা মাধ্যম। শিল্পকে কোনো উদ্দেশ্য সাধনের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের নীতিকে তিনি বিশ্বাস করতেন না। তখন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো সেই সনাতনী 'আর্ট'স ফর আর্ট' সেক' ধরনের। কিন্তু নাচের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন ভাবধারা এবং কৌশলের প্রবর্তন করার জন্য যে শিল্পীর জন্ম হয়েছিলো, তাঁর পক্ষে সনাতন চিন্তাধারার মায়াজালে নিজেকে আচ্ছন্ন করে রাখা ছিলো অসম্ভব। বাল্যকাল থেকেই বুলবুলের অভ্যাস ছিলো চিন্তা করবার। একে তাঁর একটা 'বিশেষত্ব' বলা যায়। চুলচুলে চঞ্চল ছেলেটি মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবতেন। তখন তাঁর দু'চোখের দৃষ্টি কোথায় যেন হারিয়ে যেতো। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুলবুলের এই অন্যমনস্কতা রূপান্তরিত হয়ে আরো অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। যখন তিনি একান্তভাবে একাগ্রমনে ও এক দৃষ্টিতে কোনো দিকে চেয়ে থাকতেন, তখন তাঁর দিকে তাকিয়ে মনে হতো—তাঁর ওই দৃষ্টি এইদিন, এইক্ষণ, এইযুগ, এইস্থান পেরিয়ে অন্য কোনো পৃথিবীতে যেন হারিয়ে গেছে। অন্য কোনো ক্ষেত্রে, ভাবীকালের অন্য কোনো যুগে, ওই দৃষ্টি যেন কিছু একটা খুঁজে বেড়াচ্ছে। তখন তাঁকে দেখে আপনজনেরা বুঝতে পারতেন, হয়তো কোনো কারণে তাঁর মন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। তখন তিনি নিজেও হয়তো বুঝতে পারতেন না, তিনি কিসের খোঁজ করছেন নিজের মনের অতলান্তে ডুব দিয়ে। কিন্তু বড় হয়ে সেই প্রশ্নের জবাব তিনি পেয়েছিলেন নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে পৃথিবীটাকে চেনার মধ্যে। ছেলেবেলার সেই আপনহারা দৃষ্টি জীবনে

Ghunati.com
Pioneer in village based website

কোনো দিনই হারাননি বুলবুল। শিল্পী হিসেবে স্থায়ী আসন লাভের পরেও, তাঁর সেই দৃষ্টি মাঝে মাঝে ঠিক তেমনি করেই হারিয়ে যেতো। তাঁর বিক্ষুব্ধ মন নৃত্যের ক্ষেত্রে সেই সনাতন ভাবধারায় যেন তৃপ্তি পেতেন না। তাই সুযোগ মতো নিজের মনে মনে সেই চিন্তাতেই বুঝি মগ্ন হয়ে যেতেন বুলবুল।

এইভাবে চিন্তার ফলে যথা সময় একটা গভীর উপলব্ধি তাঁর মনে দেখা দেয়। যুগের চরিত্র বিচার করে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, সনাতন ভাবধারা সমৃদ্ধ শিল্প এই গতিমান যুগে অচল হয়ে পড়তে বাধ্য। কারণ সে শিল্প এখন আর মানুষের মনের চাহিদা মেটাতে সক্ষম নয়। তাই এই একঘেয়ে পথ হতে সরে যেতে হবে। স্থানুর মতো নিশ্চল অবস্থা থেকে নৃত্যশিল্পকে যুগের গতির সঙ্গে, জীবনের চাহিদার সঙ্গে এগিয়ে নিতে হবে। কিন্তু কেমন করে?

মনের মধ্যে এই সমস্যা-সঙ্কট নিয়ে বুলবুল পাগলের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলেন—কখনো শিকার করার অছিলায় চুনতির বনে বনে, কখনো স্নেহপ্রাণ মেজো চাচার কাছে, দোহাজে—পদ্মা নদীর বুকে, কখনো বা বন্ধুদের আড্ডায় আড্ডায়। একদিকে এই সমস্যা, অন্যদিকে কলেজের পড়াশোনা। কিন্তু সেই চিন্তার ঘোর নিয়ে কলেজের পড়াশোনাতে মন দেওয়া সম্ভব নয়। তাই এ সময় বুলবুল অনার্স কোর্স ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। রুটিন বাঁধা পড়া তৈরী করার ছেলে বুলবুল কোনো দিনই ছিলেন না। কিন্তু মৌলিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকেও অস্বীকার করেননি কখনো। জাতশিল্পী হয়েও এর গুরুত্বকে তিনি স্বীকার করেছেন। কিন্তু শুধুমাত্র পরীক্ষা পাশের জন্য পড়াশোনা করাকে বিরক্তিকর বলেই মনে করতেন বুলবুল। পড়াশোনা করতে হয় মুখ্যতঃ জ্ঞান অর্জনের জন্য এবং জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে যে পড়াশোনা তা চলে মনের তাগিদে। তাই সত্যিকার জ্ঞান আহরণের দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিলো বেশী। পড়াশোনার মধ্যে সত্যিকার আনন্দ যাঁরা পেয়েছেন শুধু স্কুল কলেজের সীমাবদ্ধ পড়ার মধ্যে তাঁরা তৃপ্ত হবে কেমন করে? তাই বোধ হয় বুলবুল কলেজের বাঁধাধরা 'টেক্সট বই' পড়ার চাইতে নিজের পছন্দ মতো বই পড়তেই বেশী ভালোবাসতেন। বিভিন্ন দেশের ইতিহাস, দর্শন,

Ghunati.com Pioneer in village based website

সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বুলবুল একান্তই উৎসুক ছিলেন। ফলে সুকুমার শিল্প সম্পর্কে একটা প্রশ্ন তাঁর সামনে দেখা দেয় এবং প্রশ্নটি ক্রমশঃ আরো স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। বর্তমান যুগের পটভূমিকায় নবীন আলোকে, নতুনরূপে, নতুন ভাবকল্পনায় সমৃদ্ধ কোনো নৃত্যরূপায়ন কি সম্ভব নয়—যা সনাতন আঙ্গিক হতে মুক্ত হয়ে সহজে নিজেকে বিকশিত করতে পারে? পর্বত প্রাচীরে উৎকীর্ণ লুপ্তাবশেষ নৃত্যকলা বা প্রাদেশিক মুদ্রা বৈশিষ্ট্যই বর্তমান যুগে নৃত্যের সবখানি হতে পারে না। কিন্তু ভারতীয় নৃত্যের অগ্রগমনের মূল্যবান পাথেয় কোত্থেকে কুড়াবেন তিনি?

সে যুগের শিল্পীদের ধারণা ছিলো—উচ্চাঙ্গের নাচ স্বভাবতই কঠিন। সেই কঠিন নাচকে সহজ করতে গেলে তার কৌলিন্য হানি ঘটবে। সেই জন্য বোধ হয় ভারতের নৃত্যানুরাগীরা ক্লাসিক্যাল নৃত্যকে কঠিন আঙ্গিক, মুদ্রা ও তাল-লয়ের নাগপাশে বেঁধে রেখেছেন। অর্থাৎ ভারতের অনুষ্ঠানবহুল ক্লাসিক্যাল নাচ বুঝতে হলে, তার ইতিহাস জানতে হবে। সে নাচের রস গ্রহণ করতে হলে কোন মুদ্রার কি অর্থ, কোন ভঙ্গিটির কি মানে, সে সম্বন্ধে রীতি-মত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অথচ সাধারণ লোকের পক্ষে এই সব তো জানার কথা নয়—তারা কি তবে নাচের আনন্দ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিতই থেকে যাবে?

নাচকে সহজ প্রকাশের মধ্যে টেনে আনতে গেলে 'শিল্পের খাতিরেই শিল্প' পূর্বের এই ধারণা থেকে সরে আসতে হয় তাঁকে। সমস্যাটা হলো—একদিকে আঙ্গিক ও ভাব-কল্পনা থেকে শিল্পগত সৌকুমার্যকে বাদ দেওয়া যায় না, আবার অন্য দিকে সেই সৌকুমার্যের স্পর্শে সৃষ্ট নৃত্যশিল্প জীবন-ভিত্তিক হওয়া সম্ভব নয়। হয় গতানুগতিক বিষয়বস্তু আর কঠিন আঙ্গিককে বাদ দিয়ে নতুন নৃত্য পদ্ধতি আর মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ বিষয়বস্তু নিতে হবে, অথবা করতে হবে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন। সম্ভবতঃ এই সমন্বয়ের মধ্যেই সেই প্রশ্নের সমাধান দেখতে পেলেন তিনি।

সেই ভাবনার মধ্যে অবশেষে একদিন নতুন আলোক দেখতে পেলেন বুলবুল। আর সেই আলোয় অবগাহন করে তাঁর সমস্ত দেহ, মন, প্রাণ যেন আনন্দে নেচে উঠলো।

Chhuti.com Pioneer in village based website

সে'টা ছিলো ১৯৩৬ সাল। সেই পাওয়ার ইতিহাস বলি—আমেরিকার 'মার্কাস কোম্পানী' কোলকাতায় ফার্স্ট এম্পায়ারে কয়েকদিন ধরে পাশ্চাত্য নৃত্যকলা পরিবেশন করেন। বিদেশী শিল্পীদের সম্মনার্থে কোলকাতার শিল্পীরা মিলে বিশেষ একটি নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানটিতে বুলবুলও স্বরচিত নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন। বুলবুলের সেই নাচ দেখে মিঃ মার্কাস এত মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত হলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই মঞ্চেই বুলবুলকে নিজের দলভুক্ত করে নেবার প্রস্তাব করে বসেন। প্রস্তাবটি শুনেই বুলবুলের মনে একটি প্রশ্ন জাগে—মিঃ মার্কাস তাঁর নাচে এমন কি বিশেষত্ব দেখতে পেলেন? কি বিশেষত্ব দেখে তিনি এত মুগ্ধ হলেন?

মিঃ মার্কাসের প্রস্তাব গ্রহণ করা অন্য যে কোনো শিল্পীর পক্ষে হয়তো পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু সৃষ্টিশীল ও আত্ম-মর্যাদাসম্পন্ন শিল্পীর পক্ষে, বিদেশী শিল্পীর প্রস্তাব গ্রহণ তো সম্ভব নয়। নিজের প্রতিভার প্রতি একটা বিশ্বাস বুলবুলের বরাবরই ছিলো। তারপর, একজন অভিজ্ঞ বিদেশী শিল্পীর চোখ যখন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, সেই মুহূর্ত থেকে তাঁর সেই বিশ্বাস আরো যেন দৃঢ় হলো। আমরা পূর্বেই বলেছি নতুন বিষয়বস্তুর সমন্বয়ে, নতুন পদ্ধতিতে, নৃত্যরূপায়নের ব্যাপারে বুলবুল ইতিপূর্বে ভাবতে শুরু করেছিলেন এবং এই অনুষ্ঠানেই তাঁর নতুন পদ্ধতির নৃত্য-রূপের কিছু পরিচয় সর্বপ্রথম দর্শকের সামনে তুলে ধরেন। একজন বিদেশী শিল্পীর পরিচালনাধীনে কাজ করতে গেলে তাকে নিজের বৈশিষ্ট্য হারাতেই হবে। ফলে ধীরে ধীরে, বিদেশী সংস্কৃতির দৈন্য ও সীমাবদ্ধতার কারা প্রাচীরে তাঁকে থাকতে হবে বন্দী হয়ে। কিন্তু বুলবুলের মতো সৃষ্টি-শীল শিল্পী সে রকম অবস্থায় পড়া মানেই জীবন্মৃত হয়ে থাকা, নিজের শিল্পের অপমৃত্যু ডেকে আনা। তাই মার্কাসের প্রস্তাব শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যেকার স্রষ্টা শিল্পী যেন মাথা ঝাকুনি দিয়ে জেগে উঠলো। তাঁর মনের একান্ত নিভৃতে, দরদী-শিল্পীর সুপ্ত সত্তা, শতদলের মতো বিকশিত হয়ে উঠলো। তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে, নতুন শিল্প-রূপ-সৃষ্টির সার্থকতা বুঝিবা দিনের আলোর মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তারপর হৃদয়ের নিভৃতালয় থেকে,

Chunati.com
Pioneer in village based website

আগামী দিনের কোনো এক শিল্পী-স্রষ্টাই যেন বুলবুলের কণ্ঠে সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আপনাকে প্রকাশ করেছিলো : '- - - যশ, খ্যাতি ভালোবাসি সন্দেহ নেই, কিন্তু মিঃ মার্কাস, তার চেয়েও যে আমার দেশ ও দেশের মানুষকে ভালোবাসি অনেক বেশী। আমার দেশের সুপ্ত আত্মা আর দেশের মানুষের প্রাণকে জাগিয়ে তোলার মহান দায়িত্ব পালনের জন্য দেশেই আমাকে থাকতে হবে……'।

দেশ আর দেশের মানুষ, দেশের আত্মা আর দেশের মানুষের প্রাণ—সেই হলো তাঁর নতুন চিন্তাধারার প্রেরণা ও উৎস। সেই হলো যেন তাঁর নতুন উপলব্ধির নবারুণ। সেই হলো শিল্পের এক নবরূপ উদ্ঘাটন। আর সেই হলো তাঁর নতুন নতুন দিগ্বিজয়ের যাত্রা শুরু।

পাষাণময় নিরুদ্ধার অর্গল ভেঙে বুলবুলের নতুন-দৃষ্টি-সমৃদ্ধ শিল্পীমন, পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়লো। যেন বন্দী আত্মা পাথরের দেয়াল ভেঙে ছিটকে বেরিয়ে এলো মুক্তির সবুজ স্বপ্ন-রাজ্যে, আশার আনন্দলোকে। মুহূর্তে শিকলের বন্ধন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। তখন তাঁর মন জুড়ে স্থান নিলো নতুন ভাব, নতুন সাধনার বীজমন্ত্র—'দেশ আর দেশের মানুষ, দেশের আত্মা আর দেশের মানুষের প্রাণ।'

Gunati.com
Pioneer in village based website

বুলবুলের মনের অস্পষ্টতার ও দ্বন্দ্বের অবসান হলো। এবং মনের উপলব্ধি দিয়ে, নিঃসন্দেহ হলেন যে—'শিল্পের খাতিরেই শুধু শিল্প নয়, জীবনের প্রয়োজনেই শিল্প'। আর সেই জন্যই শিল্পকে নিয়ে আসতে হবে সহজ সরল সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার মধ্যে। দেশের মানুষের প্রাণসঞ্জীবনী রূপে। সমাজের গলদ এবং জীবনের কদর্যতাকে প্রকাশ করে দিতে হবে নির্মমভাবে। সুষ্ঠু জীবন গড়ার কাজে কোনটা সহায়ক, কোনটা প্রতিবন্ধক, তা সহজ ভাবে, সহজ অঙ্গ বিন্যাসে সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে দিতে হবে। নইলে নৃত্য শুধু মুষ্টিমেয় লোকের অবসর বিনোদনের উপকরণ আর ভাব বিলাসীদের আকাশচারী স্বপ্ন হয়ে থাকবে। সাধারণ মানুষের মনে পেঁছুতে পারবে না।

দুই

এই দার্শনিক উপলব্ধি, দিব্যজ্ঞানের মতো হঠাৎ মহাশূন্য থেকে বুলবুলের মনে জুড়ে বসেছে ভাবলে ভুল হবে। এ হলো তাঁর অনেক দিনের শিল্প-সংক্রান্ত বিষয়ে পড়াশোনা এবং গভীর চিন্তাধারা ও আত্মোপলব্ধির স্বাভাবিক ফল। বাল্যকাল থেকে বুলবুল মৌচাক, শিশুসাথী, সন্দেশ ইত্যাদি শিশু-মাসিকগুলোর নিয়মিত পাঠক ছিলেন। বড় হয়ে তিনি সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পত্রিকা ও ভালো লিখিয়েদের বই-পত্রের প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। 'বুক অফ নলেজে'র দশটি বিরাট খণ্ড পড়তে গিয়েও সেই একাগ্র মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। এমনি ভাবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পড়াশোনার স্পৃহাও স্বাভাবিক ভাবেই বেড়ে গিয়েছিলো। বিদেশী বইপত্রের পুস্তক তালিকা ঘাঁটতে নিয়ে এই 'বুক অফ নলেজ' বুলবুলই আবিষ্কার করেছিলেন। এবং বাবার কাছে আব্দার করে, বায়না ধরে, কেঁদে কেটে, অবশেষে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে বাবাকে রাজি করিয়েছিলেন এই দশ খণ্ড দামী বই কিনে দেবার জন্য। পড়াশোনার মধ্যে নানা দেশের সভ্যতা, শিল্প-সংস্কৃতি ও সম্ভাব্য সকল রকম খবর বুলবুল রাখতেন। একাগ্র অনুশীলন ও মনন-শীলতার ফলে ক্রমে ক্রমে এই কথাটি বুলবুল বিশেষ ভাবে বুঝতে পেরে-ছিলেন যে—প্রত্যেকটি দেশের বা জাতির শিল্প ও সংস্কৃতির উৎপাদান উদ্দেশ্য এবং সুর এক ও অভিন্ন। সেই সঙ্গে আরো একটা কথা তাঁর মনে স্বাভাবিক ভাবেই জেগেছিলো যে—সামগ্রিক ভাবে সকল দেশের সংস্কৃতির মৌলিক সমস্যাও এক।

শিল্পকে যেমন জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখা সম্ভব নয়, তেমনি রাজনৈতিক, সামাজিক বা দার্শনিক কাঠামো থেকে জীবনকে বিচ্ছিন্ন ভাবে বিচার করাও অসম্ভব। এই উপলব্ধি হলো বুলবুলের শিল্প সম্পর্কীয় মতবাদের ভিত্তি। সেই অবস্থায় মনের আবেগ ও উৎকণ্ঠা চেপে রাখতে না পেরে চঞ্চল পায়ে ছুটে যেতেন দেশের বাড়িতে, বাবা-মায়ের কাছে। এ সম্বন্ধে বাবার সঙ্গে আলাপ করা প্রয়োজন। কিন্তু বাবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি কিছুই বলতে পারতেন না।

তাই মা'কে নিয়েই পড়তেন। কিন্তু মা তাঁর সহজ বুদ্ধিতে এত সব কথা বুঝবেন কি করে, তবুও ছেলের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন আর এক ধরনের আনন্দে ও আশায় তিনি আকুল হতেন। ভাবতেন—স্নেহে শাসনে, প্রেমে প্রীতিতে, যে মেয়ে তার টুনুকে ঘিরে রাখতে পারবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে, তেমনি একটি মেয়ে কখন তিনি ঘরে আনতে পারবেন। আর কত দেরী তার ? আর বাবা ভাবতেন—এই চঞ্চল ছেলে শেষ পর্যন্ত দুস্তর বিদ্যার সাগর পাড়ি দিয়ে উঠতে পারবে কিনা, কবে সে ধীর স্থির হবে ?

কিন্তু যাঁর মনপ্রাণ, দেহ আত্মা, চিন্তা ভাবনা সব কিছুতেই সুর ও ছন্দের দোলা লেগেছে, যাঁর চিন্তার জগতে যুগান্তর ঘটে গেছে, যাঁর জীবন-তরুর ডালে ডালে ইরাণের বুলবুল শিস্ দিয়ে বেড়াচ্ছে, তাঁর জীবনযাত্রার গতি নির্ধারণ সম্পর্কীয় প্রশ্নের মীমাংসা যে বাবার হিসেবের বাইরে।

বাবার আশা ছিলো বুলবুল উচ্চশিক্ষা লাভ করবে এবং উচ্চপদমর্যাদা সম্পন্ন চাকরি করবে। বৃদ্ধ বয়সে বাবা কিছুতেই এই গতানুগতিক চিন্তার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারলেন না। বংশের বড় ছেলে হিসেবে তিনি যেন বটবৃক্ষের মতো পরিবার পরিজনের ওপর ছায়াদান করতে পারেন, তারই জন্য একটা শক্ত ভিতের ওপর বুলবুলকে দাঁড়াতে হবে, তারপর অন্য কথা। নিজের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য নিয়ে তাই একদিন তিনি বুলবুলকে কাছে ডেকে বললেন : লেখাপড়া শেষ করে একটা ভালো লাইন বেছে নিয়ে আগে শক্ত হয়ে দাঁড়াও, তারপর তোমার শিল্পের জন্য যা করতে চাও করো। আমার আদেশ—তোমাকে এম. এ. পাশ করতেই হবে।

Chunati.com
Pioneer in village based website

এদিকে তখন বুলবুলের মত ও পথ যে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। বারবার আত্মজিজ্ঞাসার মধ্যেই তিনি জীবনের ক্ষেত্র বেছে নিয়েছেন। একে এখন ব্যর্থ হতে দেখেন কি করে? নিজের সিদ্ধান্তে ও প্রতিজ্ঞায় তাঁকে অটল থাকতেই হবে। বিতর্কের কোন অবকাশই নেই আর। এই ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্য সকল রকম প্রতিকূলতা ও বাধা বিপত্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজন হলে তিনি আমরণ সংগ্রাম করবেন। আত্মবিশ্বাসে অবিচল থেকে, নিজের শিল্প পরিকল্পনা রূপায়ণের গুরুদায়িত্ব নিয়ে তাঁকে এই পথে এগিয়ে যেতেই

হবে। যাঁর মনে শক্তি আছে, আত্মবিশ্বাস আছে, কোনো রকম বাধা বিপত্তিই তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারে না।

অন্য যে কোনো বাধাকে অতিক্রম করা যেতে পারে, কিন্তু বাবা? মা? পিতামাতার আদেশ অমান্য করার, উপেক্ষা করার শিক্ষা তো তিনি পাননি। তাই বুঝি তাঁর অনুগত পিতৃ-ভক্ত মনে এমন একটা শক্তি পেয়েছিলেন যাতে তিনি নিজের পরিকল্পনাকে রূপায়িত করার সঙ্গে সঙ্গে বাবার আদেশ পালনের কঠিন সিদ্ধান্তও নিতে পেরেছিলেন।

কিন্তু তবুও তাঁর মনের দ্বন্দ্ব ঘুচলো না। জীবনে বাবা মা'র আশীর্বাদ যে একান্ত প্রয়োজন। বুলবুলের একটা বিশ্বাস ছিলো যে—বাবার বিদগ্ধ মনের স্পর্শে হয়েছে তাঁর শিল্প-চেতনার জন্ম। আর ভক্তিমতি মায়ের সর্বজনীন স্নেহপরায়ণতায় তিনি শিখেছেন দেশকে ভালোবাসতে। সেই পিতা-মাতার আশীর্বাদ ছাড়া তিনি কি করে জীবনের এই বন্ধুর পথ অতিক্রম করবেন? সুতরাং বাবাকে সব কিছু খুলে বলতে হবে। নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর মনে যে বিশ্বাস ও উচ্চাশা রয়েছে, তার কথা বাবাকে জানাতে হবে।

১৯৩৮ সালের একত্রিশে আগস্টে কারমাইকেল হোস্টেল থেকে বুলবুল বাবাকে একখানা পত্র লেখেন। সেই চিঠিতে নিজের মত ও পথ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর উপসংহারে তিনি লিখেছিলেন:

'- - - - - আমার জন্য কোনোই চিন্তা করিবেন না, সর্বদা মনে এই বিশ্বাস রাখিবেন যে, আপনার পুত্রের ভবিষ্যৎ চির উজ্জ্বল! সমস্ত পৃথিবী বিস্ময়ে একদিন তাকাইয়া থাকিবে আমার প্রতি। যে সারল্য ও দায়িত্বজ্ঞান লইয়া আমি কাজ করিতেছি, তাহার প্রতিদান আমি পাইবই - - - - -'

নৃত্যশিল্পের প্রতি বুলবুল যে ক্রমশ: বেশী করে ঝুঁকে পড়ছেন, তা বাবা জানতেন। ১৯৩৬ '৩৭ '৩৮শে বাবা কয়েকবারই ফার্স্ট এম্পায়ারে বুলবুলের নাচ দেখেছিলেন। তাঁর ছককাটা পথে বুলবুল যে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে না—তা তিনি তখনই বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেজন্য তিনি চিন্তিতও হয়েছিলেন। কিন্তু নাচ দেখে নিঃসন্দেহে তিনি মুগ্ধও হয়েছিলেন। সুন্দর

Chunati.com
Pioneer in village based website

অভিব্যক্তির মাধ্যমে বিষয়বস্তুর এমন পরিষ্কার পরিবেশন তিনি যেন কল্পনাও করতে পারেননি। বাবার মনে একটা ধারণা বরাবরই ছিলো যে, বুলবুল যে কোনো লাইনে বড় হতে পারবেন। সরকারী চাকরি ও কথা-শিল্পীর মধ্যেই তিনি তাঁর পুত্রের বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু তাঁর ভাবনা বুলবুলের নাচ দেখার পর থেকে অন্য পথে মোড় নিয়েছিলো। তারপর এই চিঠি পড়ে বুলবুলের বিশ্বাসকে তিনি উড়িয়ে দিতে পারলেন না। এবং তিনি নিজেও তখন এ সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলেন। যে কারণেই হোক, দেশ বিদেশের অধিকাংশ শিল্পীই তাদের বিড়ম্বিত ভাগ্যকে জয় করতে পারেনি, সচরাচর এই রকমই হয়ে আসছে। বাবার মনের সবচাইতে কোমল জায়গাটিতে এই ভাবনা আঘাত করতো বড় গভীরভাবে। তাই বোধ হয়, পড়াশোনা শেষ করে একটা শক্ত বুনিয়াদ তৈরী করার জন্য ছেলেকে তিনি বারবার তাগিদ দিচ্ছিলেন। বুলবুলের এই চিঠির উত্তরে তিনি তাঁর সেই কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পর তাঁর সাফল্য কামনা করে লিখলেন: 'তোমার কাজের জন্য তুমি পুরস্কৃত হও, তোমার এই পথ নিষ্কণ্টক হোক। জীবনে জয়ী হও'।

Pioneer in village based website

বুলবুলের শিল্পী জীবনকে, সে বারই বাবা প্রকাশ্যভাবে সমর্থন ও আশীর্বাদ করলেন। বি এ. ডিগ্রী নেবার পর বুলবুল তাঁর শিল্পসংঘ 'ও এফ এ,র বা 'ওফা'র কয়েকজন সদস্য নিয়ে ইউরোপ টুরে যাওয়ার সংকল্প করেন এবং সেজন্য সকল রকম ব্যবস্থা করতে থাকেন। কিন্তু যুদ্ধ লেগে যাওয়াতে বুলবুলের সে সংকল্প ব্যর্থ হয়েছিলো। এই ব্যর্থতায় বুলবুল নিরুৎসাহ হতে পারে ভেবে বাবা তাঁকে প্রকাশ্যভাবে আশীর্বাদ জানিয়ে উৎসাহিত করেছিলেন। বাবার আশীর্বাদ পেয়ে বুলবুল যেন সেই বাল্যকালের মত উড়ে চলে গেলেন আকাশের সীমানা ছাড়িয়ে নিজের স্বপ্ন-রাজ্যে। নিজের উপলব্ধিকে বাস্তবক্ষেত্রে রূপ দানের কাজে আর কোনো বাধাকেই তিনি বাধা মনে করলেন না।

তিন

পরবর্তীকালে বুলবুল তাঁর শিল্প-সাধনায় অপূর্ব সাফল্য লাভ করেছিলেন। ছেলেবেলার সেই—'দি গ্রেটেষ্ট বয় আর্টিষ্ট অব দি ঈষ্টে'র স্বপ্ন বিফল হয়নি। সারা পাক-ভারত উপমহাদেশ আর পশ্চিম ইউরোপ—পৃথিবীর একাংশ তাঁর প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলো অকুণ্ঠ চিত্তে। সারা পৃথিবীর দৃষ্টি নিজের দিকে আকৃষ্ট করবার সময় পাননি তিনি। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে, যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন, তার জন্য তাঁকে অনেক মুল্য দিতে হয়েছে ও অদ্ভুত ধৈর্য ধারণ করতে হয়েছে। শারীরিক ও আর্থিক অনেক, অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। এসব পরের কথা--এখন আগের কথাতেই ফিরে আসা যাক।

শিল্পীজীবনে বাবার সমর্থন আর আশীর্বাদ পেয়ে, বুলবুল শিল্পীসংঘের নিজস্ব একটি শিল্প-নিকেতন প্রতিষ্ঠা করে, বাঙলা ও বাঙলার বাইরে নৃত্যকলা প্রদর্শন করতে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। এই সফরে নিজের পরিকল্পিত ও আঙ্গিক সমৃদ্ধ নৃত্যনাট্য পরিবেশন করার কাজে, বুলবুল গভীর ভাবে আত্মনিয়োগ করেন। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই—শুধু 'এক্সপেরিমেন্ট' আর 'এক্সপেরিমেন্ট'। নাচ আর পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ আর সমালোচনা। এমনি ভাবে একটি নৃত্যনাট্য রচনা করেন, আর তাই নিয়ে অনেক দিন লেগে থাকেন, সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে গুণাগুণ পরীক্ষা করেন। বিষয় আর আঙ্গিক—একটার সঙ্গে অন্যটার মিল না হলে, নিষ্ঠুরভাবে কাটছাট চালান—একবার বিষয়বস্তুর ওপর আবার আঙ্গিকের ওপর। এমনি ভাবে বুলবুলের সজাগ শিল্পী-মানস, তাঁর শিল্পকর্মকে যাচাই করে নিতো। যাচাই করার পর, সব নাচ টিকে গেলে, সাংস্কৃতিক সফরের অনুষ্ঠান-লিপিতে স্থান পেলো তারা। তার মধ্যে কয়েকটির নাচ হলো—'আবহন' 'চাঁদনী রাতে' 'হারেম-নর্তকী' 'জীবন-মৃত্যু' 'ভবঘুরের দল'। শুধু সেবার বলে নয়, নৃত্যশিল্পী হিসেবে, ব্যাপক স্বীকৃতি লাভের পরও বুলবুলের প্রত্যেকটি রচনায় যখনই প্রয়োজন বোধ করেছেন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে কখনো ইতস্ততঃ করেননি।

১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাসে ও. এফ. এ.'র বারোজন শিল্পী সহযোগে

Chunati.com
Pioneer in village based website

বুলবুল ঢাকায় এসে পৌছান। এই নৃত্যানুষ্ঠান ঢাকার শিল্পানুরাগী কর্তৃক বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয় সত্য, কিন্তু গোঁড়া মুসলিম সম্প্রদায় অনুষ্ঠানটিকে সমর্থন না করাতে তাঁদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিলো। অর্থ সংগ্রহ তো দূরের কথা, আনুষঙ্গিক খরচপত্রের জন্যও বুলবুলের হাতে কিছু ছিলো না। সে সময় বাবা টি এম. ও. করে দুই হাজার টাকা দিয়ে বুলবুলকে দুশ্চিন্তা মুক্ত করেছিলেন। ঢাকাতেই তাঁদের সাংস্কৃতিক সফর শেষ করতে হয়েছিলো।

কিন্তু শিল্পীর স্বপ্ন বৃহত্তর, কল্পনা সুদূর প্রসারী। তাই তিনি চুপ করে বসে থাকতে পারেন না। নতুন চেতনা, নতুন পরিকল্পনায় তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন। ব্যর্থতার দুঃখ বুকে চেপে তাই আবার কাজে নেমে পড়েন। যে কারণেই হোক, সে সময় কোলকাতার 'ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘে'র সাংস্কৃতিক শাখা নির্জীব হয়ে পড়েছিলো। সঙ্ঘের সেই দুরবস্থা দেখে বুলবুল তাদের মধ্যে এগিয়ে গেলেন এবং এই বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাংস্কৃতিক শাখাটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে সব রকম দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ছিলো 'ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘে'র কর্মক্ষেত্র। এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা ছিলেন আদর্শবাদী। তাদের আদর্শের গোড়ার কথা ছিলো—সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের অস্ত্র হিসেবে 'শিল্পে'র ব্যবহার। তাঁরা সকলেই হয়তো সরাসরি রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। কিন্তু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনকারীদের সাহায্য করতেন। বুলবুলের মতো তাঁরাও 'শিল্পের উদ্দেশ্য' সম্পর্কে একই মত পোষণ করতেন। শিল্পকে তাঁরা দেখতেন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের একটা শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে। তাই তাঁদের চেষ্টা ছিলো—শিল্পের মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে করে তোলা।

৩

Chunati.com Pioneer in village based website

চার

ইতিমধ্যে নেমে এলো মহাযুদ্ধ—যুদ্ধতো নয়, সে এক অভাবিতপূর্ব ধ্বংস, নজির-বিহীন অরাজকতা। একদিকে ফ্যাসিবাদের প্রলয়ঙ্করী গর্জন, অন্যদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্য, স্বাধীনতার জন্য, জাগ্রত ভারতবাসীর ব্যাপক অভ্যুত্থান। মানুষের সহজ জীবনযাত্রা হলো সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। বাঙলার লক্ষ লক্ষ ঘর থেকে নীড়ের শান্তি তিরোহিত হয়ে গেলো। মানুষের জীবনে দেখা দিলো বিশৃঙ্খলা। অভাব এলো, রোগ এলো, শোক এলো—একটু একটু করে সাধারণ মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙতে শুরু করলো। সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবন ভেঙে তচ্‌নচ্‌ হয়ে গেলো। চারিদিকে দেখা দিলো হতাশা আর হাহাকার—দুর্দশাগ্রস্ত বিশৃঙ্খলা মানুষ যেন নিজেদের ইতিকর্তব্য ভুলে গেলো।

শুধু সংস্কৃতির নয়—তখন কোলকাতা ছিলো ভারতবর্ষের সব কিছুরই প্রাণকেন্দ্র। রাজনৈতিক আন্দোলনের তো বটেই। প্রায় সব কয়টি যুগান্তকারী রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিলো এই কোলকাতায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর বিক্ষুব্ধ আন্দোলন পেশাওয়ার থেকে চট্টগ্রাম, আর কাশ্মীর থেকে কুমারিকা পর্যন্ত যে মহাপ্রলয়ের সৃষ্টি করেছিলো, তার প্রায় প্রত্যেকটির খণ্ড আন্দোলনের গোড়া পত্তন হয় এই কোলকাতাতেই। এর প্রধান কারণ সম্ভবতঃ এই যে প্রত্যক্ষ ভাবে হোক, অথবা পরোক্ষ ভাবেই হোক, বাঙালীরাই বারবার ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব করে এসেছে এবং কোলকাতাই ছিলো তাঁদের প্রধান কর্মক্ষেত্র। তাই বোধহয়, কোলকাতার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ওপর রাজনৈতিক প্রভাব ছিলো অত্যন্ত প্রকট ও সুস্পষ্ট। সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্যকলা প্রভৃতিতে তার অসংখ্য প্রমাণ রয়ে গেছে। যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে, শিল্পের ক্ষেত্রে যে নতুন 'ধারা' দেখা দেয়, তার ফলে শিল্পী সাহিত্যিকদের একটা চরম সমস্যার মুখোমুখি এসে দাঁড়াতে হলো। হয় এই নতুন ভাবধারার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে হবে, নতুবা সাংস্কৃতিক জগৎ থেকে সরে যেতে হবে। প্রথমটি হলো—শিল্পীর 'নবজন্ম' আর দ্বিতীয়টি তার 'অপমৃত্যু'।

Eboinati.com Pioneer in village based website

শিল্পী হিসেবে বুলবুলও এই সমস্যার সম্মুখীন হলেন। তিনি বুঝেছিলেন—শিল্পরূপের মধ্যে শিল্পীকে অমরত্ব লাভ করতে হলে, তাঁকে জীবনধর্মী ও বাস্তবমুখী হতে হবেই। অর্থাৎ জীবনের প্রয়োজন, দাবী ও চাহিদার সঙ্গে তাঁকে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে যেতে হবে। জীবনের সুখে তাঁকে সুখী হতে হবে। জীবনের ব্যর্থতায় তাঁকে জানাতে হবে সমবেদনা। প্রকাশ করতে হবে তার দুঃখ ও হতাশাকে। জীবনের সাফল্যে তাঁকে আনন্দমুখর হয়ে উঠতে হবে। আর জীবনের দুঃখে তাঁকে জানাতে হবে সান্ত্বনা, শোনাতে হবে আশ্বাসবাণী। জীবনের সঙ্গে এমনি করে মিশে যেতে পারলেই শিল্পসৃষ্টি হবে সার্থক ও সফল।

প্রথমতঃ চলতি যুগ ও তার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে শিল্পের কাছে তার সাময়িক দাবী কি তা নির্ধারণ করা এবং সম্ভব মতো সেই দাবী মিটানোর জন্য নির্ভুল ভাবে এগিয়ে যাওয়া। আর দ্বিতীয়তঃ শিল্পের মূল্যবোধ বিশ্লেষণের মাধ্যমে কালজয়ী শিল্প-সৃষ্টি করা। 'কালজয়ী' শিল্প-সৃষ্টি বলতে এই বুঝানো যেতে পারে যে যতদিন মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব থাকবে, সেই শিল্পসৃষ্টিও ততদিন বেঁচে থাকবে। প্রথমটার ভিত্তি যুগের বুকে, যুগের প্রাণে—যে যুগের সঙ্গে তার অবস্থিতি, তার দানও সেই যুগেরই প্রতি। দ্বিতীয়টির ভিত্তি হলো মানুষের বুকে মানুষের প্রাণে। তার দান কোনো একটি বিশেষ যুগের প্রতি নয়। তার দান সর্বযুগে ও সকল মানুষের প্রাণের দাবী মিটানো। যতদিন মানুষ নিজের জীবনে সংস্কৃতির প্রয়োজন অনুভব করবে, সেই যুগ-নিরপেক্ষ শিল্পসৃষ্টিও ততদিন বেঁচে থাকবে। বুলবুলের নৃত্যনাট্য 'মন্বন্তর' ও 'জাগৃতির আহ্বান' হলো প্রথম দৃষ্টি ভিত্তিক। 'উন্মেষ', 'হাফিজের স্বপ্ন', 'প্রেরণা' ইত্যাদি নৃত্য দ্বিতীয় দৃষ্টি ভিত্তিক। প্রথম শ্রেণীর নৃত্যনাট্য সৃষ্টির প্রেরণা যুগিয়েছে—যুগের চাহিদা, যুগের দাবী, যুগের প্রয়োজন। দ্বিতীয় শ্রেণীর নৃত্য রচনার মূলে রয়েছে প্রাণের আবেগ, প্রাণের দাবী। বুলবুল নতুন যুগের এই 'ধারা'র চরিত্র নির্ভুলভাবে বুঝতে পেরেছিলেন বলেই উভয় শ্রেণীর নৃত্য রচনায় তিনি সমান দক্ষতা দেখাতে পেরেছেন। একথা অনস্বীকার্য যে 'হাফিজের স্বপ্ন', 'ইরাণের এক পান্থশালায়' ও 'জীবন ও মৃত্যু' শ্রেণীর সৃষ্টি শিল্পী হিসেবে বুলবুলকে অমর করে রাখবে চিরদিন।

এখানে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন—উভয় শ্রেণীর সৃষ্টির মধ্যে, শিল্পগত মৌলিক মিল থাকা সত্ত্বেও দুয়ের মধ্যে বিরাট একটা তফাৎ আছে। প্রথম শ্রেণীর সৃষ্টির স্থায়িত্ব নির্ভর করে যুগের চাহিদার ওপরই। যুগের যে বিশেষ প্রয়োজনে তার সৃষ্টি, সেই প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, সেই সৃষ্টির মূল্যও কমে যায়। তারপরও যদি সেই সৃষ্টি বেঁচে থাকে তাহলে শুধুমাত্র স্মৃতি হিসেবেই বেঁচে থাকবে, প্রয়োজন হিসেবে নয়। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনার মূল্যবোধ ও চাহিদা স্থান-কাল-পাত্র-শ্রেণী নির্বিশেষে সর্বজনীন ও সর্বকাল স্থায়ী। এরই নাম কালজয়ী শিল্প।

বুলবুল এই সত্যটি গভীর ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন বলে উভয় ক্ষেত্রেই তিনি আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়ে যেতে পেরেছেন। তাঁর এই উপলব্ধি যে কত মৌলিক তা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যায়।

বুলবুলের এই উপলব্ধিই হলো তাঁর শিল্পসৃষ্টির আত্মা। কিন্তু শুধু আত্মা নিয়েই তো কাজ চলে না—তার জন্য চাই দেহ আর প্রাণ। তাই তিনি তাঁর উপলব্ধির বিকাশ ঘটালেন দেহ আর প্রাণকে কেন্দ্র করে। দেহ হলো তাঁর নৃত্যের 'আঙ্গিক' বা 'ফরম', যা বুলবুলের প্রতিভার স্পর্শে অন্যান্য সমসাময়িক ও প্রাচীন শিল্পীদের ব্যবহৃত 'ফরম' থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সনাতন 'আঙ্গিকে'র কাঠিন্য থেকে মুক্তি পেয়ে এই নাচ হয়ে উঠলো সজীব ও সাবলীল। আর প্রাণ? সেইটি হলো আসল কথা। কারণ 'আঙ্গিক' যতই চমৎকার হোক না কেনো, বিষয়বস্তু যদি অনুরূপ না হয়, তা হলে দুয়ের সমন্বয়ে সৃষ্ট সামগ্রিক আবেদনটুকু মানুষের হৃদয়ে পৌঁছানো যাবে না। তাই পুঁথিপত্র ও বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার পুঁজি ঘেঁটে ঘেঁটে, বুলবুল রচনা করলেন তাঁর নিজস্ব ধারণা ভিত্তিক বিষয় বস্তু—যা আপন স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। আর নিজস্ব অন্তর্দৃষ্টির ধনে ধনী। আঙ্গিককে যেমন তিনি দেখেছেন তাঁর সুন্দর 'দৃষ্টি' দিয়ে, তেমনি বিষয়বস্তুকে দেখেছেন হৃদয়ের 'অন্তর্দৃষ্টি' দিয়ে। আর এই অন্তর্দৃষ্টি, লাভ করেছিলেন তাঁর গভীর অনুভব শক্তি থেকে। সেই অনুভবের রূপ হলো—'দেশ আর দেশের মানুষ', দেশের আত্মা আর 'দেশের মানুষের প্রাণ'।

Chunati.com
Pioneer in village based website

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এক

আগেই বলা হয়েছে, বুলবুলের নৃত্যনাট্যগুলো 'যুগ-ভিত্তিক' এবং 'যুগজয়ী' এই দুটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। জীবনকে তিনি কি দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, কোন বিশেষ মতাদর্শকে তিনি তাঁর জীবনদর্শন রূপে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর পরিকল্পিত নৃত্যগুলোতে তা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। দার্শনিক বুলবুলের সঙ্গে পরিচয় না ঘটলে শিল্পী বুলবুলের স্বরূপ বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। এবং শিল্পী বুলবুলকে বুঝতে না পারলে তাঁর সৃষ্টির অন্তর্নিহিত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। আবার এই বিশেষ তাৎপর্যটি ধরতে না পারলে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টাই সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে। তাই এই প্রসঙ্গটির অবতারণা।

Chunati.com
Pioneer in village based website

কয়েকটি ছাড়া বুলবুলের নৃত্যনাট্যগুলো প্রধানতঃ কাব্যধর্মী। তার মধ্যে আবার কয়েকটি বিশিষ্ট রচনার গুণগত মূল্য নির্ধারণ করতে হলে মহাকাব্যের মাপকাঠিতেই করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ 'হাফিজের স্বপ্ন' শীর্ষক নৃত্যনাট্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। পারস্যের অমর কবি হাফিজের জীবন মহাকাব্যের ভাণ্ডার থেকে আহরণ করে নেওয়া একটি 'বেদনা-বিধুর' ঘটনা নিয়ে রচিত, কবি বুলবুলের এই নৃত্যনাট্যটি :

মঞ্চের পর্দা সরে যেতে দেখা গেলো আবছা আলো-আঁধারে ঘেরা একটি কবরগাহ। একটানা করুণ সুরে মূর্ত হয়ে ওঠা, সে এক উদাস শান্তিতে ভরা মায়াময় পরিবেশ। আলোর রশ্মি ক্রমে উজ্জলতর হয়ে একটি বিশেষ সমাধিকেই স্পষ্ট করে তুললো। যাঁর অকাল মৃত্যু কবিকে জীবন্মৃত করে রেখেছে—কবি হাফিজের সেই প্রিয়তমা শাখ-ই-নবাতের সমাধি। করুণ সুরের সাথে একাত্ম হয়ে প্রিয়তমার বিচ্ছেদ-কাতর ভগ্নপ্রাণ কবি হাফিজ প্রবেশ করলেন ধীরে ধীরে—হাতে তাঁর পুষ্পস্তবক। বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাসে তাঁর প্রিয়তমার সমাধি

বুঝি কেঁপে উঠলো। তিনি উপবেশন করলেন। বিরহী কবির মনের কান্না ছড়িয়ে পড়লো আকাশে বাতাসে। ক্রমে কবির মুদিত চক্ষুর অন্তর্দৃষ্টিতে আকাশ আর পৃথিবী, প্রিয়া আর সমাধি এক অদ্ভুত স্বপ্নের রূপ নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। কবি তাঁর প্রিয়ার জন্য মোনাজাত শেষে ধ্যান মগ্ন হলেন।

এমনি সময় হাল্কা পাখায় ভর দিয়ে নেমে এলো বেহেস্তের হুরীরা। সমাধির আবরণ সরিয়ে তারা জাগিয়ে তুললো কবির হারানো প্রিয়াকে। আনন্দে কবির মন উদ্বেল হয়ে উঠলো। তিনি যেন প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারলেন না তাঁর হারানো প্রিয়া শাখ-ই-নবাতই সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত কবির অন্তরে অন্তরে সুখের সুর ঝংকৃত হয়ে উঠলো, সেকি অসীম আনন্দ! সেই আনন্দ রূপায়ণের অভিব্যক্তিকে লেখনীতে প্রকাশ করা যায় না। আবেগবিহ্বল কবির মন বললো: তোমাকে হারিয়ে লেখনী আমার স্তব্ধ হয়ে গেছে, ওগো তুমিই যে আমার প্রেরণা—আমায় লেখনীর প্রাণ। ওগো আমার প্রিয়া, আমার চোখের সম্মুখ হতে তুমি আর কোথাও যেও না। কবির অনুভবের সমুদ্রে অবগাহিত কণ্ঠে, কবিপ্রিয়ার কণ্ঠের কথা বৃষ্টির পাপড়ির মতো ঝড়ে পড়লো: ওগো, আমার প্রেম যদি সত্য হয়, তা হলে তোমার লেখনী আবার প্রাণ ফিরে পাবে। আমি যেখানেই থাকি না কেনো, আমার প্রেম চিরদিন তোমাকে ঘিরে রাখবে প্রিয়তম! তোমার চোখের আড়াল হয়ে আমি যে তোমার অন্তরবাসী হয়ে রয়েছি কবি!

কবি শুধালো: সত্যি?

প্রিয়া বললো: সত্যি।

……রাত্রিশেষের হালকা আলোয় স্বপ্নের মায়া মিলিয়ে গেলো। বিচ্ছেদ বেদনায় কবির হৃদয় আবার কেঁদে উঠলো। কিন্তু স্বপ্নের স্মৃতি কবিকে যেন জাগিয়ে তুললো—কল্পমিলনের মধুময় স্পর্শে কবির চিত্তলোক নীরব প্রেরণার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। আর কবির স্তিমিত লেখনী আবার ফিরে পেলো প্রাণ।

এই-ই হলো 'কবি হাফিজের স্বপ্ন'। এ-ই হলো বুলবুলের রচিত অমর নৃত্যনাট্য। নৃত্যের শ্রেণী নির্ণয়ে একে 'ক্লাসিক' ছাড়া আর কোনো নামেই আখ্যায়িত করা যায় না।

এই রচনার পেছনে যে প্রেরণা লুকিয়ে রয়েছে, তা চিরন্তন ও মৌলিক। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই এই উপলব্ধির জন্ম। বিভিন্ন যুগের, বিভিন্ন কালের ও বিভিন্ন দেশের অনেক মহাকবিই এই উপলব্ধির জন্য অমরত্ব লাভ করেছেন। এই নৃত্যাভিনয় যেমন সাবলীল, এর আবেদনও তেমনি সর্বজনীন। মানুষের বুদ্ধির উন্মেষ থেকে আজ পর্যন্ত এই আবেদন অনুভবের তারে তারে ঝঙ্কার তুলেছে, অনুভূতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে, সেই ঝঙ্কারের অনুরণন জাগিয়েছে, আর আবেগের সমুদ্র উদ্বেল হয়ে উঠেছে। গুণগতভাবে, এই আবেদন হলো যুগাতীত ও চিরস্থায়ী। এর মৌলিকত্ব কোনো বিশেষ সময়ের ওপর নির্ভরশীল নয়। একদিকে বাঙলাদেশ, পাক-ভারত, অন্যদিকে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ইত্যাদি ইউরোপীয় দেশের সমাজ ব্যবস্থার বিরাট পার্থক্য সত্ত্বেও বাঙালী অবাঙালী এবং ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীরা সকলে, যে যার অনুভব নিয়ে 'হাফিজের স্বপ্ন' দেখেছেন—তার সহজ প্রকাশভঙ্গি ও অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যে অপূর্ব আনন্দ লাভ করেছেন। আর পরিতৃপ্ত মনে করতালির মাধ্যমে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

Chunati.com
Pioneer in village based website

'উন্মেষ', 'জীবন-মৃত্যু', 'আনারকলি', 'মালকোষ', 'পান্থশালায়' ইত্যাদি নাচগুলো ওই একই পর্যায়ভুক্ত বলে সেগুলোর আবেদনও সর্বজনীন। মানুষের জীবনের বিশেষ আবেদনের চিরন্তন বৈশিষ্ট্যই হলো এই শ্রেণীর, এই ধরনের রচনার মূল উপজীব্য। সেই চিরন্তন বৈশিষ্ট্যে, এই সব রচনা অমর হয়ে থাকবে এবং যুগযুগান্তকাল ধরে মানুষের মনে আবেদন জাগাবে, আনন্দ শিহরণ তুলবে। এ হলো শিল্পী বুলবুলের একটি রূপ।

'জেলে' 'নবান্ন' শ্রেণীর নাচের বিষয়বস্তুর মূল্য বিচার করতে বসলে আমরা বুলবুলের অন্য একটি রূপ দেখতে পাই। মানুষের সমস্যা পীড়িত জীবনে, জেলে' ও 'ফসল উৎসব' নাচের নির্মল উল্লাসের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্বকে বুলবুলের সচেতন দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি। তাই সাধারণ মানুষের পরিচিত, অতিসাধারণ বিষয় বুলবুলের নৃত্যরূপায়ণে এমন সার্থক হয়েছে। তেমনি 'সাপুড়ে' 'ভবঘুরের দল' ইত্যাদি নাচগুলোতে মানুষের জীবনের দৈনন্দিন সমস্যা দেখানো হয়েছে! নৃত্য রচনা ও নৃত্যপরিচালনা উভয় ক্ষেত্রেই

বুলবুল সব সময় নিজের মত ও নীতি অনুসরণ করে গেছেন। আর সে জন্য যে-কোনো রচনার ব্যাপারেই বুলবুল অত্যন্ত সচেতন ও যত্নবান ছিলেন। বুলবুলের নৃত্যাভিনয়ের কাহিনী বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করতে গেলে দেখা যাবে—রচনাগুলো এতই জোরালো যে, তুলনা করার মতো অন্য কিছু খুঁজে বের করা মুশকিল। সেই যে ১৯৩৬ সালে এক বিদেশী শিল্পীর কাছে, বুলবুল আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলেছিলেন : 'আমার দেশের সুপ্ত আত্মা আর দেশের মানুষের প্রাণকে জাগিয়ে তোলার মহান দায়িত্ব পালনের জন্য দেশেই আমাকে যেতে হবে।' দেশপ্রেমিক বুলবুল সেই মহান দায়িত্ব পালনের কথা কখনো বিস্মৃত হননি। তাই নিজের শিল্পসৃষ্টির মধ্যে কি করে সেই দায়িত্ব পালন করা যায়, সেই ব্যাপারে তিনি সব সময় ছিলেন সচেতন ও যত্নবান।

Chunati.com
Pioneer in village based website

দুই

বুলবুল ছিলেন সত্যিকার শান্তিবাদী। দেহ ও মনের প্রতিটি অণুপরমাণু দিয়ে তিনি শান্তি কামনা করতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। দেখেছেন কি ভাবে মানুষের সোনার সংসার, শান্তির নীড় বিধ্বস্ত হয়েছে। দেখেছেন যুদ্ধের অভিশাপে কি ভাবে মানুষ রাস্তায় ঘাটে মুখ থুবড়ে পড়ে ধুকে ধুকে মরেছে। দেখেছেন কি ভাবে আরাকান রোড্ ধরে ভীত, সন্ত্রস্ত, উদ্বাস্তু মানবতার মিছিল চলেছে অবিরাম। মা কি ভাবে নিজের শিশুকে ঘুমন্ত অবস্থায় ফেলে রেখে চলে গেছে। কি ভাবে রাতের অন্ধকারে শিয়াল এসে অর্ধমৃত মানুষ টেনে নিয়ে গেছে। কি ভাবে অর্ধমৃত মানুষের মাংস, ঠুকরে ঠুকরে খেয়েছে শকুন গৃধিনীর দল। তিনি শুনেছেন সন্তানহারা মায়ের বুকফাটা আর্তনাদ আর স্বামীহারা স্ত্রী ও পরিবার পরিজনহারা মানুষের মর্মভেদী কান্না। দেখেছেন গরীবের ওপর বড়লোকের বেপরোয়া অত্যাচার, মা-বোনের ইজ্জত নিয়ে ধনীক গোষ্ঠী ও তাদের দালালদের ছিনিমিনি খেলা। একদিকে অপাংক্তেয় সৃষ্টি, অন্যদিকে নির্বিচার

ধ্বংস। একদিকে অভাব, অনশন, অন্যদিকে প্রাচুর্যের বন্যা। একদিকে কান্না অন্যদিকে উন্মত্ত অট্টহাসি। একদিকে 'মৃত্যু' অন্যদিকে 'জীবন'। সর্বোপরি একদিকে সভ্যতার অভিশাপ, আর অন্যদিকে ক্ষমতামত্ত মানুষের হাতে সভ্যতার চরম লাঞ্ছনা। বুলবুল এসবই দেখেছেন দিনের পর দিন—আর সেই অভিজ্ঞতার বেদনায় কেঁদেছেন।

বুলবুল সেই অনুভবের কান্নাকে অবিস্মরণীয় করে রেখেছেন নৃত্যনাট্য 'মন্বন্তরে'। শুধু অবিস্মরণীয় করে রাখা নয়—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিশাপ বয়ে ১৩৫০ সালে সারা বাঙলাদেশ জুড়ে যে সর্বগ্রাসী ভয়ঙ্করী মহামন্বন্তরের প্রাদুর্ভাব হয়েছিলো—তারই প্রতি সমস্ত সভ্যজগৎকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে জানিয়েছে চরম হুশিয়ারী। শিল্পীর যুগচেতনার প্রতিনিধিত্বমূলক এই নৃত্যনাট্য হচ্ছে—'মন্বন্তর' বা 'পাছে আমরা ভুলে না যাই'।

মঞ্চের পর্দা সরে যেতে দেখা গেলো—বাঙলার সুখী শান্ত একটি গ্রামের দৃশ্য। অপরূপ সে দৃশ্য। প্রাণ মাতানো বাঁশীর সুরে সুরে গ্রামের কৃষাণ-কৃষাণী, ছেলে-বুড়ো মুখর হয়ে উঠেছে—আসন্ন ফসল উৎ-সবের আয়োজনে। সোনালী ধানের শিষে দোলা লাগার মতো খুশীর ঢেউ লেগেছে তাদের মনে। সারা বছরের মেহেনত শেষে মরাইতে ধান উঠবে তাদের। নতুন ধানের পায়েসান্ন, শিরনী রেঁধে ফসল-উৎসব উদ্‌যাপন করবে তারা—চারিদিকে শান্ত সুখী মানুষের গুঞ্জন আর প্রাণ প্রাচুর্যের সে কি অপূর্ব সমারোহ।

Chunati.com
Pioneer in village based website

তাদের সেই কলগুঞ্জনের মাঝখানে হঠাৎ বেজে উঠলো যুদ্ধের দামামা। নবান্ন উৎসবের আনন্দ কোলাহল মুহূর্তেই স্তব্ধ হয়ে গেলো। আশঙ্কা আর ত্রাস এসে গ্রাস করে নিলো এতগুলো সরল নির্মল ও নির্বোধ প্রাণ। দেখতে দেখতে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়লো সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষের তাণ্ডবনৃত্য। মানুষের জীবনের শৃঙ্খলা, শান্তি, আনন্দ সব কিছু মুছে গেলো। এই আকস্মিক আঘাতে চাষীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো—জীবন তাদের বিচ্ছিন্ন ও বিধ্বস্ত হয়ে গেলো।

তারপর আর অন্ধকার মঞ্চে প্রবেশ করলো ঘুষখোর আমলা, লোভী মহাজন ও ঠিকাদার আর তাদের মধ্যেকার সেতু সমাজের কলঙ্ক দালাল।

সহজেই এই তিন দুষ্টচক্রের মিতালী গড়ে উঠলো। নিজেদের মধ্যে চক্রান্ত করে তারা শিকারের ফাঁদ পাতলো। চড়া দামের প্রলোভনে সরল চাষীদের সারা বছরের খোরাকির ধান ওরা কিনে নিলো! রাতের অন্ধকারে মজুতদারের গুপ্ত আড়তে বস্তাবন্দী ধান-চালের পাহাড় জমে উঠলো। ক্রমে ক্রমে দুর্ভিক্ষ ও মড়কের প্রেতনৃত্যের তালে তালে শ্মশানের বীভৎসতা ছড়িয়ে পড়লো সোনার বাঙলার গ্রামে গ্রামে। বিংশ শতাব্দীর চরম সভ্যতাকে বিদ্রূপ করে শহরের শান বাঁধানো সড়কে মুখ থুবড়ে পড়ে রইলো দুঃস্থ ও নিরন্নের দল। রক্তচোষা টাকার কুমীরদের মুখে লোভ ও লালসার পৈশাচিক হাসি ফুটে উঠলো। একদিকে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ও অন্যদিকে মা-বোনের সম্ভ্রম নিয়ে উন্মত্ত বিলাসে মেতে উঠলো তারা।

ধ্বংস এলো, কান্না এলো, অভাব এলো—হা অন্ন রবে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠলো। 'ডাস্টবিনের' উচ্ছিষ্টের আশায় মানুষ কুকুরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করলো। কিন্তু এভাবে কদিন চলে? এ পথ তো মানুষের বাঁচার পথ নয়। বাঁচতে হলে রুখে দাঁড়াতে হবে—সমাজের তথাকথিত মান্যবরেণ্যদের বিরুদ্ধে—যে সব পাপিষ্ঠরা সৃষ্টি করেছে এই দুর্ভিক্ষ।

Chunati.com Pioneer in village based website

মুহূর্তের নবচেতনার যাদুস্পর্শে যেন চাষীর মনের হতাশা ঘুচে গেলো—ঘা' খাওয়া খেপা কুকুরের মতো ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিজ্ঞা করলো তারা: যদি মরতেই হয় তো কাপুরুষের মতো মরবো না। এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে মরবো, বীরের মতো সংগ্রাম করে মরবো, বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়েই মরবো।

মন্বন্তরে প্রাণ দিলো যে দধীচিরা—সেই অর্ধ কোটি চাষী মজুরের প্রাণহীন অস্থিতে যেন বজ্রাগ্নি জ্বলে উঠলো। কংকালের শোভাযাত্রায় মদমত্ত অসুরের মনে ত্রাসের সঞ্চার হলো।

আর সেই বজ্রাগ্নির দীপ্তি বুকে নিয়ে রুখে দাঁড়ালো একজন চাষী—এক হয়েও সে বহু, ব্যক্তি হয়েও সে সমষ্টির প্রতীক। নিঃসঙ্গ হয়েও সে বাংলাদেশ চাষী মজুরের প্রতিনিধি।

দুই চোখ তার ঠিকরে বেরোল আগুনের স্ফুলিঙ্গ। সেই আগুনে সব কিছু যেন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে ফেলবে সে। বিক্ষোভ, বিদ্রোহ,

বিপ্লব! চারিদিকে ছড়িয়ে দিলো সে বিদ্রোহের বজ্রাগ্নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ভুখা জরাজীর্ণ চাষী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো—তার মুমূর্ষ চেতনা ফরিয়াদ করে বললো : প্রভু, কোথায় তোমার বজ্রদণ্ড ?

কিন্তু তাতে ক্ষতি কি? সে তো তার কর্তব্য করে গেছে। নিজের প্রাণের বিনিময়ে সে তো লক্ষ কোটি দেশবাসীর দৃষ্টিকে সজাগ করে দিয়ে গেছে। তাই তার মৃত্যু এই সংগ্রামের সমাপ্তি নয়—তার সুচনা মাত্র।

এ-ই হলো বুলবুলের 'মন্বন্তর' বা 'পাছে আমরা ভুলে না যাই'। এ-ই হলো অত্যাচার, অবিচার, অনাচার তথা যুদ্ধের বিরুদ্ধে বুলবুলের নিঃসঙ্গ ও বলিষ্ঠ কণ্ঠের ঘোষণা।

বুলবুলের এই নৃত্যনাট্যটির প্রসঙ্গে কোলকাতা থেকে প্রকাশিত 'সুভেনিররে' লেখা হয়েছে—"দুর্ভিক্ষ, কালোবাজার এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষণের পটভূমিকায় বুলবুলের 'মন্বন্তর' বা 'পাছে আমরা ভুলে না যাই' এক অবিস্মরণীয় আগ্নেয় প্রতিবাদ"।

Chunati.com Pioneer in village based website

অবচেতন মনে আঘাত করে করে জীবনের বিভিন্ন সমস্যা এবং তার সমাধান সম্পর্কে সাধারণ দর্শকের মনে প্রশ্ন জাগাবার জন্য নৃত্যশিল্পের মধ্যে বুলবুল যে 'টেকনিক' বা 'কৌশল' আবিষ্কার করে গেছেন, তা সমালোচকের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে। এসব নাচের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করতে বসলে মনে প্রশ্ন জাগে—বুলবুলের মনে কি করে এই সমাজ চেতনার উন্মেষ ঘটলো? আমাদের দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতার মধ্যেও যে অনুভূতি নেই, যে চেতনার অভাব—সেই আশ্চর্য চেতনা বুলবুল পেলেন কেমন করে!

তিন

কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত না করে, অথবা কোনো বিশেষ মতবাদ সমর্থকদের তালিকায় বুলবুলের নাম না তুলেও বলা চলে যে—তিনি ছিলেন প্রথমতঃ সম্পূর্ণ ঐক্যপন্থী, দ্বিতীয়তঃ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী

এবং তৃতীয়তঃ শান্তিবাদী। খোলাখুলি ভাবে তিনি নিজের এই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত করতে কখনো ইতস্তত: করেননি। নিজের গণ্ডীর ভেতর থেকে, নিজস্ব ধারায় তিনি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে সাহায্য করেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চরিত্রকে বুলবুল অপরিহার্য বলে মনে করতেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মুঠোর বাইরে আসতে না পারলে, আমাদের দেশীয় বা জাতীয়, শিল্প ও সংস্কৃতির সুষ্ঠু বিকাশ ঘটতে পারে না। অন্যান্য প্রশ্ন বাদ দিলেও শুধুমাত্র সংস্কৃতির স্বার্থে, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার প্রয়োজন রয়েছে—একথা বুলবুল একান্ত ভাবেই বিশ্বাস করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন—বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের মানুষকে সচেতন করে তোলা শিল্পীদেরই দায়িত্ব,—কি শিল্পে, কি সাহিত্যে। বুলবুল এই উপলব্ধিজাত দায়িত্ব পালনে ব্রতী হয়েছিলেন ও তাতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। ১৯৪৫ সালে 'ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের' পক্ষ থেকে বুলবুল 'এই আমার দেশ' নামে একটি নৃত্যানুষ্ঠান পরিচালনা করেন। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে নৃত্যনাট্যটি। অনবদ্য হয়েছিলো সন্দেহ নেই। তার চেয়েও বড় কথা হলো, দেশের সেই যুগসন্ধিক্ষণে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বুলবুলের সে ছিলো এক নির্ভীক প্রতিবাদ।

দেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে স্বভাবতই বুলবুলের আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা ছিলো অসীম। ১৯৪৬ সালের ১১ই মার্চ স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বুলবুল কোলকাতা থেকে বাবার কাছে একখানা পত্র লেখেন :

'- - - - - দেশের মহা দুর্দিন। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি আজ পরস্পরের মধ্যে আত্মঘাতী সংগ্রামে লিপ্ত। সেই সুযোগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী রাক্ষস দেশবাসীর বুকে রক্তাক্ত নখর গাড়িয়া বসিয়াছে। কলিকাতা, বোম্বাই, করাচী, মাদ্রাজ সর্বত্রই চূড়ান্ত দমননীতি অনুসৃত হইতেছে। শহীদদের তাজা খুনে বন্দিনী ভারতীর বুক লাল হইয়া গেলো - - - - -

'- - - - - কংগ্রেসের এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদেরই জয় হইল। আই, এন, এর বিচার বন্ধ হইলো না - - - - -

'- - - - - দেশের তো এই অবস্থা। তাহার উপর শৃঙ্খলের নেয়ামত

আসিতেছে একটার পর একটা—লক্ষ লক্ষ লোকের চাকুরী যাইতেছে। আর এক অতি ভয়াবহ অবস্থার আবির্ভাব হইতেছে। সত্যিকার দেশদরদীর মনে আজ প্রশ্ন জাগিয়াছে : যুগ-সঞ্চিত অপবুদ্ধির কবে অবসান ঘটিবে? কবে আসিবে সুদিন—আত্মঘাতী-ভ্রাতৃ-বিদ্বেষের বীভৎস বিষে আশার উদয়াচল কি চিরদিনই কালো হইয়া থাকিবে? শৃঙ্খল মোচন আর কতদূর?'

নিজের প্রতিষ্ঠার খাতিরেই হোক, অথবা দেশ-প্রেমের তাগিদেই হোক, কংগ্রেস যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে জনসাধারণের সত্যিকার হাতিয়ার রূপে এবং তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হিসেবে খাড়া ছিলো, তখন কংগ্রেস ছিলো ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব গড়ে তুলবার ও দেশকে স্বাধীন করবার প্রতিশ্রুতিবান প্রতিষ্ঠান। আত্মচেতনার মুহূর্তে, তরুণ বুলবুল সেই কংগ্রেসকেও ভালোবেসেছিলেন। পরে কংগ্রেস যখন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের রূপ পরিগ্রহ করে, তখন কংগ্রেসের প্রতি বুলবুলের শ্রদ্ধাও আর অটুট রইলো না। বুলবুলের এই মত পরিবর্তনের বহু আগেই দেশপ্রেমিক নেতারা কংগ্রেসের সদস্যপদে ইস্তফা দিয়ে চলে আসেন।

সাম্প্রদায়িকতাকে বুলবুল ঘৃণা করতেন একান্ত ভাবেই। ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়—বিদীর্ণ-হৃদয় বুলবুল আকুল কণ্ঠে বাবাকে নিজের মনের কথাই যেন জিজ্ঞাসা করেছিলেন :

'এই যুগ-সঞ্চিত অপবুদ্ধির কবে অবসান ঘটিবে? কবে সুদিন আসিবে? আত্মঘাতী ভ্রাতৃবিদ্বেষের বীভৎস বিষে আশার উদয়াচল কি চিরদিনই কালো হইয়া থাকিবে? শৃঙ্খল মোচনের আর কতদূর? - - - - -'

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীভৎসতা আর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগসন্ধিক্ষণের নিশ্বাসরুদ্ধ করা চরম উৎকণ্ঠায় বুলবুলের মনে তিল পরিমাণ শান্তি ছিলো না। এমনি সময় দু'শ বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন ঘটলো। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে দেশ স্বাধীন হলো। যে দেশের পিতা পুত্রকে ডেকে বলে : 'ওইখানে তোর দাদীর কবর ডালিম গাছের তলে, তিরিশ বছর ভিজিয়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে - - - - -'। এই দেশকে বুলবুল প্রাণের মতোই ভালোবাসতেন। ছোট বেলার 'স্বপ্নের দেশ' চুনতি তথা 'বীর বরেণ্যদের'

Chunati.com Pioneer in village based website

পুরাকীর্তি সমৃদ্ধ চট্টগ্রাম যেমন, তেমনি কোলকাতা তৎকালীন পূর্ববঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়নি বলে বুলবুল দুঃখ করতেন।

সেই থেকে স্বাধীনদেশের শিল্পী হিসেবে নিজেদের সংস্কৃতিকে বিদেশে পরিচিত করার স্বপ্ন বাসা বাঁধলো তাঁর মনে। আর বুলবুলই সর্বপ্রথম নিজের দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে নিজের কাঁধে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন—প্রতীচ্যের দুয়ারে দুয়ারে। এই মহান শিল্পী শিল্পের ক্ষেত্রে যে ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন দেশ তার জন্য চিরদিন গর্ব বোধ করবে।

দেশ-প্রেমের ভিত্তিতেই তাঁর রাজনৈতিকতা গড়ে ওঠে। পেশাগত বা পেশাদারী রাজনীতিবিদ না হয়েও দেশকে যে ভালোবাসা যায়, বুলবুল তা প্রমাণ করেছেন। প্রমাণ করেছেন শিল্পে, সাহিত্যে তথা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসার দরুণ তিনি সম্মানিত পদমর্যাদার লোভ জয় করেছেন।

দেশ ভাগ হওয়ার পর একজন সমাজ সচেতন জনদরদী ব্যক্তিত্ব হিসেবে বুলবুল বলতেন : আমাদের এই দেশটিকে বাঁচাতে হলে—অর্থাৎ গরীব জন-সাধারণের ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা করতে না পারলে এই স্বাধীনতা টিকবে না। আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দকেই কৃষিকর্মের উন্নতি ও গরীব কৃষককুলের অভাব অভিযোগের প্রতি আন্তরিক হতে হবে। বিশেষ করে তিনি দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে ধানের জমি বণ্টন ও জোতদারদের দ্রোণ দ্রোণ ধানের জমি, সমবায় কৃষি পদ্ধতির আওতায় আনার ওপর বিশেষ ভাবে জোর দিতেন। পাকিস্তানের কর্তারা বাঙালীদের অবিমৃষ্যকারিতা, পরশ্রীকাতরতা ও কর্ম-বিমুখের সুযোগে—ছলে, কৌশলে তাদের দাবিয়ে রাখবার যে অপচেষ্টা করবে. সে রকম একটা ধারণা হয়তো তাঁর মনে ছিলো—হয়তো তাই তিনি পূর্ব বাংলাকে স্বনির্ভর করবার জন্য সর্বপ্রথম কৃষিকর্মের কথাই বলেছিলেন।

দীর্ঘ উনত্রিশ বছর পূর্বে বুলবুল বাংলাদেশের জনসাধারণের জন্য যে চিন্তা করেছিলেন—আজ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জনদরদী নেতৃবৃন্দের কণ্ঠে সেই কথারই তো প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। তাঁর জাগ্রত চেতনা আর আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি—সারা বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ ও শান্তি এবং ধ্বংস সৃষ্টির যে বিরাট সংঘাত চলছিলো, তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলো গভীরভাবে।

Chunati.com Pioneer in village based website

১৯৫৩ সালে করাচীর হোটেল মেট্রোপোলে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি যে ভাষণ দেন, শান্তিকামী ও সংস্কৃতিবান মানুষের জন্য তা এক অবিস্মরণীয় দলিল হয়ে থাকবে। বুলবুল বলেছিলেন:

'শান্তিপূর্ণ অবস্থিতি হলো সংস্কৃতির আত্ম-বিকাশের মৌলিক ভিত্তি। আর যুদ্ধ হলো সংস্কৃতির শত্রু। যুদ্ধ নিজের বীভৎসতার অন্ধকারে সংস্কৃতিকে বন্দী করে রেখে, তারপর সেই বন্দী আত্মাকে ছুঁড়ে দেয় বর্বরতার অতল গভীরে--যেখানে মানবতার মূল্যবোধ তার স্বকীয় অর্থ হারিয়ে ফেলে এবং বিবদমান যুদ্ধ-উন্মাদদের শক্ত বুটের তলায় নিষ্পিষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে সে মৃত্যু বরণ করতে বাধ্য হয়। সারা বিশ্বব্যাপী আজ যুদ্ধ ও শান্তি, ধ্বংস ও সৃষ্টির যে বিরাট সংঘাত চলছে, তাকে অবহেলা করে আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলন নির্বিকার হয়ে বসে থাকতে পারে না। পাকিস্তানী সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে, পরস্পরের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে যুদ্ধের হিংস্রতার বিরুদ্ধে এবং শান্তির স্বপক্ষে জোর আওয়াজ তোলা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই ···

'আমাদের যুগের প্রগতিশীল ব্যক্তিরা সাধারণভাবে মেনে নিয়েছেন যে—'শিল্পের খাতিরেই শিল্প নয়' বরং 'জনগণের প্রয়োজনের জন্যই শিল্প'। সত্যিকার শিল্পে শুধু চিন্তাশীল ব্যক্তিদের চিন্তার প্রকাশই থাকবে না, সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবন, তাদের দুঃখ-কষ্ট, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সাফল্য ও ব্যর্থতার প্রতিফলনও তাতে থাকবে। সামগ্রিকভাবে সত্যিকার শিল্প হবে—দেশীয় প্রতিভারই প্রতীক ও প্রতিমূর্তি······

'শিল্প, সঙ্গীত, সাহিত্য প্রভৃতির মাধ্যমে সংস্কৃতি নিজেকে বিকশিত করে। সংস্কৃতি হলো এমন একটি মুকুর—যার মধ্যে জাতি তার আত্মার প্রতিফলন দেখতে পায়। যৌথ জাতীয় জীবন ও সৌন্দর্যবোধ থেকেই সকল দেশের সংস্কৃতির জন্ম। মানুষের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত জীবনযাত্রা থেকেই সংস্কৃতির উদ্ভব। সুতরাং কোনো একটি জাতির ওপর কোনো বিশেষ সংস্কৃতিকে বাইরে থেকে বা ওপর থেকে বলপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া যায় না।

'সংস্কৃতি হলো একটা 'সিম্ফনী' যার মধ্যে দেশের মানুষের জীবন বিলীন হয়ে যায় এবং যার কাছে মানুষ জীবনকে ভালোবাসার শিক্ষা ও প্রেরণা পায়।

Chunati.com Pioneer in village based website

এই জন্য কোনো জাতির জীবন যখন আশা ও আনন্দের স্পন্দনে স্পন্দিত হয় না—তখনই তার সংস্কৃতির ক্ষয় শুরু হয়।

'শিল্প ও সংস্কৃতির এই সাধারণ 'থিওরী'র ভিত্তিতে সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানের জাতীয় সংস্কৃতির রূপ ও চরিত্র বিচার করা যেতে পারে। এই প্রশ্নের মীমাংসা অপরিহার্য—কারণ এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব খুঁজে না পেলে আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলন নিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো না···

'ইসলামের অমর ঐতিহ্য নিঃসন্দেহে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু আমাদের কোনো কোনো বন্ধু এই মত পোষণ করেন যে—ইসলামী ঐতিহ্যই হলো এর প্রধানতম ও একমাত্র রূপ নির্ধারক উপাদান। তাই যদি সত্যি হতো তা হলে—আরবী, ইরাণী, মিসরীয় ও তুর্কী সংস্কৃতির স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কোনো ব্যাখ্যাই থাকতো না। ইসলামী ঐতিহ্য-পুষ্ট হলে এসব দেশের ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি একটিমাত্র জাতীয় সংস্কৃতিতে বিলীন হয়ে যেতো। কিন্তু তারা একীভূত হয়ে যায়নি। তা থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে—ইসলামী ঐতিহ্য আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হওয়া সত্ত্বেও এর প্রধানতম বা একমাত্র উপাদান নয়।

'বরং একথাই সত্য যে, পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশে বসবাসকারী বাঙালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, পাঠান, বেলুচী প্রভৃতি জাতির নিজস্ব ও স্বতন্ত্র ঐতিহ্য, ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব রয়েছে এবং তাদের প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্যই হলো এই স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কারণ······

'এখন আমাদের প্রধান সমস্যা হলো—সেই বিশিষ্ট সূত্রের আবিষ্কার করা যা একটি সাধারণ নিখিল পাকিস্তান সংস্কৃতির বন্ধনে এসব বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আবদ্ধ করে রেখেছে ও ভবিষ্যতে রাখবে।

'আমার মতে—আমাদের এই মহান দেশ পাকিস্তানকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধশীল দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে দেশবাসীর সাধারণ সংগ্রামই হচ্ছে সেই বিশেষ সূত্র······

'এখানে আমি একটি কথা বলতে চাই যে—সত্যিকার ও মহৎ সংস্কৃতির মধ্যে কোনোদিনই সংঘাত লাগে না। উচ্চ আদর্শবাদ থেকে যখন বিভিন্ন

Chunati.com Pioneer in village based website

সংস্কৃতির পতন ঘটে, একমাত্র তখনই তাদের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ দেখা দেয়……

'এই সত্যের ভিত্তিতে আমরা এই নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারি যে—নিখিল পাকিস্তান জাতীয় সংস্কৃতির উন্নয়ন ও বিকাশের খাতিরে আমাদের বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্কৃতির বিলোপ সাধনের কোনো প্রয়োজন নেই বরং তার জন্য সে সবের সমৃদ্ধিরই প্রয়োজন রয়েছে অত্যধিক……

'এই প্রসঙ্গে অপরিহার্য ভাবেই বাংলা বনাম উর্দুর প্রশ্ন এসে পড়ে। যদি আমরা বাঙালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধি প্রভৃতি সংস্কৃতি ধারার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকে একটি নিখিল পাকিস্তান জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশের মৌলিক ভিত্তি বলে স্বীকার করে নিই, তাহলে একথাও আমাদের মানতে হবে যে—যা কিছু আমাদের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করবে, তা আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির উন্নয়নকেও প্রত্যক্ষ ভাবে বাধা দেবে, কারণ—এসব ভাষাই হলো আমাদের জনগণের ভিন্ন ভিন্ন শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রকাশের প্রধানতম মাধ্যম। যদি বাঙলা ভাষার কণ্ঠরোধ করা হয়, তাহলে তাতে করে বাঙালী সংস্কৃতির উন্নয়নকেও রোধ করা হবে, এর সোজাসুজি অর্থ এই হবে যে—পাকিস্তানের জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশের প্রতি 'পূর্ব বাঙলার' অবদান ন্যূনতম পরিমাণে এসে দাঁড়াবে……

'তা'ছাড়া একটি জাতির নিজস্ব ভাষার কণ্ঠরোধ করে তাদের ওপর যদি অন্য একটি ভাষা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয় তা'হলে তিক্ততা, প্রতিরোধ ও বিদ্রোহের সৃষ্টি হবে, ফলে রাষ্ট্রের ঐক্য বিপন্ন হয়ে পড়বে…

'একজন সাধারণ বাঙালী শিল্পী হিসেবে, আমাদের অন্যান্য পাকিস্তানী ভাইদের সামনে আজ আমি পরিষ্কার ভাবে একথা ঘোষণা করতে চাই যে—পাকিস্তানের মধ্যে আমরা বাঙালীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানের অন্যান্য অংশের অধিবাসীদের ওপর জোর করে আমাদের ভাষা চাপিয়ে দিতে আমরা চাই না। তেমন কোনো ইচ্ছা আমাদের আদৌও নেই…

'এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে—আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ভাবে অনেক উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছি।

Chunati.com

উদাহরণ স্বরূপ আল্লামা ইকবাল ও কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টকাব্য, প্রতিভাবান জয়নুল আবেদীন ও প্রবীণ শিল্পী চুঘতাই'র আঁকা শক্তিশালী চিত্র এবং বাঙলার প্রাণ মাতানো ভাটিয়ালী গান ও পশ্চিম পাকিস্তানের ছন্দ-প্রাণ সমৃদ্ধ লুড্ডি ও খট্টক নৃত্য ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য সত্ত্বেও আমরা এখনও বিশ্ব সংস্কৃতির আসরে উপযুক্ত আসন লাভে সমর্থ হইনি…

'এই প্রসঙ্গে আমার নিজস্ব প্রচেষ্টার উল্লেখ করাটা আশা করি আত্মম্ভরিতা বলে বিবেচিত হবে না। আমার সীমাবদ্ধ শক্তিতে ও নিজস্ব ধারায় এ ব্যাপারে আমি একটি দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। আমার নৃত্যনাট্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে পাকিস্তানী সংস্কৃতির মূল ধারাটা উপস্থাপনের চেষ্টায় আমি আমার যথা সর্বস্ব নিয়োগ করেছি। কিন্তু তবুও এ ব্যাপারে আমি তেমন এগিয়ে যেতে পারিনি। কারণ, এ কাজে আমাদের সরকার, আমার সঙ্গে এতটুকুও সহযোগিতা করেননি কিংবা আমার প্রচেষ্টার প্রতি কোনো রকম সাহায্যও করেননি। এ কথা অনস্বীকার্য যে, আজকের দিনে রাষ্ট্র ও সরকারের প্রত্যক্ষ সাহায্য না পেলে এ ধরনের যে কোনো প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হতে বাধ্য…'

Chunati.com Pioneer in village based website

একদা তরুণ মনের ঐকান্তিক আবেগ ও অনুরাগ দিয়ে বুলবুল ভালোবেসেছিলেন তাঁর 'শিল্প'কে। শুধু ভালোবাসা নয়, একনিষ্ঠ সাধনা দিয়ে সেই 'শিল্প'কে তিনি আরো উন্নততর করে তুলেছিলেন। তারপর তিনি তাঁর সেই শ্রেষ্ঠ সম্পদকে দেশের খাতিরে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরবার সংকল্প করেন, এই সংকল্পের মধ্যেই তো তাঁর অন্তরের দেশ-প্রেমের নিরবচ্ছিন্ন সুরটি ধ্বনিত হয়েছে। সেই মনই সাম্রাজ্যবাদকে ঘৃণা করেছে এবং এই উভয় মনের সমষ্টি হলো সেই বিশেষ অস্তিত্ব, যার মধ্যে 'ঐক্য', 'স্বাধীনতা', 'শান্তি' বিলীন হয়ে গেছে। আর এই ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্বগুলোকে এক সাথে মিলিয়ে দেখলে যে ব্যক্তিত্বটির দেখা পাওয়া যায় তিনি হলেন স্রষ্টা বুলবুল, শিল্পী বুলবুল, কবি বুলবুল, এবং সর্বোপরি মানুষ বুলবুল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এক

১৯৩৬ সনে কোলকাতায় আই. এ. পড়ার সময় বুলবুল মনপ্রাণ ঢেলে একটি মেয়েকে ভালোবেসেছিলেন। শুধুমাত্র ভালোবাসা বললে বুলবুলের সেই ভালোবাসাকে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হবে না। সেই ছেলেবেলায় সাপুড়ের পেছনে ধাওয়া এবং নিজের শিল্পসাধনীর মধ্যে তাঁর যে ঐকান্তিকতা ছিলো, তেমনি একাত্মপ্রাণ হয়েই বুলবুল ভালোবেসেছিলেন মেয়েটিকে। বুলবুলের শিল্পদৃষ্টি মেয়ে নির্বাচনে ভুল করেনি। নিজে রূপবান ছিলেন বলেই হয়তো রূপবিচারে তাঁর নিজস্ব একটা রুচি ছিলো। এই মেয়েটির মধ্যে বুলবুলের সেই রুচিই হয়তো চরিতার্থ হয়েছিলো। তাই লাইলি-মজনুর শতলান্তিক মনের অনুভব নিয়ে বুলবুল আর মেয়েটি প্রথম দেখাতেই পরস্পরকে ভালোবেসেছিলেন। কৈশোরের রাঙা কল্পনা ছড়িয়ে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন যে 'শেফালী'কে সেই শেফালীরই পূর্ণাঙ্গ বাস্তবরূপ যেন দেখতে পেলেন মেয়েটির মধ্যে। তাই তাঁর কৈশোরের 'কল্পলোকের মাধুরিমা'র এই প্রতিমূর্তিটিকে অভিনন্দিত করলেন অন্তর নিংড়ানো ভালোবাসা দিয়ে।

বুলবুলের জন্য সে ছিলো এক নতুন জগৎ, নতুন বিস্ময়। এই অপূর্ব জগতের সন্ধান পেয়ে তিনি যেন আবার নতুন করে ভালোবাসলেন এই পৃথিবীকে। অনুরাগের আলোকে উদ্ভাসিত পৃথিবী তাঁর চোখে যেন নতুন করে সুন্দর হলো, স্নিগ্ধ হলো, মধুর হলো।

মেয়েটি শুধু রূপবতীই ছিলো না—তার গুণের সৌন্দর্যও বুলবুলকে মুগ্ধ করলো। ফলে, দিনে দিনে আরো গভীর ভাবে, আরো স্থায়ী ভাবে বুলবুল আকৃষ্ট হলেন।

তারপর স্বাভাবিক ভাবেই বুলবুলের বিয়ের প্রশ্ন উঠলো। বুলবুলের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনেরাও মেয়েটিকে দেখে এতই প্রীত হন যে, তাঁরা স্বেচ্ছায়

Chunati.com
Pioneer in village based website

কন্যাপক্ষের সঙ্গে বিয়ে সম্বন্ধে যথা-বিধি আলাপ-আলোচনা চালালেন। কন্যাপক্ষও সানন্দে এই বিয়েতে তাঁদের সম্মতি জানালেন।

কিন্তু বাধা এলো বাবা মা'র পক্ষ থেকে। ছেলের অল্প বয়স ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাঁরা এই বিয়েতে বাধা দিলেন। তাঁরা বললেন: বি. এ. পরীক্ষাটা হয়ে গেলে তখন বিয়ের কথা ভাবা যেতে পারে। বাবা কন্যাপক্ষকে একটা প্রস্তাব দিলেন, বুলবুলের বি. এ. পরীক্ষা পর্যন্ত তাঁরা যদি অপেক্ষা করেন তবে মেয়েটিকে বধূ করে ঘরে আনতে তাঁর কোনই আপত্তি নেই। কিন্তু কন্যাপক্ষের সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নানা কারণে অতদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে তাঁরা রাজি হলেন না। সুতরাং সেখানেই বিয়ের কথা ভেঙে গেলো।

এদিকে যথাসময়—১৯৩৭ সালে বুলবুল বি. এ. পাশ করার পর বাবা ছেলের জন্য কনের সন্ধান শুরু করলেন। শেষ পর্যন্ত কনে নির্দেশ করে বুলবুলের সম্মতি চেয়ে চিঠি লেখা হলো। কিন্তু যে মন নিয়ে বুলবুল একটি মেয়েকে ভালোবেসেছিলেন, ইতিমধ্যে সেই [illegible] সরাসরি বাবা মা'র কাছে নিজের মতামত প্রকাশ না করে, সহোদরদেরকেই একখানা চিঠি লিখে তার মতামত জানিয়ে দিলেন। শিল্পী মনের উত্তাল অনুভব সমুদ্রের কণা কণা প্রকাশ, আর সেই সঙ্গে বাবা মা'র প্রতি প্রচ্ছন্ন অভিমান রয়েছে এই চিঠিতে:

'কল্যাণীয়া,

- - - - - - - আমি ভালবেসেছিলাম—এবং একজনকেই। যখন তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম বিধাতা অট্টহাসি হেসেছিলেন—আব্বা মা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন। তারপর একটা যুগ যেন কেটে গেছে—এই অবসরে তাকে আমি ভুলতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভুলতে পারিনি। আমার অজ্ঞাত সমস্ত অবচেতন মনটা জুড়েই যে সে ছিলো এতদিন। এসব যে এত সহজেই সহজ হয় না, তা আজ সম্যক বুঝতে পারছি। মানুষের মনটা বড় অদ্ভুত রকমের, তেমনি জটিল তার বৃত্তিগুলো। এই মনটা মানুষের চৈতন্যকে শুধু ফাঁকি দিয়েই যায়। বিচিত্র এই অবচেতন মন- - - - - - - - - - - - -

Chunati.com

'- - - - - - - - - - যা'ই বল না কেনো, আমি শুধু এই টুকুই বিশ্বাস করে যাবো চিরদিনই যে—যাকে একবার ভালোবাসা যায়, তাকে অকারণেই শুধু ভালোবেসে যেতে হয়। এ ধরনের প্রীতি অহেতুক—তাই এটা প্রেম, মোহ নয়- - - - - - - - -'

দুই

ছেলের অল্পবয়স ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে বাবা মা একদিন যে বিয়ে হতে দেননি—ছেলেমানুষের মোহ, দু'দিন পর সে তা ভুলে যাবে, এই ছিলো তখন তাঁদের ধারণা। কিন্তু সেই 'মোহ' যে এমন গভীর ভাবে বুলবুলের মনে দাগ কাটবে, তা তাঁরা ভাবতে পারেননি। এখন বুলবুলের মনের হদিস পেয়ে তাঁরা ভীত হলেন, চিন্তিত হলেন। সেই সঙ্গে তাঁদের পূর্বকৃত ভুল শোধরাবার জন্য চেষ্টাও করলেন। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হলো না। মেয়েটি যে তার অনেক আগে, অন্য ঘরের কুলবধূ হয়ে চলে গেছে, তা তো তাঁরা জানতেন না।

তবুও তাঁরা সুযোগ মতো চেষ্টার ত্রুটি করেননি, বিয়েতে ছেলের মত পাবার জন্য। কিন্তু বুলবুলকে তাঁরা কিছুতেই রাজী করাতে পারলেন না। তখন বাবা মা, ছেলের বিয়ের ব্যাপারে একরকম হতাশ হয়ে পড়লেন। তারপর মাঝখানে দীর্ঘদিন কেটে গেছে—বাবা মা ছেলের বিবাগী মনের চিন্তায় বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছেন। কিন্তু বুলবুলকে তাঁর মত হতে টলাতে পারেননি।

অবশেষে বুলবুলের এম. এ. এর শেষ বর্ষে খবর পাওয়া গেল—প্রতিভা-মোদক নামে একজন নৃত্যশিল্পীকে বুলবুল বিয়ে করতে চান, বলা বাহুল্য বাবা মা'র অনুমতি পেলে। সেটা ছিলো ১৯৪২ সাল। সমস্ত পরিবারে এ সংবাদ পাওয়ার পর প্রচণ্ড একটা ঝড় উঠেছিলো। মা তীব্রভাবে বিরোধিতা করেছিলেন। আত্মীয় স্বজন কটূক্তি করেছিলেন। বোনরা নাওয়া খাওয়া ছেড়েছিলো—তাদের সাত রাজার ধন ভাইটি এ কি করতে যাচ্ছে! বাবা

একেবারে নির্বাক হয়ে গেলেন! তিনি হাঁ-ও বলতে পারছিলেন না, আবার ব্যাপারটাকে একেবারে উড়িয়েও দিতে পারেননি। তিনি সবচাইতে বেশিকষ্ট পাচ্ছিলেন।

এমনি ভাবে প্রায় বছর গড়িয়ে গেল। ইতিমধ্যে প্রতিভা মোদকের অজস্র গুণাগুণের বর্ণনা দিয়ে বুলবুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবেরা বাবাকে ডজন ডজন চিঠি লিখেছিলেন। সেই অশান্ত দিনগুলোর মধ্যেই বুলবুল প্রাইভেট এম. এ. পরীক্ষা দিয়েছিলেন। এ ধরনের গুরুতর একটা ব্যাপার নিয়ে চুপ করে বসে থাকা যায় না। বাবা একদিন ঘরোয়া একটা বৈঠক করলেন। তিনি বলেছিলেন : টুনুর (বুলবুলের ডাকনাম) যে লাইন ধরছে, সে লাইনে যে মেয়েটি ওকে সাহায্য করতে পারবে এবং টুনুর শিল্পপ্রতিভা ধারণ করবার যোগ্যতা যার মধ্যে আছে, তেমন একটি মেয়েই কি টুনুর জন্য ভালো হবে না? টুনুর বন্ধুরা ঠিকই লিখেছেন। টুনুর শিল্পী জীবনের জন্য এ রকম একটা শিল্পী মেয়ের প্রয়োজন আছে। আমি মনে করি, টুনুর মাও ছেলের ভবিষ্যত চিন্তা করবেন।

চিরজীবনের সংস্কার, আশা-আকাঙ্খা সবকিছু ত্যাগ করে বাবা বিয়েতে মত দিয়েছিলেন, ছেলের সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনের কাছে অন্য সব তুচ্ছ ছিলো বলে। কিন্তু বুলবুল তাঁর বিবাহিত জীবনের দশটি বছর যে ধনে ধনী হয়েছেন—তাকে আর যাই বলা যাক সুখী বলা যাবে না—এসব অনন্য সাধারণ মানুষের জন্য যে রকম উষ্ণ, একান্ত প্রাণপ্রবাহের প্রয়োজন, তেমনি প্রাণের বড়ই অভাব এই কৃত্রিম মূল্যবোধের দুনিয়াতে।

১৯৪৩ সালে কোলকাতাতে বুলবুলের বিয়ে সম্পন্ন হয়। বিয়ের পূর্বে প্রতিভা মোদক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁর ইসলামী নাম হয় আফরোজা বেগম (পরে আফরোজা বুলবুল)।

যদি মনে করা হয়, বুলবুল নিজের খেয়াল খুশিতে এই বিয়ে করেছেন, তবে বুলবুলের মতো একজন অনুগত সন্তানের প্রতি অবিচার করা হবে। অনুজার কাছে লিখিত এক পত্রে বুলবুলের সেই আনুগত্য অতি সুন্দররূপে ফুটে উঠেছে :

'——আমার আব্বা মায়ের কথা? তাঁদের কথা কি লিখবো বোন! এত স্নেহ, এত মমতা কোনো পিতা-মাতার থাকতে পারে, আমি বিশ্বাস করি না।

তাঁদের দুঃখ আমি দেবো না বোন, তাঁদের অমতে এই মেয়েটিকে বিয়ে করে আমি তাঁদের অন্তরে আঘাত দেবো না। মা আব্বাকে তুমি আশ্বাস দিও আমার হয়ে······'।

১৯৪০-৪২ এই দু'টি বছর তিনি সিভিল ডিফেন্স অর্গানাইজেশনের এড্-মিনিস্ট্রেটিভ অফিসার হিসেবে চাকরি করেছিলেন। চাকরিটি সবদিকেই অত্যন্ত লোভনীয় ছিলো। কিন্তু উক্ত বিভাগের প্রধান অর্থাৎ ডাইরেক্টর জেনারেল শেখ জু্কার ছিলো একজন দুঃশ্চরিত্র লম্পট। তার লাম্পট্যের প্রতিবাদ করতে গিয়ে বুলবুল এই চাকরি ত্যাগ করেছিলেন।

আর্থিক সংস্থানের একটা ভালো ব্যবস্থা হলো বলে বাবা মা খুশী হয়েছিলেন ছেলের চাকরি পাওয়ার খবরে।

কিন্তু যার সবচেয়ে বেশী খুশী হওয়ার কথা—সেই বুলবুলই যেন কেমন নিরুৎসাহ হয়ে গেলেন চাকরিটা নিয়ে। বোনের কাছে লিখিত এক পত্রে তিনি বললেন :

'- - - অবশেষে আমার একটা খুব ভালো চাকরি পাওয়ার সংবাদে তুই যে কত খুশী হয়েছিস তা আমি বুঝতে পারছি। তুই তো খুশী হলি, কিন্তু আমি ভাবছি, আমার শিল্পী মনটির না মৃত্যু হয়। খোদার কাছে শুধু এইটুকু কামনা করো বোন, তা যেন না হয়। তার চেয়ে শারীরিক মৃত্যুই আমার কাম্য——'

সেই মনের মৃত্যু তিনি ঘটতে দেননি। শেখ জু্কারের লাম্পট্যের প্রতিবাদে তারই সামনে পদত্যাগ পত্র লিখে তার চোখের ওপর তুলে ধরে দৃপ্ত ভঙ্গিতে তিনি অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। অন্যায়, অসুন্দর আর অসত্যের বিরুদ্ধে বুলবুল চিরদিন সোচ্চার ছিলেন। তাই তিনি ওই উচ্চপদে থুথু ছিটিয়ে অনায়াসে চলে আসতে পেরেছিলেন।

হঠাৎ করে চাকরি ছেড়ে দেওয়াতে তখন তাঁকে চরম অর্থকষ্টে পড়তে হয়েছিলেন। মানসিক যন্ত্রণাও তীব্রতর হয়ে উঠেছিলো। তৎক্ষণাৎ বাবাকে চাকরি ত্যাগের কারণ তিনি জানাতে চাননি। অন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করে জানাবেন বলেই স্থির করেছিলেন। দীর্ঘ একটি বছর পর টাটা এয়ারক্রাফ্টে

একটি ভালো চাকরি পেলেন—এড্‌মিনিস্ট্রেটিভ অফিসার। এই চাকরি তিনি করেছেন ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পথিকৃতদের জীবনে যুগ যুগ ধরে এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়ে আসছে। একদিকে কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি ও জীবন ধারণের সংগ্রাম—অন্যদিকে শিল্পের সাধনা। বুলবুলের সেদিনের সমস্যাও ছিলো তাই। আজও বাংলাদেশের বহু প্রতিভাবান শিল্পী এই অবস্থায় পড়ে তিল তিল করে আত্মাহুতি দিচ্ছেন। ১৯৪২-এ সেই আর্থিক, মানসিক যাতনার দিনগুলোতে সেই যে তাঁর শরীর ভেঙেছিলো—তারপর থেকে তাঁকে আর কখনো সম্পূর্ণ সুস্থ দেখিনি।

১৯৪৮ সালের দিকে বছর দুই তিনি ওরিয়েন্ট এয়ারওয়েজে চাকরি করেছিলেন। এই কমার্শিয়াল বিমান সংস্থাটি ১৯৫০ সালের দিকে উঠে যায় এবং পাকিস্তান বিমান সংস্থা—পি. আই. এ.র অন্তর্ভুক্ত হয়। বুলবুলকে পি. আই. এ.' কর্তৃপক্ষ করাচীতে আরো বড় পদ দিয়ে বদলি করে, কিন্তু বুলবুল সে পদ প্রত্যাখ্যান করেন। চাকরি মুক্ত হয়ে এবার তিনি ঢাকায় স্থায়ী ভাবে বসবাস করার সংকল্প গ্রহণ করেন।

১৯৪৩ সাল থেকে '৪৬ সাল পর্যন্ত চাকরি জীবনের এ ক'টি বছর বুলবুল চৌধুরী পড়াশুনার মধ্যে নিমগ্ন থাকতেন। অফিসের সময় ছাড়া অন্য সময় তিনি থাকতেন নিজের জগতে। এই জগত তাঁর একান্তই নিজস্ব ছিলো এবং তিনি নিঃসঙ্গ ছিলেন। তাঁর পরিশীলিত অনুভূতিশীল মনের গভীরে যে সম্পদ ছিলো তাকে প্রকাশ করবার অবসর মিলেছিলো। তিনি এই বছরগুলোতে লিখেছেন। তার কিছু প্রকাশ হয়েছিলো, কিন্তু অন্য সব লেখাগুলোর খোঁজই পাওয়া যায়নি।

১৯৪৫ সালের দিকে আমরা কোলকাতায় বুলবুলের সঙ্গে কিছু দিন ছিলাম। বুলবুলের মানবিক দিকটা এক একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে বড় সুন্দর হয়ে ধরা পড়তো। যশোর রোডের ওপর তাঁর ছিমছাম সুন্দর বাসাটিতে মাঝে মাঝে দেখা যেতো উড়িষ্যা, বিহার, মাদ্রাজের বাশিন্দা—গাড়োয়ান, রিক্সাচালক, কলকারখানার ছোটখাটো মিস্ত্রী ইত্যাদি শ্রমিক শ্রেণীর লোকজন আসে যায়। কয়েক দিনের মধ্যে কারণটা জানা গেল। একদিন বিকেলে বুলবুল

Chunati.com village based website

অফিস থেকে বাসায় ফিরেছেন, সঙ্গে একটি জোয়ান লোক। গাড়ীতে নিজের পাশে বসিয়ে লোকটিকে ধরে আছেন। বুলবুল, বুলবুলের ভাই রফিক আর ড্রাইভার—তিনজন ধরাধরি করে লোকটিকে গাড়ী থেকে নামালেন। লোকটি ছিলো মাতাল আর অসুস্থ। বুলবুল অল্পক্ষণের মধ্যে কাপড়চোপড় বদলে বারান্দায় ফিরে এলেন। নিজের হাতে ওই অজ্ঞাত, অপরিচিত রোগাক্রান্ত মানুষটিকে পরম যত্নে মাথা ধোয়ালেন, মোছলেন, তারপর মাদুর পেতে কিছু কাপড় ঢেকে শুইয়ে দিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে লোকটি ঘুমিয়ে পড়লো। তার চিকিৎসার ব্যবস্থা বুলবুল করেছিলেন। বুলবুলের চেষ্টাতে ওই রিক্সাওয়ালা তাড়ি খাওয়া ছেড়ে দিলো। রোজগারের টাকা সে আর তাড়ি মদ খেয়ে উড়িয়ে দিতো না—পরিবারের জন্য টাকা পয়সা দেশে পাঠিয়ে দিতো।

একদিন দেখেছিলাম—১৬/১৭ বছর বয়সের একটি তরুণ ছেলেকে বুলবুল বেধড়ক পিটাচ্ছেন। ছেলেটিকে জুয়ার আড্ডা থেকে তুলে এনেছিলেন। বিহারী ছেলে কোলকাতা এসেছিলো রুজির ধান্দায়। রুজি-রোজগারের পয়সা তাড়ি আর জুয়াতে শেষ করে দেওয়া [illegible] অসৎ সংসর্গের দোষে ছেলেটি একেবারে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। বুলবুল তাকে রক্ষা করেছিলেন। কোন একটা কারখানায় ওই ছেলেটিকে একটা চাকরি জোগাড় করে দিয়েছিলেন। শুধু ওই অপরিচিত ছেলেটি কেন—বুলবুল জীবনে বহু লোকের চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কখনো নিজের ক্ষমতার বলে, কখনো সুপারিশ করে। যশোর রোডের সেই বাসায় একদিন একটি লোক এলো, হাতে শাল-পাতার মাঝারি আকারের একটি ঠোংগা—মিষ্টির ঠোংগা। বুলবুলকে বললো : সাহেব, আপনি নাকি লোকজনদের চাকরি বাকরি করে দেন—দয়া করে আমাকে একটা চাকরি করে দিন। আপনি আমার শেষ ভরসা। বহু জায়গায় ঘুরেছি। টাকা পয়সাও খরচ করেছি। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। বুলবুল বললেন : আপনার কথা তো শুনলাম। আপনার হাতে ওই ঠোংগাটা কেন, বললেন না তো ? ওই লোকটি এবার নিতান্ত কাচুমাচু হয়ে বললো : সাহেব, ওতে সামান্য একটু মিষ্টি এনেছিলাম। বুলবুল যেন গর্জে উঠলেন : নিয়ে যান ওই মিষ্টি, নইলে আমি ফেলে দেবো, আপনার সামনেই ফেলে দেবো।

Chunati.com

তার চাইতে মিষ্টি নিয়ে চলে যান। ঘুষ দিয়ে চাকরি—ঘুষখোর আপনারাই তৈরি করেন। পরে অবশ্য লোকটির চাকরি হয়েছিলো।

বুলবুল মদ স্পর্শ করতেন না। তাঁর বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে অনেকেই ড্রিংক করতেন। অনেকে ড্রিংক করতেন সখ করে, অনেকে আবার অভ্যাসের জন্য। বন্ধুদের ড্রিংকের ব্যাপারে তিনি কখনো কোনো মন্তব্য করেননি সত্য—কিন্তু তিনি বলতেন: সাধারণ মানুষ পানের নেশায় পড়লে নৈতিকতা বোধ হারিয়ে ফেলে। বিশেষ করে গরীব জনসাধারণকে নেশা করতে দেখলে তিনি কষ্ট পেতেন। তিনি অনেক নেশাগ্রস্ত সাধারণজনকে নেশা ছাড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই সব সাধারণ মানুষগুলো—মিস্ত্রী, কুলি, গাড়োয়ান: এরা বুলবুলের প্রতি এত কৃতজ্ঞ ছিলো যে, ওরা মাঝে মাঝেই বুলবুলকে এসে দেখে যেতো। এমনি ধরনের অনেক মানুষের বন্ধু ছিলেন তিনি।

টাটা এয়ার ক্রাফটের চাকরি নিয়ে যশোর রোডের বাসায় উঠে আসার পর থেকে বুলবুলের একান্ত ইচ্ছা, বাবা মা দু'জনই তাঁর কাছে এসে থাকুন। বাবা মাকে এ সম্বন্ধে তিনি ক্রমাগত চিঠি লিখতে থাকেন। এ সময়টাতে বাবা বার্ধক্য জনিত অসুখে ভুগছিলেন। তাই নিজের বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবার ইচ্ছা তাঁর ছিলো না। কিন্তু বুলবুলের জেষ্ঠ্য পুত্র শহীদ আহমদ বুলবুলকে একবার দেখবার জন্য তিনি উৎসুক ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে দেশের সর্বত্র অসুধ-পত্র ও শিশুখাদ্য ইত্যাদির দারুণ সংকট দেখা দিয়েছিলো। গ্রামে এই সংকট ছিলো প্রকটতর। বাবা সেই জন্যই নাতিকে গ্রামে আনতে চাননি। শহীদ জন্মাবার পর তখন প্রায় বছর খানেক কেটে গেছে। বাবা কোলকাতা যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। মাও বাবার সঙ্গে যাবার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু সেবার তিনি যেতে পারেননি। ঘর-গৃহস্থালীর ঝামেলা ছিলো অনেক।

বাবা প্রথম তাঁর বড় জামাই ডাঃ আলতাফ উদ্দিন সাহেবের বাসায় উঠেছিলেন। ডাঃ আলতাফ তখন ঢাকা থাকতেন। বুলবুল খবর পেয়ে নিজে এসে বাবাকে কোলকাতা নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রার্থিত দিনটির নাগাল পেয়ে তিনি যেন দিশাহারা হয়ে পড়লেন। বাবাকে কেমন করে আরাম দেবেন, কি

খাওয়াবেন, কেমন করে সেবা যত্ন করবেন—সে-ই ছিলো তাঁর একমাত্র চেষ্টা।

আর বাবা? ছেলের সংসারে এসেছেন তিনি—যে ছেলের সংসার দেখবার আশা তাঁরা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। সন্তান-বৎসল পিতা আর অনুগত পুত্রের সেই অনুভূতি নিতান্তই অনুভবের ব্যাপার। ছেলের সংসারে কিছুদিন থেকে বাবা ছেলের পারিবারিক জীবনের অনেকখানি বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর মত বিজ্ঞ ব্যক্তি, বিশেষ করে স্নেহপ্রাণ পিতার দৃষ্টিতে কিছুই এড়ায়নি। বুলবুলও তা বুঝতে পেরেছিলেন। সে জন্য তিনি মনে মনে অস্থির হয়েছিলেন। ভয় ছিলো বাবা যদি কিছু জিজ্ঞেস করেন—কিছু যদি জানতে চান! অমৃত ভেবে আকণ্ঠ তিনি যে বিষ পান করেছিলেন, তার যন্ত্রণায় অন্তর বিদীর্ণ হয়েছিলো, অস্থি মজ্জায় ঘুণ ধরেছিলো! কিন্তু বাবার কাছে তিনি তা সযত্নে আড়াল করে রাখিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা বুঝি হলো না। বাবা হয়তো জানতে চাইবেন, সে জন্য বুলবুল প্রতি মুহূর্তে উদ্বিগ্ন হয়ে থাকতেন! কিন্তু আশ্চর্য, বাবা সে দিনও যেমন কিছু জানতে চাননি, তার পর যতদিন বেঁচেছিলেন—পুত্রের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে আর কিছুই জানতে চাননি। বাবা হয়তো পুত্রের মনের যন্ত্রণাকে আর বাড়াতে চাননি। দু'জনই যে যার মনে পুড়েছেন শুধু! যন্ত্রণা ছিলো তীব্রতর।

বাবা কোলকাতা থেকে দেশে ফিরে আসার পর মাত্র বছর খানেক বেঁচে ছিলেন। তার পর থেকে বুলবুল একা, দিনরাত শুধু জ্বলেছেন—আর লোবানের মত গন্ধ ছড়িয়েছেন!

Chhutai.com Pioneer in village based website

তিন

বুলবুল বিচ্ছিন্ন শিল্পী সমন্বয়ে পুনরায় একটি নিজস্ব ট্রুপ গঠনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। সে সব কি দিনই না কেটেছে! দেশের রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতিজনিত আভ্যন্তরীণ গোলযোগ। বাঙালীর জীবনে বেকারত্বের চরম অভিশাপ। তার ওপর বাবার পীড়ার জন্য দুঃশ্চিন্তা। ব্যক্তিগত ভাবে বিবাহিত জীবনের দায় দায়িত্ব এবং নিজস্ব একটি শিল্পীদল গঠন সম্পর্কিত অর্থাভাব ইত্যাদি দুঃশ্চিন্তায় বুলবুল খেপার মতোই অস্থির হয়ে উঠলেন যেন। সে সব দিনের কথা মনে হলে—বুলবুলের অসীম ধৈর্য, দৃঢ়-মনোবল ও অপূর্ব কর্মকুশলতার প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে।

যেদিন থেকে বুলবুল শিল্পকে জীবনের একমাত্র নেশা ও পেশা বলে বেছে নিয়েছিলেন সেদিন থেকে তাঁর কল্পনায় এক নতুন পরিকল্পনা খাড়া করেছিলেন এবং সেই পরিকল্পনার ভিত্তিতেই বুলবুল তাঁর শিল্পী জীবনের ভিত্তিও তৈরী করেরছিলেন। উচ্চশিক্ষা ও মননশীলতা ছিলো এ ব্যাপারে সব চেয়ে বড় নির্ভর। এই দুই শক্তির ভিত্তিতেই হয়তো তাঁর পরিকল্পনার কাঠামোকে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত ও সামঞ্জস্যপূর্ণতে সক্ষম হয়েছিলেন।

Ghunati.com
Pioneer in village based website

সাধারণতঃ শিল্পীদের বেলায় দেখা যায়—অস্থির ও অব্যবস্থিত চিত্ততার দরুণ তাঁদের শিল্পপ্রচেষ্টা পূর্ণ রূপ নিয়ে গড়ে উঠতে পারে না। কিন্তু এদিকেও বুলবুল ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। সাংসারিক ব্যাপারে তিনি যত কাঁচা আর অবাস্তবই হোন না কেনো, শিল্পসত্তা ও শিল্পপ্রচেষ্টার দিক দিয়ে ছিলেন সুশৃঙ্খল, পরিচ্ছন্ন পরিপাটি। তাঁর শিক্ষা ও সংস্কার থেকে এই সত্তার জন্ম। এই সত্তার মৃত্যু তিনি হতে দেননি কখনো। নিজের প্রাণ নিংড়ানো জীবন-রস দিয়ে একে জীইয়ে রেখেছিলেন।

সকল রকম প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আবার তিনি গ্রুপ গড়ে তুললেন। তারপর ভারতের নানা জায়গায় সফরে বেরুলেন। দেশ বিভাগের সন্ধিক্ষণে ভারতের অব্যবস্থিত অবস্থা সত্ত্বেও, বুলবুল ও তার কলাকুশলী শিল্পীবৃন্দ জনসাধারণের কাছ থেকে প্রচুর অভিনন্দন লাভ করেন।

১৯৪৭ সালে জুলাই মাসে বাবার রোগশয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়াবার জন

দেশের বাড়ি থেকে ডাক আসে। কালবিলম্ব না করে বুলবুল বাবার রোগশয্যার পাশে এসে দাঁড়ালেন এবং অন্যান্যের হাত থেকে বাবার পরিচর্যার ভার তিনি স্বহস্তে তুলে নিয়ে প্রাণভরে সেবা করেছিলেন। এদিকে ক্রমশঃ বাবার অন্তিম মুহূর্ত নিকটতর হয়ে আসতে লাগলো। সেই চরম অবস্থার কথা ভেবে বুলবুল আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছিলেন। বাবার মুখের দিকে সর্বক্ষণ এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন আর অনুচ্চস্বরে প্রার্থনা করতেন 'হে খোদা, আব্বা যেন বেঁচে ওঠেন, আব্বাকে তুমি বাঁচিয়ে দাও......' বুলবুলের সেই সকাতর প্রার্থনা যাঁর শুনবার কথা, তিনি শুনেছিলেন কিনা জানি না।

শ্রাবণের এক দুর্যোগপূর্ণ রাতে বাবার অবস্থা যখন অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়ে তখন বাবার স্তিমিত দু'চোখের অতি নিকটে মুখখানা নামিয়ে বুলবুল শিশুর মতো অধীর হয়ে বলেছিলেন: 'আব্বা, আব্বাগো, আমাকে আপনার অনুগত পুত্র বলেই জানবেন।'

ধীরে ধীরে বাবার স্বভাব-শান্ত মুখখানা এক অপূর্ব আনন্দ ও অপার্থিব প্রশান্তিতে ভরে উঠেছিলো। তারপর, কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই প্রশান্তি আর আনন্দ নিয়ে তিনি পার্থিব চোখ দু'টি বুজলেন চিরদিনের মতো। সেদিন ছিলো জুলাই মাসের বাইশ তারিখ, সোমবার ১৯৪৭ সাল। রমজান মাসের সতেরো তারিখ।

চার

পিতৃবিয়োগের এই প্রচণ্ড শোক প্রচণ্ডতর হয়েই বুলবুলের বুকে লেগে ছিলো। বুলবুলের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে বসেছিলো যে—বাবার বড় ছেলে হিসেবে তিনি কোনো কর্তব্যই করতে পারেননি। বাবার বৃদ্ধ বয়সে, সংসারের কোনো দায়িত্ব পালনে বাবাকে সাহায্য করতে পারেননি! নিজের চিন্তা, প্রচেষ্টা, কর্ম, সব কিছু শিল্পের পেছনেই নিয়োজিত করেছিলেন বছরের বছরের পর বছর, ক্রমাগত সংগ্রাম করে শেষ পর্যন্ত শিল্পসাম্রাজ্য পত্তনের মাহেন্দ্রক্ষণ যখন এলো ঠিক তখই বাবা চলে গেলেন চিরদিনের মতো। বুলবুল এই আঘাত, এই দুঃখ কিছুতেই যেন ভুলতে পারছিলেন না।

Chunati.com Pioneer in Village based website

বাবার মৃত্যুর পর বুলবুলের শোকার্ত মনে সম্ভব অসম্ভব নানারকম চিন্তা দেখা দিলো। ক্রমে একটা অদ্ভুত ধারণা জন্মায় যে—প্রধানতঃ তার চিন্তাতেই বাবা মারা গেলেন। এই অদ্ভুত চিন্তা মাথায় ঢোকার ফলেই বোধহয় মনটাও অমন করে ভেঙে গিয়েছিলো। কিন্তু অন্যান্য শোকার্তদের কাছে, বিশেষ করে মায়ের সম্মুখে তাঁর মনের দুঃখ কিছুই প্রকাশ করতেন না, বরং মা যাতে সহজ হয়ে উঠেন, সেদিকেই খেয়াল দিতেন। ধর্মীয় বিধান মতো বাবার শেষ কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করবার জন্য আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বুলবুল যত্নবান হলেন। এই শোকের ধাক্কাটা অন্য সকলে একটু সামলিয়ে উঠলে বুলবুল কোলকাতায় ফিরে গিয়ে মাকে লিখেছিলেন :

মাগো,

আব্বাকে আমরা হারাইয়াছি মনে করিলে ভুল হইবে। তিনি শুধু চোখের আড়ালে গিয়া আমাদের অন্তরবাসী হইয়াছেন। তাঁর সিংহাসন এখন আমাদের মনের মণিকোঠায়। আমাদের ধ্যানেই তিনি চিরজাগ্রত হইয়া রহিলেন। তাঁর পুণ্যস্মৃতি বহন করিয়া আমরা নির্মল হইব।

'- - - - - আমাদের জন্য তিনি জাগতিক ও বৈষয়িক অনেক কিছু রাখিয়া গেলেও আসল যে মহামূল্য বস্তু তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তা হইল, তাঁহার 'মহান আদর্শ' তাঁর 'অপূর্ব দীক্ষা'। ইহাই হইল আমাদের সম্পত্তি—এই সম্পত্তি সোনা দিয়াও কেনা যায় না। আজ খোদার দরবারে তাই মোনাজাত করি, তিনি যেন আমাদিগকে আব্বার সেই মহান আদর্শের পথে পরিচালিত করেন। আর আপনিও দোয়া করুন মা, আমরা যেন সবদিক দিয়া আব্বার যোগ্য সন্তান হইতে পারি - - - - -'

বাবার এন্তেকালের পর মা একটা না একটা অসুখে ভুগছিলেন। অবশেষে অসুখ মারাত্মক হয়ে দাঁড়াতে বুলবুল তাঁকে তখন কোলকাতায় নিয়ে আসেন বিশেষজ্ঞ দিয়ে চিকিৎসা করাবার জন্য। এলোপ্যাথিক চিকিৎসার চূড়ান্ত করেও মায়ের রোগ নিরাময় হলো না। শেষ পর্যন্ত মায়ের ইচ্ছাতেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শুরু করা হয়। আর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাতেই তিনি ক্রমশঃ আশ্চর্যজনক ভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন।

Chunati.com Pioneer in village based website

মাকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করাতে গিয়ে বুলবুল ডাঃ জব্বার নামে এক ভদ্রলোকের সংস্পর্শে আসেন। চিকিৎসক ছাড়া 'পীর-ফকির' হিসেবেও জব্বার সাহেব অনেকের ভক্তিভাজন ছিলেন। মায়ের জটিল রোগের অত্যাশ্চর্য ফল দেখে বুলবুল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞানের দিকে অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে পড়েন।

মায়ের অষুধপত্রের জন্য বুলবুল নিজেই ডাঃ জব্বারের কাছে যাওয়া আসা করতেন। তখন প্রত্যেক সময়ই দেখতে পেতেন ডাঃ সাহেবের চার-পাশে অসম্ভব রকম ভীড় জমে আছে। তাদের মধ্যে আবার দুটো ভাগ ছিলো—এক ভাগের লোক 'দাওয়া' নিয়ে চলে যেতো, আর অন্য ভাগের লোক 'দোয়া' প্রার্থী হয়ে বসে থাকতো। প্রত্যেকদিন এই একই দৃশ্য দেখে বুলবুলের মন অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠে।

রুগীদের দেখে শুনে তাদের অষুধপত্রের ব্যবস্থা করে দিয়ে ডাক্তার সাহেব ভক্তমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হয়ে বসে বসে কোরান হাদিস নিয়ে আলো-চনা শুরু করতেন। বুলবুলও মাঝে মাঝে এই বৈঠকে যোগ দিতে লাগলেন। তাঁর পিতৃশোকাকুল হৃদয়ে ধর্মীয় আলোচনা যেন শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিতো। মায়ের অষুধপত্র আনা-নেওয়া ও এই ধর্মীয় আলোচনার মাধ্যমে ধীরে ধীরে ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে বুলবুলের পরিচয় ঘনিষ্ঠতম পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়।

মায়ের অসুখের ব্যাপারে বিংশ শতাব্দীর উন্নত ধরনের চিকিৎসা-বিজ্ঞানও যেখানে স্থায়ী কিছু করতে পারলো না, সেখানে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় মা সম্পূর্ণ নিরাময় হলেন—এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার বৈকি! তিনি দেখেছেন, বাড়িতে বাবা গ্রামের গরীব দুঃখী, আত্মীয় স্বজন অনেকের চিকিৎসা করতেন। মেজ চাচিমা এখনও সেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাই করে থাকেন। গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণ এই ঔষধ পরম বিশ্বাসে গ্রহণ করে, আর তারা ফলও পায় আশানুরূপ। কিন্তু এ যে সম্পূর্ণ অভাবিত ব্যাপার—যেখানে এলো-প্যাথি ব্যর্থ হলো, সেখানে হোমিওপ্যাথি অব্যর্থ হলো কি করে? বুলবুল চিন্তা করতে লাগলেন। ধর্মের প্রতি ডাক্তার সাহেবের গভীর অনুরাগ,

Chunati.com

আর সেই বিষয়ে ত঱ার জ্ঞানের পরিধিও তিনি দেখেছেন। পরে আরো জেনেছিলেন, ডাক্তার জব্বার হচ্ছেন—আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন এম. এ.। হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রে জার্মান ও আমেরিকার ডিপ্লোমা এবং ডিগ্রীপ্রাপ্ত। এক সময় ইউরোপ আমেরিকা তিনি সফর করে বেড়িয়েছেন। কোনো এক সম্ভ্রান্ত ঘরের দুলাল তিনি—কিন্তু যে কোনো কারণে, টাকা পয়সা ধন সম্পত্তি সব বিলিয়ে ছড়িয়ে এখন নিতান্ত সাধারণ ভাবে দিন কাটাচ্ছেন।

এসব কথা জানার পর বুলবুল বিস্মিত হলেন। আর সেই বিস্ময় থেকে ক্রমে ক্রমে জন্ম নিলো ভক্তি। তিনি একান্তভাবে বিশ্বাস করলেন যে, ডাক্তার সাহেব যে চরিত্রবলে মহীয়ান হয়েছেন, তার উৎস হলো কোরান-হাদিসের শক্তি। আর সেই শক্তির ছোঁয়াতেই ডাক্তার সাহেব আধ্যাত্মিক চেতনা লাভ করেছেন। আর এই বিশ্বাস অনুসরণ করতে গিয়ে ক্রমে তিনিও যেন উদাসীন হয়ে উঠলেন। ডাক্তার সাহেবের বাড়ি আর বুলবুলের বাসা প্রায় এক হয়ে উঠলো। তখন থেকেই তিনি এই জীবন, এই জগৎ সব কিছুকে অলীক মনে করতে শুরু করেছিলেন। সেই উন্নত বিশ্বাস নিয়ে তিনি কি আর বসে থাকবার ছেলে—আপনজনদের মধ্যে এই উপলব্ধির বার্তা পৌঁছে দিতে হবে যে। সেই অস্থিরতায় ছট্‌ফট্‌ করতে করতে ছুটে যেতেন গ্রামের বাড়ি চুনতিতে, চট্টগ্রামে। মা, ভাইবোন আর প্রিয়জনদের কাছে নিজের উপলব্ধিজাত আধ্যাত্মিকতার শান্তি উজাড় করে ঢেলে দিতে। ইতিমধ্যে মা চুনতিতে ফিরে এসেছিলেন সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে।

Chunati.com Pioneer in village based website

পাঁচ

বাঁকুড়ার রিক্ত সৌন্দর্যের মধ্যে একদা যে চঞ্চল ছেলেটি মনের আনন্দে ঘুড়ে বেড়াতেন—আবার সেই চঞ্চল বালকই যেন হয়ে উঠলেন বুলবুল। 'সব পেয়েছি' দেশের চাবিকাঠি হাতে পাওয়ার মতোই যেন নিশ্চিত বিশ্বাসে তিনি বলতেন : 'এই অলীক দুনিয়াতে আর ক'টা দিনমাত্র, তারপরেই তো

যাচ্ছি আল্লার কাছে। তারপর আর ছাড়াছাড়ি নেই - - - -'। আর এমন ভাবে বলতেন কথাগুলো, যাকে নিতান্ত খেয়াল বলে উড়িয়ে দেওয়া যেতো না।

বুলবুলের সে সব কথা বাবার মৃত্যুশোকগ্রস্ত বিগলিত অন্তর থেকেই বেরিয়ে আসতো কিনা জানি না, নাকি তিনি এমন কোনো আধ্যাত্মিক আলো পেয়েছিলেন, এমন কোনো মহাসত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন যাতে করে অমন একাগ্র হয়ে পরম বিশ্বাস নিয়ে বলতে পারতেন কথাগুলো। সে এক বিস্ময়কর ও অভাবনীয় ব্যাপার! বুলবুল বলতেন 'পৃথিবীর শেষদিন তো এসেই গেলো—দু'দিনের জীবনের জন্য কৃপণের মতো সঞ্চয়ের এই তোড়জোড় কেনো? যা আছে বিলিয়ে দাও। তোমার আমার ঘর সকলের হোক—তোমার গৃহদ্বার খুলে দাও, ছোট বড় সকলের জন্য। অন্তর মুক্ত করে দাও—সমস্ত বিশ্ব মিলিত হোক তোমার অন্তরে - - -'

অনুভবের শান্তিতে ভরা বুলবুলের এই কথাগুলো শুধু কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো না। তাঁর কোলকাতার বাসাবাড়ি হয়ে উঠলো একটি লঙ্গরখানা। ডা: জব্বারের ভক্তের দল বুলবুলের বাড়িতে আর নিজের বাড়িতে কোনো প্রভেদ রাখলো না। প্রচুর অর্থ বুলবুল এই ভক্তবৃন্দের জন্য ব্যয় করতে লাগলেন। শুধু ডাক্তার সাহেবের ভক্তবৃন্দ না হয়ে যদি সমস্ত কোলকাতা মহানগরী বুলবুলের দস্তরখানে এসে বসতো, তবুও তিনি বোধহয় কোনো আপত্তি করতেন না। কারণ তখন তাঁর চৈতন্য বাস্তববোধের বহু উর্ধ্বে বিচরণ করছিলো।

এই 'মোহের' জালে বুলবুল দিনদিন যেন আরো বেশী জড়িয়ে পড়ছিলেন। তখন ডা: জব্বারই বুলবুলের উপদেষ্টা, পরিচালক ও কর্ণধার। ডা: সাহেবের কথা মতোই তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন যে—কেয়ামত ঘনিয়ে এসেছে, শিগ্‌গীরই পৃথিবীর ওপর এক বিরাট বিপর্যয় আসছে'! দেশের বাড়িতে আবার ছুটে গিয়ে মা ভাই-বোনদের বললেন: 'প্রলয় আসছে'। মাকে বলতেন: মা, প্রলয় আসন্ন, দু'চারদিন অথবা দু'চারমাসের মধ্যে যে কোনো দিন দেখবেন—প্রলয় হুঙ্কারে সব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আসমান-জমিন-পাহাড়-পর্বত সব একাকার হয়ে শূন্যে মহাশূন্যে, মিলিয়ে যাচ্ছে—তারপর মাকে

Chunati.com
Pioneer in village based website

অভয় দিতেন, কিন্তু ভয়ের কোনো কারণ নেই মা, আমি নিজে আসবো, প্রলয় রাত্রির সূচিভেদ্য অন্ধকারে বিশ্বাসের মশাল হাতে নিয়ে—আমি আসবো পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে, মা। ডা: সাহেব বলেছেন, আমি সে শক্তি পাবো—ঐকান্তিক বিশ্বাসে সবাইকে দৃঢ় থাকতে হবে। 'ইমানের দরকার'। কিছু ভয় নেই মা, তখন আমি যদি কোলকাতায় থাকি, তাতেও ভয় পাবেন না। কারণ কোলকাতা আর চুনতির এই দূরত্ব অতিক্রম করতে আমার লাগবে কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। সেই পক্ষীরাজের গতিবেগ যে এরোপ্লেনের হাজার হাজার গুণ বেশী হবে—ইত্যাদি।

ছয়

বাবার বিয়োগব্যথা কতো গভীর হয়ে যে বুলবুলের বুকে লেগেছিলো সেই শোকের দাহনেই তিনি যেন ভুলে গেলেন আপন সত্বার অস্তিত্ব, ভুলে গেলেন যুক্তি ও যৌক্তিকতা!

Chunati.com
Pioneer in village based website

মা চিরদিনই ধর্মপ্রাণ ভক্তিমতি মেয়ে। ছেলের এইসব কথায় কোনো অন্যায় বা অপরাধ দেখলেন না বলে ছেলের মতকে তিনি উড়িয়ে দেবার প্রয়োজনবোধ করলেন না। বরং ছেলেকে আল্লার কাছে সমর্পণ করে নীরব হয়ে রইলেন। ঘনিষ্ঠ দুই একজন আত্মীয় এই অবিশ্বাস্য কথা শুনে তীব্রভাবে প্রতিবাদ করেছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁরা বুলবুলকে তাঁর মত হতে বিন্দুমাত্রও সরাতে পারেননি।

সেবার চুনতি থেকে কোলকাতা ফিরবার পথে বুলবুল চট্টগ্রাম শহরে বোনের বাড়িতে এসে উঠেছিলেন। সেখানে পৌঁছেই তিনি মেঝো বোন ও তার স্বামী হাবিবকে অনুরূপ হুঁশিয়ারি জানালেন। সেই সঙ্গে বুলবুলের স্বভাবজাত সহৃদতায় তাদের আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন : 'কিন্তু ভয় পেয়ো না, আমি আসবো - - - - -'।

বুলবুল আর হাবিব চিরকালের বন্ধু। তারা দু'জন সমবয়সীও। হাবিবের

সঙ্গে বোনের বিয়ে হবার অনেক আগে থেকেই তাঁরা পরস্পরকে জানতেন একই গ্রামে দু'জনের বাড়ি। হাবিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র। ছাত্রজীবনে হাবিবের সঙ্গে বুলবুলের বোনের বিয়ে হয়েছিলো। তখন থেকে তাঁদের বন্ধুত্ব আরো নিবিড় হয়ে ওঠে। যখনকার কথা হচ্ছে—হাবিব তখন চট্টগ্রাম কলেজের অর্থনীতি শাস্ত্রের অধ্যাপক।

হাবিবের ওপর বুলবুলের ঐকান্তিক বিশ্বাস ছিলো বরাবর। নানা ব্যাপারে অনেক সময় বুলবুল হাবিবের পরামর্শ নিতেন এবং তাঁর মতামতকে বিশেষ মূল্যবান মনে করতেন। প্রধানতঃ শুভেচ্ছা প্রণোদিত হয়েই তিনি হাবিবকে 'আসন্ন প্রলয়' সম্পর্কে হুঁশিয়ারি জানাতে গিয়েছিলেন।

এসব ব্যাপার ইতিপূর্বে বুলবুল কোলকাতা থেকেও চিঠিতে বিস্তৃত লিখেছিলেন হাবিবের কাছে। হাবিব বরাবর চেষ্টা করেছেন এপথ থেকে বুলবুলকে ফেরাতে। কারণ তিনি ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে বুলবুলের অতিরিক্ত মাখামাখি ও 'মিরাকল' পন্থীতে বিশ্বাসী হওয়া গোড়া থেকেই পছন্দ করেননি। কিন্তু সে সম্বন্ধে এতদিন সামনাসামনি যুক্তিতর্কের অবতারণা করার কোনো সুযোগই তিনি পাননি।

হাবিব এবার সেই সুযোগ পেয়ে অত্যন্ত খুশী হলেন এবং এখন তিনি এই সুযোগ ছেড়ে দিতে কিছুতেই রাজি হলেন না। যেমন করেই হোক এবার তাঁকে এ পথ থেকে ফিরাতে হবে। বুলবুলের এই অদ্ভুত ও অবাস্তব খেয়াল তাড়াতে না পারলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। তাই হাবিব যেন পণ করেই তৈরী হলেন বুলবুলের সঙ্গে তর্ক যুদ্ধে নামতে। তিনি জানতেন এবং বিশ্বাস করতেন, শিল্পই বুলবুলের ক্ষেত্র, পীরগিরি নয়। আবার এই পথেই তাঁকে ফিরে আসতে হবে। এমনিতেই অনেক সময় নষ্ট হয়েছে ডাঃ জব্বারের পেছনে।

সেদিন বুলবুলের হুঁশিয়ারির সূত্র ধরেই হাবিব আলাপ শুরু করেছিলেন। আলোচনার মূল বিষয় ছিলো: আধুনিক যুগ ও মনোবিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মের সত্যিকার রূপ ও তাৎপর্য কি? বৈজ্ঞানিক যুগে ধর্মীয় ভিত্তিতে কোনো পরমাশ্চর্য ঘটনা বা 'মিরাকেল' ঘটতে পারে কিনা এবং কোনো

Chunati.com Pioneer in village based website

বিশেষ ব্যক্তি এই যুগে কোনোরকম 'মিরাকেল' ঘটাবার জন্য 'স্রষ্টা' কর্তৃক আদিষ্ট হতে পারেন কিনা ইত্যাদি। তাঁদের এই আলাপ-আলোচনা তর্ক-বিতর্কের জন্য হাবিব বুলবুলকে কয়েকদিন ধরে রেখেছিলেন।

অবশেষে হাবিবের যুক্তি ও বিশ্লেষণের কাছে বুলবুলের হৃদয়াবেগ প্রতিহত হলো সেই প্রথম। সেই সম্বন্ধে হাবিবের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব বুলবুল পরিষ্কাররূপে দিতে পারলেন না। অথবা জবাব দিয়ে তিনি নিজেই সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। এত দিনের সেই বিশ্বাসে অসম্ভাব্যতার ছায়া দেখতে পেয়ে চিন্তিত মনে ফিরে এলেন কোলকাতায়।

কোলকাতায় ফিরে এসে এবার একজন স্নেহ-প্রাণ বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে বুলবুলের পরিচয় হয়। তিনিই প্রায় গায়ে পড়ে বুলবুলের সঙ্গে পরিচিত হলেন। কয়েকবার তিনি বুলবুলকে দেখেছিলেন ডাক্তার সাহেবের বাসাতে। এই বৃদ্ধাকে বুলবুল ও তাঁর ভাইবোনেরা শুধু 'আম্মা' বলেই জানেন। সুবাদে তিনি ডাক্তার সাহেবের আত্মীয়াও হতেন। এই আম্মাই এখন সক্রিয় হয়ে উঠলেন বুলবুলকে ডাক্তার সাহেবের সংসর্গ হতে সরিয়ে আনতে।

মাত্র দু'চার দিনের আলাপের সূত্র ধরে সাধারণতঃ অন্য কেউ অনুরোধ জানাতেও যেখানে ইতস্ততঃ করে সেখানে 'আম্মা' নিজে উপযাচক হয়ে বুলবুলের বাসায় এসেছিলেন। কিন্তু অনুরোধ উপরোধ নিয়ে নয়—তিনি এসেছিলেন বজ্রকঠিন হুকার নিয়ে। সেই হুঙ্কারের প্রতিবাদে বা সেই আদেশ অমান্য করার মতো কোনো শক্তিই বুলবুল খুঁজে পেলেন না আর। 'আম্মার' আদেশে বুলবুলের বাসায় ভক্তের আড্ডা ভেঙে গেলো। যথেচ্ছা খরচ-পত্রও বন্ধ হলো। তাঁর আদেশের কাছে, তাঁর ইচ্ছার কাছে বুলবুল যেন শক্তিহীন শিশুর মতোই চুপ করে রইলেন। ভক্তেরাও সরে পড়া ছাড়া অন্য কোনো পথ দেখলো না। এবার হাবিবের সুচিন্তিত মতামতই যেন 'আম্মার' আদেশ ও সক্রিয়তায় রূপায়িত হয়ে উঠলো।

এই ঘটনার পর বুলবুলের মনের ঘোর কাটতে আর দেরী হয়নি—বরং আশ্চর্য হয়েছিলেন, অসম্ভবের নেশায় এতদিন তিনি মেতে ছিলেন বলে।

Chunati.com A village based website

সাত

'আম্মার' সঙ্গে বুলবুলের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার পর তিনি জেনেছিলেন এই বৃদ্ধা জীবনের সব রকম দুঃখ-শোকের মোকাবেলায় তিক্ত অভিজ্ঞতার ধনে ধনী। তাঁর মানসিক বিপর্যয়ের সময় ডাক্তার সাহেবের সংসর্গ তাকেও আকর্ষণ করেছিলো প্রবলভাবে। কিন্তু যে কোনো কারণে পরে তিনি সরে এসেছিলেন এবং নিজের মনের ভক্তি ভালোবাসা ও বিশ্বাস নিয়ে ধর্মকর্ম করে এখন বেশ শান্তিতে আছেন। এই মহিলাটি ইউ. পি'র অধিবাসী, কিন্তু পরে কোলকাতাতেই তিনি স্থায়ী হন। আরবী-ফার্সীতে যথেষ্ট পড়াশোনা করেছেন তিনি। পড়াশোনা আর এবাদত বন্দেগী নিয়ে তাঁর জগৎ ও জীবন।

অসম্ভবের নেশায় মেতে পাগলের মতো ঘুরে বেড়ানো সেই অদ্ভুত মনোভাবকে কোনো বাঁধাধরা বক্তব্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। বাবার মৃত্যুতে বুলবুল যে শোক পেয়েছিলেন তার নিভৃতেই খুব সম্ভব এই ভাবান্তরের কারণ নিহিত রয়েছে। বাবার মৃত্যুতেই তিনি সর্বপ্রথম শোকের সম্মুখীন হন। তাই বোধহয় সেই প্রচণ্ড শোকের সম্মুখে বুলবুলের বিচারবুদ্ধি পর্যন্ত সাময়িকভাবে লোপ পেয়েছিলো।

Chunati.com
Pioneer in village based website

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এক

এই মোহমুক্তির পর বুলবুল যখন নিজের পারিপার্শ্বিকতার পানে ফিরে তাকালেন তখন চারিদিককার অভাবের তাড়না যেন উদ্ধত ফণা তুলে ছোবল মারতে এলো, আর সেই সঙ্গে চোখের সামনে ভেসে উঠলো একখানা স্নেহ-কোমল মুখ, যে মুখের দেখা আর কোনো দিনই পাবেন না, যেখানে টুনুর কষ্ট সেখানেই তিনি ছিলেন, যেখানে টুনুর অভাব সেখানেই বাবার দু'হাতের অঞ্জলী ভরে উঠতো সাধ্যমতো। কিন্তু বাবা তো আর কোনো দিনই টুনুর সামনে এসে দাঁড়াবেন না তাঁর দু'হাতে অঞ্জলী ভরিয়ে। নিদারুণ বাস্তবের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে নিজের মনের পানে ফিরে তাকানোও যেন আজ বিলাসিতা। তাই এসব কল্পনা-বিলাস ছেড়ে দিয়ে তিনি শিল্পকেই আবার তাঁর জীবন সংগ্রামের পন্থা হিসেবে বেছে নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

Chunati.com
knowledge based website

এইবার ঢাকায় গিয়ে স্থায়ী হয়ে বসবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন বুলবুল। শিল্পের মাধ্যমেই তাকে অর্থের সংস্থান করতে হবে। চাকরি যে তাঁকে দিয়ে হবে না তা তো ইতিপূর্বে একাধিকবার প্রমাণ হয়ে গেছে।

তৎকালীন পূর্ববঙ্গে একটি সুসংবদ্ধ 'চারুকলা কেন্দ্রের' অভাব বুলবুলের দৃষ্টি এড়ায়নি, বিশেষ করে পাকিস্তান হওয়ার পর এই অভাব আরো তীব্র হয়ে উঠে। ঢাকায় এসে বন্ধু-বান্ধব ও মুরব্বিস্থানীয়দের সঙ্গে সে সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করে তিনি সংকল্প করলেন, তাঁর আইডিয়া মতো একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এখানে গড়ে তুলবেন, যা হবে—একাধারে ভাস্কর্য, চারুকলা, সঙ্গীত ও তাঁর নিজস্ব টেকনিক সমৃদ্ধ নৃত্য ইত্যাদি শিক্ষাদানের একটি বিশেষ ও আদর্শ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। তাঁরা সকলেই বুলবুলের এই মহৎ ইচ্ছার প্রতি আগ্রহ দেখালেন। তারপর ১৯৫০, '৫১, '৫৩ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর সাংস্কৃতিক সফরের অপূর্ব সাফল্যে একান্তভাবে বিশ্বাস করেছিলেন যে—অনুরূপ প্রতিষ্ঠান

গঠনের ব্যাপারে বুলবুল দেশবাসীর ঐকান্তিক সমর্থন ও সাহায্য পাবেনই। ময়মনসিংহের মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত স্নেহাংশু কুমার আচার্য বুলবুলের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। স্নেহাংশু বাবু জানতেন বুলবুল 'পূর্ববঙ্গে' কোথাও একটি 'চারুকলা কেন্দ্র' গঠন করতে চান এবং সুযোগ পেলে তিনি অবিলম্বে একাডেমি সম্পর্কীয় কাজে মনোনিবেশ করবেন। স্নেহাংশু বাবুর সঙ্গে এ ব্যাপারে বুলবুল আলাপ আলোচনাও করেছিলেন। তখন স্নেহাংশুবাবু বুলবুলকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, ময়মনসিংহ শহরস্থ তাঁদের 'শশি লজ' নামক প্রাসাদটি তিনি এই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের জন্য দান করবেন। ১৯৫২ সালে তাঁর ব্যবস্থামতো বুলবুল কোলকাতা থেকে তাঁর শিল্পীদের নিয়ে 'শশী লজে' এসে উঠেন আর এই শশী লজেই দ্বিতীয় দফা 'পাকিস্তান' সফর ও ইউরোপ সফরের প্রস্তুতি চলে।

১৯৫০ সালের নবেম্বর থেকে ১৯৫১ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত চট্টগ্রামে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রদর্শনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন চট্টগ্রামের তদানীন্তন বিভাগীয় কমিশনার জনাব এন. এম. খান। তিনিই উদ্যোগী হয়ে নিজের দেশে নৃত্যকলা প্রদর্শনের জন্য বুলবুলকে সাদর আমন্ত্রণ জানান। বুলবুল সানন্দে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন [illegible] নিয়ে চট্টগ্রাম এসে হাজির হন।

Chunati.com
Pioneer in village-based website

বুলবুলের নৃত্যানুষ্ঠান দেখার জন্য সেখানে বিরাট সুধী সমাগম হয়। আনন্দে বিস্ময়ে তাঁরা বুলবুলের সম্পূর্ণ নতুন ধরনের নৃত্যানুষ্ঠান দেখেন, আর স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এই নতুন টেকনিক ও ভাব-সমৃদ্ধ নৃত্যানুষ্ঠানকে অভিনন্দন জানান। সে তো শুধু অভিনন্দন নয়, সে যেন অন্তরের নির্মল ভালোবাসা। ভালোবাসার অর্ঘ্য দিয়ে নিজের দেশের একটি বিস্ময়কর প্রতিভাকে বরণ করে নেওয়া। বুলবুলের সেই অনুষ্ঠান দেশের সংস্কৃতিবানদের মনে এই আশ্বাস জাগাতে সক্ষম হয়েছিলো যে, 'যে দেশে বুলবুলের মত প্রতিভা রয়েছে সে দেশের সংস্কৃতির মৃত্যু হতে পারে না, সে দেশের সংস্কৃতি পিছিয়েও থাকতে পারে না'।

দুই

প্রদর্শনীতে নৃত্য পরিবেশন শেষ করে বুলবুল সারা বাংলাদেশ সফরে বের হন। এই যাত্রায় প্রদেশের অনেক ছোট বড় শহরে ব্যাপকভাবে নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করেন এবং বলাবাহুল্য সব জায়গাতেই বিরাট সাফল্য লাভ করেন। সেদিন জনসাধারণ অত্যন্ত আনন্দ ও আন্তরিকতার সঙ্গেই তাঁকে ও তাঁর দলকে গ্রহণ করেছিলেন। বলতে গেলে—তখন বুলবুলের নৃত্য-বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সকলের এক প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিলো। বুলবুল চৌধুরীকে তাঁরা এক নামেই চিনে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর অর্থ সমাগমও হলো। আমাদের এই গরীব দেশে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এত অর্থ আমদানী হতে পারে, তার আগে কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

একদিন পরম আত্ম-বিশ্বাসে বুলবুল বাবাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন : 'সর্বদা মনে রাখিবেন, আপনার পুত্রের ভবিষ্যৎ চির উজ্জ্বল - - - - আমি যে বিশ্বাস ও আন্তরিকতা লইয়া কাজ করিতেছি, তাহার প্রতিদান আমি পাইবোই - - - -' সেই প্রতিশ্রুতিই যেন এবার সফল ও মূর্তিমান হয়ে তাঁর সামনে দেখা দিলো। সেদিন অর্থ সমাগমের চেয়েও প্রধান ছিলো প্রতিভাবান শিল্পী হিসেবে দেশবাসীর স্বীকৃতি। এই সাফল্যে ছন্দপাগল বুলবুলের মনপ্রাণ আবার যেন আনন্দে নেচে উঠলো।

টাকা পয়সার ব্যাপারে বুলবুল চিরদিনই বেহিসেবি ছিলেন। বিভিন্ন শহরে অনুষ্ঠিত শো'তে কত টাকার টিকিট বিক্রি হলো, সে সব হিসাব-নিকাশ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে থাকতো অন্যান্যের হাতে। বুলবুল কোনোদিন সে সব দেখতে চাইতেন না। এই বিরাট পরিমাণ অর্থ এমনি ভাবে দশ হাত ঘুরে শেষে যে অংশটুকু বুলবুলের হাতে আসতো তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন। কিন্তু নিজের শিল্পীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা এবং তাঁদের প্রাপ্য টাকা-পয়সার ব্যাপারে বুলবুলের সর্তক দৃষ্টি ছিলো সব সময়।

চট্টগ্রামে দ্বিতীয়বার শো করবার সময় অধ্যাপক হাবিবুর রহমানের ছোট ভাই লুৎফরের হাতে 'শো' সম্পর্কীয় কাজের জন্য বুলবুল হাজার দেড়েক টাকা দিয়েছিলেন। নির্দেশিত কাজ শেষ করার পরও তার হাতে বেশ কিছু টাক

Chunati.com Pioneer in village based website

বেঁচে যায়। বুলবুল প্রায় সময়ই লোকজন পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতেন বলে হিসেব বুঝিয়ে দেবার কোন সুবিধা করতে পারছিলো না লুৎফর। কোনো ফাঁকে একটু সুযোগ পেলে সে বলতো: হিসেবটা দেখুন তো টুনু ভাইসাব, অনেক টাকা বেঁচে গেছে, টাকাটাও বুঝে নিন। বুলবুল কিন্তু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অমায়িক হাসি হেসে বলতেন: আরে পাগল, এটা কি হিসেব দেখবার সময় রে? সে হবে অন্য সময়। আপাততঃ তোর কাছে আছে, বেশ আছে, তার জন্য এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেনো? কিন্তু অন্য কোনো সময় আর হলো না হিসেব দিয়ে টাকা বুঝিয়ে দেবার। তারপর বুলবুল দলবল নিয়ে ময়মনসিংহ চলে যান। লুৎফরও পিছনে ধাওয়া করলো। সেখানে পৌঁছে তিন চারদিন পরে একসময় জোর করে বুলবুলকে একপাশে টেনে নিয়ে সে বললো, 'টাকার হিসেবটা নিয়ে এদ্দুর ছুটে এলাম, এবারেও কি দেখবেন না?' আবার সেই প্রাণ খোলা হাসি হেসে বুলবুল জবাব দিলেন: 'আরে, তখন দেখলে কি আর তুই আসতিস্ আমার সঙ্গে? তোকে সঙ্গে নিয়ে আসার জন্যেইতো এই ব্যবস্থা।' এই প্রসঙ্গে জীবনীকারকে এক চিঠিতে লুৎফর লিখেছিলো: '- - - - - - - - - - - - কিন্তু আমি জানি, এ তাঁর কথার কথা। উনি বললে তো আমি এমনিতেই যেতাম। আসলে এ হচ্ছে তাঁর একটি বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য- - - - - - - -'।

১৯৫০'৫১ সালে বুলবুল তৎকালীন পাকিস্তানে ব্যাপকভাবে সাংস্কৃতিক সফর করবার সময়, ইরাণের শাহিনশাহ্ পাকিস্তানে আসেন। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সফরকালে তিনি সিলেট যান শিকারের উদ্দেশ্যে। সরকার সেখানে তাঁর অভিনন্দনের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা করেন। আর সেই ব্যবস্থার অন্যতম অঙ্গ ছিলো একটি সাংস্কৃতিক বিচিত্রানুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের মধ্যমণি হওয়ার জন্য সরকার বুলবুলকে সাদর আমন্ত্রণ জানান। বুলবুল এই আমন্ত্রণ পেয়ে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেন। পারস্য সম্পর্কে বরাবরই বুলবুলের একটি দুর্বলতা ছিলো। পারস্যের গগনচুম্বী অতীত-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যই হলো এই দুর্বলতার কারণ। হাফিজ, ফেরদৌসি, ওমর খৈয়ামের কাব্যে বুলবুল এক অপূর্ব স্বপ্নের আস্বাদ পেয়ে এসেছেন। এই স্বপ্নে বিভোর হয়েই তিনি অমর কবি হাফিজের

Chhanati.com Pioneer in village based website

জীবন-কাব্যকে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃত্যনাট্যের বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। এই বিরাট সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুসরণ করেই বুলবুল রচনা করেছিলেন তাঁর অমর নৃত্যনাট্য 'কবি হাফিজের স্বপ্ন', 'ইরাণের এক পান্থশালায়', 'সোহরাব-রুস্তম'। শাহিনশাহ্ তো সেই ইরাণের অধিবাসী! তাই এই আমন্ত্রণ পেয়ে বুলবুলের আনন্দের সীমা ছিল না। শিল্পী-জীবনের মুহূর্তের অনুভব, মুহূর্তের উপলব্ধির মধ্যে পূর্ব ও উত্তরকালের বাস্তব চেতনাকে আড়াল করে রাখার মতই ছিলো যেন তাঁর এই আনন্দ উদ্দীপনা। বিশ্বের সকল প্রতিভাবান শিল্পীই হয়তো তাঁদের সংগ্রাম এবং সাধনার মধ্যে অনুরূপ মুহূর্তের উপলব্ধিতে নতুন জীবন লাভ করেন। আর এই উপলব্ধির ফলেই বুঝি তাঁরা আবার নতুন করে জীবন সংগ্রামে নামেন, নতুন করে সাধনায় ডুবে যান। এমনি একটি অনুভবেই যেন বুলবুলের সারা দেহ-মন 'নৃত্যের তালে তালে' নেচে উঠেছিলো।

সেই অনুভবের সরোবরে অবগাহন করে উঠেই তিনি শাহিনশাহের সামনে নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন—সারা মঞ্চের ওপর বুলবুল যেন সেদিন ভেসেই বেড়ালেন আর নিজের দেশের ঐতিহ্যের বিরাটত্ব যে এতই বিরাট বুলবুলের নৃত্যনাট্য দেখার আগে শাহিনশাহ্ নিজেও কোনোদিন এমনি ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন কিনা কে জানে। অনুষ্ঠানের শেষে তিনি মঞ্চে উঠে এলেন বুলবুলের সঙ্গে করমর্দন করে তাঁকে অভিনন্দন জানাবার উদ্দেশ্যে। সহৃদয়-অভিনন্দন জানাতে গিয়ে শাহিনশাহের বিমুগ্ধ মনই যেন কথা কয়ে উঠলো: '......I have seen great Ballets in the west......but Bulbul's ballet surpasses them all......He is a great artist......'

তিন

এই যাত্রায় বাংলাদেশ সফর শেষ করে বুলবুল শিল্পীসম্প্রদায় নিয়ে পাকিস্তান' রওয়ানা হন। বাংলাদেশের জনসাধারণ তাঁকে বরণ করে নিয়েছেন।

কিন্তু পাকিস্তানের জনসাধারণ তাঁকে কি ভাবে গ্রহণ করবেন কে জানে। তবুও মনে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই তিনি পাকিস্তানে রওয়ানা হয়ে যান। করাচীতে প্রথম রাত্রির 'শো'তেই তিনি পাকিস্তানীদের কাছ থেকে বিপুল ভাবে সাড়া পেয়েছিলেন। এই সাফল্যের প্রেরণাতেই তিনি পাকিস্তানের লাহোর ও অন্যান্য শহরগুলোতে সাংস্কৃতিক সফর করে বেড়ান এবং সর্বত্র আশাতিরিক্ত ভাবে সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

১৯৫০ সালে তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী কায়েদে মিল্লাত জনাব লিয়াকত আলী খানের আমন্ত্রণক্রমে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুও ঠিক সেই সময় করাচি আসেন—ভাগ্যের সে এক বিচিত্র যোগাযোগ! জনাব লিয়াকত আলি খান কর্তৃক বুলবুল আমন্ত্রিত হন—পণ্ডিত নেহেরুর সম্মানার্থে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য। বুলবুল সানন্দে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। কায়েদে মিল্লাত তখন পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী, তদুপরি পণ্ডিত নেহেরুর মতো বিশ্ববিখ্যাত বিদগ্ধ ব্যক্তির সম্মুখে নৃত্য পরিবেশন করবার সুযোগ পেয়ে সেদিন নিজেকে ধন্য মনে করেছিলেন বুলবুল। এই নৃত্যানুষ্ঠানের শেষে বুলবুলের ভাবসমৃদ্ধ ও বলিষ্ঠ চিন্তাপ্রসূত নৃত্য-ধারাকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে পণ্ডিত নেহেরু বলেন: '......You are indeed a very great artist. I have been thrilled through and through by the newness of your themes, depth of your imagination and above all by the unique performance of yours and also of your artists......'

Ghunati.com
Pioneer in village based website

আর কায়েদে মিল্লাত জনাব লিয়াকত আলী খান পণ্ডিত নেহেরুর কথার পূর্ণ সমর্থনে যে কয়টি কথা দিয়ে বুলবুলকে পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সুস্বাগতম জানালেন তা-ও বিশেষ অর্থপূর্ণ: '......you are the very spirit of culture in Pakistan ......'

কোনো শিল্পীর জীবনে পণ্ডিত নেহেরু এবং জনাব লিয়াকত আলী খানের আন্তরিক অভিনন্দন ও স্বীকৃতির চাইতে বড় পুরস্কার আর কি হতে পারে! এই উভয় নেতা তাঁদের অভিনন্দন-বাণীর মাধ্যমে বুলবুলের প্রতিভার মৌলিকতা ও শ্রেষ্ঠত্বকেই স্বীকৃতি জানিয়েছেন। 'যে আন্তরিকতা ও বিশ্বাস' নিয়ে বুলবুল

এতদিন ধরে কাজ করে আসছিলেন এর চেয়ে তার বড় প্রতিদান আর কিছুই হতে পারে না!

প্রথমবার বাংলাদেশ সফরের সময় থেকেই দেশের পত্র-পত্রিকা ক্রমাগত বুলবুলের নৃত্যকলা সম্পর্কে সপ্রশংস আলোচনা করে তাঁকে অভিনন্দন জানাতে থাকে। ১৯৫০ সালে প্রথমবার নৃত্যানুষ্ঠানের সময় ঢাকায় জনপ্রিয় দৈনিক 'পাকিস্তান অবজারভার' বুলবুলের নৃত্য সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন : '......The dance performance unique of its kind as it is, is not only delightful recreative and intersting but instructive and profoundly educative and philosophic.

...... In the realm of dance Bulbul undoubtedly occupies distinct position and has in him the potentiality of inspiring people..........

ঢাকার মর্নিং নিউজ পত্রিকা বুলবুলের নৃত্যকলাকে সামগ্রিকভাবে একটি "Harmonious Blending of Islamic and Indian Culture..." বলে বর্ণনা করে।

Chunati.com
Pioneer in village based website

পাকিস্তান সফর কালে সেখানকার উর্দু ও ইংরেজী পত্র-পত্রিকাও বুলবুলের ভাবসমৃদ্ধ নৃত্যকলাকে ব্যাপকভাবে অভিনন্দিত করেন।

বুলবুলের পাকিস্তান সফর শেষ হওয়ার পর করাচীর 'ডন' পত্রিকা বুলবুলকে জাতীয় শিল্পী হিসেবে অভিনন্দিত করতে গিয়ে বলেন :

'......Bulbul is a national artist, not just because he enjoys a nation wide fame but also because he reflects and protrays through the media of movement and music the ideas and aspirations of the nation ....'

লাহোরে নৃত্য প্রদর্শনকালে স্থানীয় প্রাচীনতম ইংরেজী পত্রিকা 'Civil and Military Gazette' এ* বুলবুলের নৃত্য সম্পর্কীয় একটি সাক্ষাৎকার

* রুডইয়ার্ড কিপলিং যৌবনকালে এই পত্রিকার সহ-সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছিলেন।

বিবরণী প্রকাশিত হয়। সাক্ষাৎ কিন্তু বুলবুলের সঙ্গে নয়। সাক্ষাৎটা ছিলো শিকাগো নগরীর বিখ্যাত 'Gledys School of Ballet'-এর অধ্যক্ষ Gledys Hight-এর সঙ্গে। ইনি জে. আর্থার র‍্যাঙ্ক চিত্র নিবেদনের অন্যতম ছায়াচিত্র 'The Red Shoes'-এর নায়িকা মিস্ ময়রা শীয়ারের নৃত্য শিক্ষক ছিলেন। বুলবুলের নৃত্যানুষ্ঠান দেখার পর 'গ্যাজেট' পত্রিকার প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মিঃ হাইট বলেন :······

'...... The Ballets of Bulbul Chowdhury would attract big audience in the United States and Canada. ......He would easily be able to impress the people in other countries with his 'very good performance ......'

লাহোরের সবচেয়ে জনপ্রিয় ইংরেজী দৈনিক 'পাকিস্তান টাইমস' বলেন :

'......At a time when such dark clouds were hanging heavy on the cultural horizon of Pakistan, Bulbul Chowdhury appeared as a silver lining with his pioneering spirit of building up the edifice of this beautiful art from its dilapidated ruins.

... . Bulbul has shown remarkable genius for synthesis and assimilation for the various dance techniques and for experimenting with new forms of his own creation. He has shown great courage of a rebel in breaking away from the treatments of traditional and conventional classical forms and evolving the art on radically novel lines .....

......Pakistan will remain grateful to him for giving sublime inspiration and interpretation to the art of dancing which was regarded as a form of luxury.....'

পত্র-পত্রিকার অভিনন্দনের চাইতেও বড় কথা হলো জনসাধারণের আন্তরিক প্রীতি ও তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি। তৎকালীন পুর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে অনেকেই বুলবুলের সম্মানার্থে আয়োজিত বিভিন্ন চা-চক্র ও প্রীতি-ভোজের সমাগমে

ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে অন্তরের নির্মল ভালোবাসা ও প্রীতি দিয়ে অভিনন্দিত করেছেন তাঁদের জাতীয় শিল্পীকে। সেই উষ্ণতাতেই বুঝি দেশ-দরদী শিল্পীকে আরো দরদী ও বিনত করে তুলেছিলো।

এমনি করে বুলবুল সমগ্র জাতির স্বীকৃতি পেলেন। নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরী 'পাকিস্তানের' জাতীয় নৃত্যশিল্পী হিসেবে সারা দেশের শত-সহস্র সংস্কৃতামোদী দেশবাসীর অন্তরে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার আসন লাভ করলেন।

পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের বিভিন্ন স্থানের সুধীবৃন্দ তাঁকে দেশ ভাগ হওয়ার অনেক আগেই প্রতিভাবান নৃত্যশিল্পী বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। সে সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই বলেছি। এখন 'পাকিস্তানের' অবিসংবাদিত 'জাতীয় শিল্পী' বলে স্বীকৃতি পাওয়ার পর—বুলবুলের দৃষ্টি প্রসারিত হলো সমুদ্র পারের দেশগুলোর দিকে—যে দেশের মাটি শেলী, কীটস্, বায়রন, শ' আর এমিল-জোলা ও রম্যা রলাঁর স্মৃতিসমৃদ্ধ। নিজের মহান দেশে সাফল্যের জয়মাল্য পাওয়ার স্বপ্ন সফল হওয়ার পর ইউরোপের অসংখ্য মনীষীর মিলনতীর্থ লণ্ডন, প্যারী, বার্লিন, মস্কো ও রোমের সর্বত্র তার শিল্পের অর্ঘ্য নিবেদন করতে না পারা পর্যন্ত বুলবুলের শিল্পআত্মা স্বস্তি পাচ্ছিলো না।

সমুদ্র পাড়ি দেবার কথা মনে চেপে বসার পর তিনি যেন আরো অস্থির হয়ে উঠলেন। এই অস্থিরতার প্রধান কারণ হলো অর্থাভাব। তদানীন্তন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে শো করে মোটা অঙ্কের যে অর্থ আমদানী হয়, শিল্পীদের থাকা-খাওয়া ও পারিশ্রমিক দিতেই তার প্রধান অংশ ব্যয় হয়ে যায়। টাকা-পয়সার প্রতি বুলবুলের এই উদাসীনতার কারণ হলো তাঁর মানসিক উদারতা। ১৯৪৪ সালে বুলবুল কনিষ্ঠা সহোদরার কাছে এক পত্রে লিখেছিলেন: '- - - অপরিমিত অর্থের প্রতি আমার কোনো কালেই টান নেই। ভদ্রভাবে বাস করতে পারলেই আমি সুখী থাকবো। বাহুল্য-বর্জিত জীবনটা যেন কালের বুকে একটা গভীর দাগ কেটে যায় - - -'!

বুলবুলের জীবন দর্শন এই ক'টি কথার মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে। বিলাস বহুল জীবন যাপনের ইচ্ছা থাকলে, বিত্তবান হতে চাইলে তিনি তা অর্জন করতে পারতেন। ১৯৪৭-৪৮ সালের দিকে বুলবুল ভারতের প্রখ্যাত চিত্র

Chunati.com
Pioneer in village based website

পরিচালক অমলেন্দু মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'কৃষাণ' ছবিতে তিন নায়কের মধ্যে এক নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। পশ্চিম বঙ্গের উন্নতমানের পত্রিকা 'দেশ' বুলবুলের অভিনয় সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন: বুলবুল চৌধুরী মূলতঃ নৃত্যশিল্পী, কিন্তু অভিনয়েও তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

কৃষাণ ছবিতে অভিনয় করার পর পরই বোম্বের খ্যাতনামা পরিচালকদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ছবিতে নৃত্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব আসতে থাকে। কিন্তু শিল্পকে নিজের কাজে না লাগিয়ে তিনিই বরং নিজেকে শিল্পের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। সুতরাং যশ আর সুনিশ্চিত অর্থের প্রলোভন তাঁর মনকে নাড়া দিতে পারেনি।

পরে বুলবুলের এই মত যদি পরিবর্তিত হতো তবে জীবনে যখন অর্থের প্রাচুর্য এসেছিলো এবং ছবির জগত থেকে ডাক এসেছিলো, সে ডাকে তিনি সাড়া দিতেন। তা হলে বারবার ঋণ করে ঋণ শোধ করবার চিন্তায় তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট হতো না। সুতরাং বিদেশ যাত্রার স্বপ্ন চোখে বাসা বাঁধবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থের সমস্যা আবার দেখা দেয় বিরাট হয়ে। এত বড় শিল্পীদল নিয়ে বিদেশে পাড়ি দেওয়া তো দূরের কথা, লণ্ডনে গিয়ে সেখানকার সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়ে নিজের 'শো' সম্পর্কীয় প্রাথমিক ব্যয়ের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন সেই অর্থও তো বুলবুলের হাতে ছিলো না। তাই অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় বারবার করাচী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, কোলকাতা আসা যাওয়া করতে হয়েছিলো তাঁকে। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা চলে, তাঁরা বুলবুলকে এই অর্থ জোগাড় করে দেওয়ার জন্য আন্তরিক ভাবে চেষ্টাও করেছিলেন।

ইউরোপ যাবার তাগাদা অনুভব করার সাথে যাঁর অভাব বুলবুলের মনে তীব্রতর হয়ে উঠলো, তিনি হলেন লিয়াকত আলী খান। বুলবুলের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তিনি একদিন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন: 'আমি তোমাকে পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক দূত হিসেবে বিশ্বের প্রতিটি দেশে পাঠাবো······'। দূরাগত সঙ্গীতের ক্ষীণ রেশের মত সেই আশ্বাসবাণী তখনও বুলবুলের কানে বাজছিলো।

বুলবুলের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন অনেকের ধারণা, জনাব লিয়াকত আলী

বেঁচে থাকলে তিনি সরকারী খরচে বিদেশ পাঠাতেন। আর বিশ্ব সংস্কৃতিতে বুলবুল একটা আসন লাভ করার সুযোগ পেতেন। প্রধান মন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী খানই সেই সুযোগ করে দিতেন। বুলবুল যেমন জনাব লিয়াকত আলীকে ব্যক্তিগত ভাবে শ্রদ্ধা করতেন, তিনিও বুলবুলকে অত্যন্ত ভালো-বাসতেন। এবং শিল্পী বুলবুলের গুণমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন তিনি। কিন্তু ভাগ্যের এমন খেলা তো বুলবুল সারা জীবন ধরেই দেখে এসেছেন, আগেও যেমন তিনি দমেননি এবারও তিনি দমলেন না। যেমন করেই হোক, অর্থ তাঁকে সংগ্রহ করতেই হবে, প্রয়োজন হলে ঋণ করেও।

॥ চার ॥

বুলবুলের সেই উদ্বেগ ও দুঃশ্চিন্তার মুহূর্তে বুলবুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্ধু তাঁর বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করে দিলেন। বুলবুলের এই মহানুভব বন্ধু হলেন জনাব এস. জামান [illegible]। বুলবুলের প্রয়োজন ও দুঃশ্চিন্তার কথা জানতে পেরে স্বেচ্ছায় তিনি বুলবুলের বিলাত-যাত্রার পথ সুগম করে দিলেন। জামান সাহেবের বন্ধু-বাৎসল্য ও শিল্পানুরাগ বুলবুল-জীবনীতে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

'শো' সংক্রান্ত ব্যাপারে ১৯৫২ সালে বুলবুল লণ্ডন যাত্রা করেন। সেখানে পৌঁছানোর দিন কয়েক পরে তিনি তাঁর প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ দে'র কাছে একখানা চিঠি লেখেন।

শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ দে'র সঙ্গে বুলবুলের সম্পর্কের কথা চিন্তা করতে বসলে মনে হয়, বুঝিবা তার যথার্থ পরিচয় চিত্রণ সম্ভব নয়—ছাত্রজীবন থেকে জীবনের শেষ দিনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বুলবুল হরিনারায়ণ বাবুর অকৃত্রিম স্নেহ-ভালো-বাসা পেয়ে এসেছেন। তিনি একাধারে বুলবুলের ভাই, বন্ধু ও সখা। বুলবুলের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গেও তিনি ছিলেন জড়িত। বুলবুলকে স্মরণ করে আজও তিনি হৃদয়ের বেদনাকে ঢাকতে পারেন না। বিলাত ও ইউরোপের অন্য দেশ সফর সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি ছিলেন বুলবুলের উপদেষ্টা, পরামর্শদাতা

উৎসাহ দাতা এবং দায়-দায়িত্ব বহনকারী। বিলাত পৌঁছানোর কয়েকদিন পরে লণ্ডনের 'এওস্লী হোটেল' থেকে ১৭ই আগস্ট, ১৯৫২ সালে বুলবুল হরিনারায়ণ বাবুকে লিখেছিলেন :

'প্রিয় হরিনারায়ণ,

'......'ইমপ্রেসারিও' সম্বন্ধে বলছি, তুমি শুনে খুবই খুশি হবে যে, মিঃ পিটার ডবনী (ইনি যুক্তরাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইমপ্রেসারিও) আমার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছেন। ওঁর সাথে চুক্তিসম্পর্কীয় আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছি। কিন্তু মনে হচ্ছে ওঁর শর্তগুলো ভয়ানক কড়া। উনি চান আমি ওঁকে জামানত হিসেবে দশ হাজার টাকা আগাম দিই। ওঁর ইচ্ছা লণ্ডনে তিন হপ্তা এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছয় হপ্তা ধরে আমার নৃত্যনাট্য পরিবেশন করা। এছাড়া আমাদের 'ব্যালে' যদি সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়, তাহলে আরো অতিরিক্ত চব্বিশ হপ্তা ধরে যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে দ্বিতীয় দফা নাচ পরিবেশনের জন্যেও চুক্তি স্বাক্ষর করতে চাননি তিনি।

'খোলাখুলি ভাবে বলতে গেলে, আমি পিটার ডবনীর সাথেই চুক্তিবদ্ধ হতে ইচ্ছুক—কেনোনা তিনিই 'ক্যাথারিন ডানহ্যাম' 'যুগোশ্লাভ ষ্টেট্ ব্যালে' 'বিঙ্গ ক্রসবি' 'এন্টনিও' এবং 'রোসারিও'-র মত শিল্পীবৃন্দকে ইউরোপের এই অংশে উপস্থিত করেন। সুতরাং, তাঁর সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে পারলে আমার ব্যালেও অর্ধেক সফল বলে বিবেচিত হবে।

'......এখানে মিষ্টার হেক্টর বলিথো* নামে এক জীবনীকার আছেন যিনি মিষ্টার ডবনীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমি তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। এখানে আমার শো'র ব্যাপারে মিঃ বলিথো মিঃ ডবনীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছেন।

'শোন, এখানকার সর্বপ্রিয় সান্ধ্য পত্রিকা 'দি ইভ্নিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড' গত পরশু-দিন আমার ব্যালে সম্পর্কে পুরো এক কলম ব্যাপী সংস্কৃতি-সংবাদ ছেপেছে। মিঃ নাসিম (ইনি 'ডন' পত্রিকার লণ্ডনস্থ প্রতিনিধি) নামে আমার এক সাংবাদিক বন্ধু এক লাঞ্চে জনপ্রিয় 'লণ্ডন-রোজনামচা' লেখক মিঃ আর, হাচিনসন-এর

* ইনি কায়েদে আযমের জীবনীকার

Chunati.com
Pioneer in village based website

সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। মিঃ হাচিনসন আমাকে দেখে ও আলাপ করে এত সন্তুষ্ট হয়েছেন যে তিনি এসব ব্যাপারে সব দিকে আমাকে সাধ্যমতো সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন······'

এই চিঠি লেখার দিন বিশেক পরে করাচী ফিরে এসে বুলবুল হরিনারায়ণ বাবুকে আর একখানা চিঠি লেখেন :

'-------করাচী ফিরে এসেছি। তুমি শুনে খুশি হবে যে, 'পিটার ডবনী প্রেজেনটেশনস্ লিমিটেডের' সাথে ২৭শে আগস্টে আমি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করে এসেছি।

'প্যারী ও রোম হয়ে আমি দেশে ফিরলাম। সত্যি, পুরো যাত্রাটা অত্যন্ত আনন্দে কেটেছে। প্যারীতে ছিলাম দু'দিন। রোমে ছিলাম মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা। প্যারী হলো চটুল আনন্দের দেশ। জীবনধারণ বড় ব্যয়সাপেক্ষ সেখানে। রোম অবশ্য এমন এক নগরী যেখানে চিরকালের সম্ভ্রম মনে না নিয়ে কেউ ঢুকতে পারে না। অতীত মাহাত্ম্য ও প্রাচীন গৌরবময়তার জন্য রোমকে আমি ভালোবাসি।

Chhuati.com Pioneer in village based website

'করাচীতে বসে সরকারের কাছে কিছু অর্থ-সাহায্য পাওয়ার চেষ্টা করছি। হয়তো এখানে হপ্তাখানেক থেকে যেতে হবে। আমার টাকার প্রয়োজন এবং যে করেই হোক তা আমাকে যোগাড় করতেই হবে। এই ব্যাপারে ইতি-মধ্যে উচ্চপদস্থ সরকারী চাকুরেদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেছি----

''ডন' পত্রিকার লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা আমার সম্বন্ধে একটি অতি চমৎকার বিবরণী পাঠিয়েছিলেন। আমি এখানে আসার দিন কতক আগে তা ডনে ছাপা হয়েছে। আগামীকাল এখানকার বিভিন্ন সাংবাদিক এবং সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করছি।

'প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আরো দু'একদিন সময় লাগতে পারে। আজ রাত্রে অবশ্য অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি।

'আগামী বছরের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে আমাদের বিলাতে হাজির হতে হবে। কিন্তু বিলাত যাত্রার পূর্বে আমি কিছু টাকা পয়সা জোগাড় করে নিতে চাই, ডিসেম্বর ও জানুয়ারীর দিকে যাতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান সফরে

বেরুতে সক্ষম হই তার জন্য যথাশীঘ্র সম্ভব শিল্পীদলটিকে আমি তৈরী দেখতে চাই- - - - - - -'

পাঁচ

যথাসাধ্য চেষ্টা চরিত্র করেও বুলবুল করাচীতে সরকারের তরফ থেকে কোন রকম সাহায্য পেলেন না। আবার দুশ্চিন্তা চেপে বসলো মনের ওপর —কেনোনা নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই চুক্তি অনুযায়ী জামানত হিসেবে দশ হাজার টাকা দিতেই হবে। এই সময় বুলবুল হোটেল মেট্রোপোলে এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেন। যথা স্থানে তার উল্লেখ করা হয়েছে। এই সম্মেলনে তিনি শিল্প ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে নিজের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যাপারে সরকারের উদাসীনতার কঠোর সমালোচনা করতেও ছাড়েননি।

করাচী ত্যাগ করার আগে চিন্তাভারাক্রান্ত মন নিয়ে বুলবুল বেগম লিয়াকত আলীর সঙ্গে দেখা করতে যান। তাঁর জান্নাতবাসী স্বামী পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক দূত হিসেবে বিভিন্ন দেশে পাঠাবেন বলে তাঁকে যে আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বেগম লিয়াকত আলী তা জানতেন। তাই তিনি অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে বুলবুলের সব কথা শুনে তাঁকে আশ্বস্ত করতে গিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে প্রতিশ্রুতি দেন, যে উপায়েই হোক এই অর্থ তিনি সংগ্রহ করে দেবেন—প্রয়োজন হলে তার জন্য দরজায় দরজায় ভিক্ষা করতেও তিনি কুণ্ঠিত হবেন না। তাঁর আশ্বাস পেয়ে বুলবুলের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনের আকাশে আবার আশার আলো ফুটে উঠলো।

করাচীতে আর বসে থাকা সম্ভব নয়। বেগম লিয়াকত আলীর সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি কোলকাতা রওয়ানা হওয়ার দিন ঠিক করেন। বেগম সাহেবা তাঁকে আবার আশ্বাস দিলেন : তোমার এই প্রয়োজনের কথা আমি ভুলবো না, তুমি নিঃসংশয় থেকে নিজের কাজে মন দাও।

Ghunati.com
Pioneer in village based website

শেষ পর্যন্ত যাবার সময় এলো। বেগম লিয়াকত আলী যে তাঁর কথা রাখবেন সে সম্বন্ধে বুলবুলের মনে একটুও সংশয় ছিলো না। কিন্তু কখন, কতদিনে যে তিনি এই অর্থ সংগ্রহ করে উঠতে পারবেন সে সম্পর্কে সঠিক কোনো ধারণা বুলবুল করতে পারেননি। কোলকাতা ফিরে যাবার দিন বিমান বন্দরের 'লাউঞ্জে' বসে সেই একই কথা ভাবছিলেন তিনি। যথাসময়ে বিমানে উঠবার জন্য তিনি ধীর পায়ে এগুচ্ছিলেন, এমন সময় একজন লোক এসে বুলবুলের হাতে একটি 'বন্ধ খাম' তুলে দেয়। অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে বুলবুল খামটি হাতে নিলেন কিন্তু লোকটি বুলবুলকে কিছু জিজ্ঞাসা করবার অবকাশ না দিয়ে মুহূর্তে চলে গেলো। এদিকে বিমান ছাড়বার সময় হয়ে গেছে, সুতরাং আর দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। নিজের আসনে বসতে বসতে বুলবুল এই বন্ধ খামটি সম্বন্ধে সম্ভব, অসম্ভব নানা কথা ভাবছিলেন, আর মুহূর্ত মাত্র দেরী না করে এবার খামটি খুলে ফেললেন--কিন্তু এতো চিঠি নয়—এ যে বেগম লিয়াকত আলীর স্বাক্ষরযুক্ত বুলবুলের নামে লিখিত করাচীর 'লয়েডস্ ব্যাঙ্কের' ওপর দশ হাজার টাকার একখানা চেক। তাও আবার শুধু 'বিয়ারার' চেক! বুলবুলের মন ভরে উঠলো যুগপৎ আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায়। বেগম লিয়াকত তাঁকে কত বিশ্বাস করেছেন। তাঁর শিল্প ও স্বপ্নের প্রতি বেগম সাহেবার অকুণ্ঠ সমর্থন ও অনুরাগ দেখে বুলবুলের মন ভরে উঠলো খুশী ও গৌরবে। শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় সালাম জানালেন এই স্নেহময়ী নারীর উদ্দেশে।

বুলবুলের প্রতি বেগম লিয়াকত আলী খানের এই সস্নেহ সাহায্যের কথা বুলবুলের কয়েকজন অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছাড়া আর হয়তো কেউ জানে না। এই সাহায্যের মধ্যে বুলবুল দেখেছিলেন সর্বজনীন মাতৃরূপিনী নারীর অশেষ ও অকৃত্রিম স্নেহ। বুলবুল বেঁচে থাকলে হয়তো তাঁর সৃজনশীল প্রতিভার দীপ্তিতে এই স্নেহময়ী নারীর শিল্পানুরাগ ও স্নেহকে অমর করে রাখতেন। গোর্কীর 'মা' আর মাইকেল এঞ্জেলোর 'ম্যাডোনা' যেমন বিশ্বের প্রতিটি দেশের বিদগ্ধ-চিত্তে স্থান করে নিয়েছে, বুলবুলের সেই সৃষ্টিও হয়তো তেমনি আসনই লাভ করতো। কিন্তু বুলবুল সে সময় পাননি—দু' একজন অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছে

Chunati.com Pioneer in Village Based website

অনুরূপ একটি ইচ্ছা প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছু করে যাবার সময় তাঁর হয়নি।

বেগম লিয়াকত আলীর এই অর্থ দিয়ে বুলবুল চুক্তির শর্ত রক্ষা করেন। তারপর সেই বছরই—১৯৫২ সালে কোলকাতায় 'নিউ এম্পায়ারে' শেষবারের মত বুলবুল একটি নৃত্যানুষ্ঠান মঞ্চস্থ করেন। এই কোলকাতাতেই প্রায় ষোল সতেরো বছর পূর্বে বুলবুল একদিন সার্থক নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে জীবনের প্রধান আরাধ্য ও উপজীব্য বস্তু হিসেবে 'নৃত্যশিল্প'কে বেছে নিয়েছিলেন। অজ্ঞাত মনের তাগিদেই বুঝিবা শেষবারের মত কোলকাতার রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। বিমুগ্ধ দর্শকমণ্ডলী তরুণ শিল্পী বুলবুলের পরিপূর্ণ শিল্পী সত্তার বিকাশই যেন সেদিন দেখতে পেলেন ১৯৫২ সালে, বুলবুলের সেই নৃত্যানুষ্ঠানে। কিন্তু তাঁরা তো তখন বুঝতে পারেননি যে, তাঁর চঞ্চল চরণছন্দ আর কোন দিন তাদের সামনে এমন করে নুপুর-নিক্কন তুলবে না। সেদিন সেই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কোলকাতার সুধী সমাজকে বুলবুল তাঁর শেষ তসলিমই জানিয়েছিলেন বুঝি।

Chunati.com
Pioneer in village based website

১৯৫০ থেকে ১৯৫৪ সালের সেই অস্থিরকালের চিরনিদ্রার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত বুলবুল একটি রাতও সুস্থির হয়ে ঘুমাতে পারেননি। আর্থিক, মানসিক ও শারীরিক দুশ্চিন্তা বুলবুলের অঙ্গের ভূষণের মতোই হয়ে উঠেছিলে। এবারে তাঁকে পেয়ে বসল ইউরোপ যাত্রার পাথেয় সংগ্রহের চিন্তা। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে (সাবেক) আবার নৃত্য মঞ্চস্থ করে এবং নৃত্য নিবেদনের মাধ্যমে পাথেয় সংগ্রহের সংগ্রাম। মানুষের নিষ্ঠাপূর্ণ কাজের কাছে তার ভাগ্য চিরদিন হার মেনে এসেছে—বুলবুলের সংক্ষিপ্ত জীবন তারই জ্বলন্ত উদাহরণ। দেশের জনসাধারণ তাঁদের জাতীয় নৃত্যশিল্পীকে এবার যেন আগের চাইতেও বৃহত্তর অভিনন্দন জানালেন। প্রিয়দর্শন, মিষ্টভাষী বুলবুলকে সকলেই ভালোবাসতেন তার উপর বুলবুলের প্রতিভা, বুলবুলের সৃষ্টি তাদের সেই ভালোবাসার মধ্যে শ্রদ্ধার যোগসাধন করেছিলো। বাংলাদেশের ছোট বড় শহরগুলোতে—পাবনা, সিরাজগঞ্জ, কুমিল্লা, বরিশাল, বগুড়া, টাংগাইল, চট্টগ্রাম, ঢাকা এসব জায়গাতে বুলবুলের 'শো' দেখতে হাজার হাজার মানুষ ভিড় করে আসে। 'মন্বন্তর' ও 'কবি হাফিজের' স্রষ্টার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হবার জন্য সে কি আগ্রহ তাদের!

বুলবুলও তাঁদের সে আগ্রহকে সুন্দর সৌজন্য দিয়ে সার্থক করেছেন। বুলবুলের সৃজনী প্রতিভার চাইতে তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য কোনো অংশে কম ছিলো না, বরং বুলবুলের মতো মধুর চরিত্র প্রতিভাবানদের মধ্যে বিরল বললেই চলে। তাঁর জনপ্রিয়তার বিশেষ একটি কারণও এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সেইবার 'পূর্ব পাকিস্তানে' নৃত্য-পরিবেশনের সময় বুলবুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃত্যনাট্য 'পাছে আমরা ভুলে যাই' সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

ছয়

ইউরোপ যাত্রার প্রাক্কালে বাবার 'কবর জেয়ারত' করার জন্য আর তাঁর নামে একটি জেয়াফৎ দেবার জন্য বুলবুল এক ফাঁকে চুনতির বাড়িতে ছুটে আসেন। সকলের অগোচরে থেকে যে মহাশক্তি মানুষকে পরিচালিত করেন, তাঁরই ইঙ্গিত ছিলো বুঝি এই জেয়াফতের পেছনে। বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই বলেছিলেন: এত ব্যস্ততার মধ্যে এখন জেয়াফতের ঝামেলায় গিয়ে কাজ নেই, ইউরোপ থেকে ফিরে এসেই বুলবুল যেন জেয়াফতের কাজে নামেন। কিন্তু শত ব্যস্ততার মধ্যেও বুঝি অজ্ঞাত মনের তাগিদেই তিনি জেয়াফতের সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছিলেন॥

বুলবুল চিরদিন নিজের গ্রামকে ভালোবাসতেন, গ্রামের প্রতিটি মানুষকে—ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলকে ভালোবাসতেন। কোনো উপলক্ষ ছাড়া এইসব আত্মীয় কুটুমদের এক জায়গায় জড় করা সম্ভব নয় বলেই হয়তো সেই ব্যস্ততার মধ্যেও জেয়াফতের কাজে হাত দিয়েছিলেন। গ্রামের জেয়াফতের দায়-দায়িত্বের অন্ত নেই। বিয়ের জেয়াফত হোক অথবা মৃতের জেয়াফত হোক—জেয়াফত হলেই হলো। কিন্তু বুলবুলের উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছিলো। দূর দূরান্তের গ্রাম থেকেও বাবার জেয়াফতে আত্মীয় কুটুম্বদের আনানো হয়েছিলো। আর তাঁদের নিয়ে জেয়াফতের কয়েকটা দিন কিভাবেই না কেটে গেলো। পরম আন্তরিকতা, সৌজন্য ও সম্প্রীতির

Chunati.com

সাথে বুলবুল সকলের খবরদারি করলেন। বুলবুলের আন্তরিক ব্যবহারে ঘর-বাড়ি ভরে উঠলো। কিন্তু কিসের জন্য যেন কিছুতেই ঠিক জমে উঠছিলো না। এত হৈ চৈ হট্টগোলের মধ্যেও বুলবুল চোখ এড়িয়ে নিজের কামরায় এসে চুপটি করে একলা বসে থাকতেন। মুহূর্তেই হয়তো তাঁর খোঁজ পড়তো, তখন তাঁকে খুঁজতে এসে দেখা যেতো—মুখখানা অন্ধকার করে একলাটি বসে আছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করলে হাঁ, না একটা কিছু বলে ব্যাপারটাকে সেখানেই শেষ করে দিতেন। পরে সকলেই বুঝেছিলো বুলবুলের সেই বিষাদের কারণ কত বাস্তব, কত সত্য, কত রূঢ় ? কিন্তু কেউ সেদিন তা কল্পনাও করতে পারেনি।

শেষ পর্যন্ত জেয়াফতের কাজ সম্পন্ন করে, সকলের অজান্তে, সকলের কাছেই বিদায় নিয়ে এলেন—সেই জেয়াফতের রাতে ঝাড়-বাতির আলো যে নিভে গেলো, সে আলো আর কখনো জ্বললো না। আর তিনি নিজের গ্রামে যাবার সুযোগ পাননি।

Chunati.com
Pioneer in village based website

তারপর বুলবুল পুরো 'ট্রুপ' নিয়ে ইউরোপ যাত্রার পথে পশ্চিম পাকিস্তান এসে হাজির হন এবং বিভিন্ন স্থানে নৃত্যানুষ্ঠান মঞ্চস্থ করেন। দেশীয় সংস্কৃতির কি বিশেষ রূপটি বুলবুল ইউরোপ মহাদেশের সুধীসমাজের সামনে তুলে ধরতে যাচ্ছেন, তা দেখার জন্য তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের উৎসুক শিল্পামোদীরা ভীড় করে এলেন বুলবুলের অনুষ্ঠানে। বুলবুল পাকিস্তানের সর্বশেষ নৃত্যানুষ্ঠান মঞ্চস্থ করেন করাচীর 'খাট্রাক হলে'। এই অনুষ্ঠানের পরেই তিনি একুশজন শিল্পীর একটি দল নিয়ে 'এস. ভি. ভিক্টোরিয়া' জাহাজযোগে ইউরোপ যাত্রা করেন। নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলো বুলবুলের একমাত্র কন্যা নার্গিস। তখন তার বয়স মাত্র সাড়ে পাঁচ বছর। ইতিমধ্যে নার্গিস তার শিল্প প্রতিভায় দর্শকদের মোহিত করতে সক্ষম হয়েছে। সেই ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে নার্গিসও চললো বাবার সঙ্গে শিল্পীদের একজন হয়ে। তাছাড়া স্ত্রী আফরোজাও তাঁর স্বামীর অনুগামী হলেন।

বুলবুলের শিল্প-গুণ-মুগ্ধ এক বন্ধু—জনাব এস. এম. কাজমী বুলবুলকে যেমন ভালোবাসতেন, তেমনি ভালোবাসতেন 'আর্টকে'। বুলবুলের অর্থাভাবের

কথা তিনি জানতেন। বিলাত যাত্রার সময় বুলবুলের হাতে একটি টাকার তোড়া দিয়ে তিনি বলেছিলেন : 'বুলবুলের গুণমুগ্ধ বন্ধু হিসেবেই তিনি এই টাকাটা দিচ্ছেন—গৃহীত হলে আন্তরিক ভাবে খুশী হবেন'। টাকাটা গ্রহণ করতে গিয়ে বুলবুল কৃতজ্ঞতায় ভাষা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর শিল্পানুরাগী বন্ধুরা তাঁকে, তার আর্টকে, তার আদর্শকে কি গভীর ভাবেই না ভালোবাসে! বন্ধুদের এই ভালোবাসার মূল্য নির্ধারণ করবে কে! টাকার কাঙ্গাল কোনো দিনও ছিলেন না বুলবুল, কাঙ্গাল ছিলেন ভালোবাসার। তাতো তিনি পেয়েছেন, দেশের সাধারণ মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসা তিনি পেয়েছেন। এদিক দিয়ে তিনি পরম সৌভাগ্যবান ও সার্থক।

জনাব কাজমী ছিলেন করাচীর একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। ১৯৫৮ সালে করাচীতেই তিনি এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে মারা যান।

দেশের অসংখ্য গুণমুগ্ধ বন্ধু ও ভক্তের শুভেচ্ছা নিয়ে ১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে করাচী বন্দরের ওয়েস্ট হোয়ার্ফ থেকে 'লয়েডস'-এর অন্যতম বৃহৎ জাহাজ এম. ভি. ভিক্টোরিয়াযোগে [illegible] শিল্পী-বৃন্দ বিদেশে যাত্রা করেন।

'ভিক্টোরিয়া' আরব সাগরের বুকে অতিকায় রাজহংসীর মতো ভেসে চললো মনীষীদের মিলন-তীর্থ ইউরোপের উদ্দেশ্যে। আরব সাগর, লোহিত সাগর, সুয়েজ খাল আর ভূমধ্যসাগরের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের আঘাতে আঘাতে, কখনো বা শান্ত জলধির দোলায় দোলায় 'ভিক্টোরিয়া' এগিয়ে চললো। বুলবুলের চোখে সর্বক্ষণই এক অপূর্ব স্বপ্ন ভাসছিলো। শিল্পীর চোখ দুটো এদিকে এডেন ও লোহিত সাগর, সুয়েজ খালের তীর, ওদিকে পোর্ট সৈয়দ ও জেনোয়ার নানা জাতের উৎসুক জনসমাবেশের মধ্যে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিলো শুধু—ক্রমে একদিন ইতালীর তীরভূমি শ্যামলিমায়ায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। এই সেই ইতালীর তীরভূমি,—রোমান্টিক যুগের ইংরেজ কবিরা আজীবন যাঁর স্বপ্ন দেখে এসেছেন—যা ছিলো তাঁদের মহাতীর্থ। বুলবুলের চোখেও যেন বিরাট এক বিস্ময় নিয়ে দেখা দিলো সেই তীরভূমি। সমুদ্র-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বুলবুলের স্মৃতির পুঁজিকে হয়তো সমৃদ্ধতর করে তুলছিলো—

হয়তো সমুদ্রযাত্রার সামগ্রিক রূপটি তিনি রঙধনুর রঙ মাখিয়ে, মনের ইজেলে চিত্রিত করে রাখছিলেন, সময় মতো ভ্রমণের এই নতুন অভিজ্ঞতাকে, এই স্বপ্ন-স্মৃতিকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে কাজে লাগাবেন বলে। তাই বুঝি তাঁর দৃষ্টি সর্বক্ষণ পরম বিস্ময়ে সমুদ্রের পানে নিবদ্ধ করে রাখতেন। সীমাহীন সাগরের বিশাল বিপুল ব্যাপ্তি, সৌন্দর্য ও ভয়ঙ্কর রূপ অবলোকন করতে করতে তিনি তন্ময় হয়ে পড়তেন—হয়তো কোন অপার্থিব অনুভবের স্পর্শে তাঁর মন হারিয়ে যেতো—হারিয়ে যেতো এই সময়, এই কাল ছাড়িয়ে অজানা নিরুদ্দেশের পানে।

বিদেশের মাটিতে অবতরণ করার মাত্র কিছুক্ষণ পূর্বে বুলবুল তাঁর ট্রুপের একজন বিশ্বস্ত ও স্নেহভাজন শিল্পীকে একটি মুখবন্ধ খাম দিয়ে বলেছিলেন : এই খামটি তোর কাছে রেখে দে। সামলিয়ে রাখিস, যেন না হারায়। এটা এখন খুলিস না, কাউকে কিছু বলবারও দরকার নেই এখন। বুলবুলের এই হেঁয়ালিতে মেয়েটি কৌতুহলী হয়ে উঠলো, জানতে চাইলো : কি এটা ? জবাব এলো : এখন সে কথা জানবার দরকার নেই। আবার প্রশ্ন হলো : কখন খুলবো তবে ? বুলবুল এবার জবাব দিলেন : 'সময় এলে তুমি নিজেই তা বুঝতে পারবে—আমার মনে হচ্ছে সেদিন ঘনিয়ে এসেছে'।

মেয়েটির কৌতূহল চরমে উঠলো। কিন্তু বুলবুলের এই বিষণ্ণ আদেশের কাছে তার কৌতূহল অবশেষে হার মানলো। আর কিছু জিজ্ঞেস করার সাহসও হলো না। মনের কৌতূহল চেপে রেখে 'মুখবন্ধ' খামটি পরম যত্নে বাক্সে রাখতে গিয়ে ভেবেছিলো, পরে সুযোগ মতো জিজ্ঞেস করে নেবে নেতার কাছে।

তারপর বিদেশের নতুন পরিবেশে, নতুন অভিজ্ঞতা আর উত্তেজনার মধ্যে মেয়েটি বুলবুলের সেই খামখানার কথা সম্পূর্ণ ভুলেই গেলো। কিন্তু আবার মনে হয়েছিলো, পরে—যখন মনে হওয়ার সত্যিকার সময় এসেছিলো।

বিদেশের মাটিতে অবতরণের পর বুলবুলের মানসিক অবস্থা তাঁর নিজের লেখাতেই বুঝতে পারা যাবে :

'১৪ই এপ্রিল সন্ধ্যায় আমরা সদলবলে লণ্ডন এসে পৌঁছুলাম। এই

Chunati.com
Pioneer in village based website

প্রথম নৃত্যকলা প্রদর্শনীর জন্য 'পাকিস্তানী' শিল্পী-সম্প্রদায় এদেশে এলো। সন্ধ্যা সাতটায় ডোভার থেকে ভিক্টোরিয়া স্টেশনে যখন আমাদের ট্রেন Poollman Coach এসে পৌঁছলো তখন Platform-এ Press Photographers, আমাদের Impressarioও তাঁর কর্মচারী এবং কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ট্রেন থেকে নামতেই মনটা আনন্দে ভরে উঠলো—অবশেষে নানা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে যে এ দেশের মাটিতে পা রাখলাম তার জন্য খোদার দরবারে ধন্যবাদ জানালাম। আমাদের গভর্নমেণ্টের মর্মান্তিক উদাসীনতা সত্ত্বেও, তাদের আর্থিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়েও আমি যে এত বড় দল নিয়ে এদেশে এসে পৌঁছুতে পারলাম তারজন্য মনে মনে খানিকটা আত্মপ্রসাদও অনুভব করলাম বৈকি। আর যে কয়েকজন প্রিয়তম বন্ধুদের আর্থিক সাহায্যে আমাদের এই 'সাংস্কৃতিক মিশন' এদেশে আসতে পারলো তাদের কথাও স্মরণ করলাম সশ্রদ্ধ ভাবে।

'ট্রেন থেকে নামতেই আমাদের Impressario,' Mr. Petar Daubeny হাত বাড়ালেন। করমর্দন করে তিনি বিভিন্ন Pressman-দের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। Pressman-রা আমার ছোট্টমেয়ে নার্গিসকে দেখে তো থ। এত ছোট মেয়ে, সে আবার নাচে কি? প্রেস্ ফটোগ্রাফারেরা মুহূর্ত বিলম্ব না করে তৈরী হয়ে গেলেন। হুকুম হলো নার্গিসকে কাঁধে বসিয়ে দাঁড়ান। তাই দাঁড়ালাম—মাপা হাসিও হাসলাম—নার্গিস মাপজোকের বাইরে, সে হেসে উঠলো খিল খিলিয়ে, আর এক সঙ্গে বিভিন্ন ফটোগ্রাফারদের ফ্লেসগুলো দপ দপ করে উঠলো চোখ দু'টো ধাঁধিঁয়ে দিয়ে।

'স্টেশনেই বন্ধুদের কাছে শুনলাম আমাদের ট্রেন পৌঁছবার আধ ঘণ্টার মধ্যে কবি নজরুল ইসলাম এসে পৌঁছুচ্ছেন পোর্টসাউথ 'Portsouth' থেকে চিকিৎসার জন্য। অবশেষে 'পাক-ভারতের' দেশবাসীরা চিকিৎসার জন্য তাঁকে ইউরোপ পাঠাতে পেরেছেন ভেবে মনটা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে উঠলো। আমাদের দল কবিকে সাদর সম্বর্ধনা জানাবার জন্য স্টেশনেই অপেক্ষা করতে লাগলো। ঠিক সময়েই কবি এসে পৌঁছলেন, সঙ্গে মিসেস নজরুল ইসলাম আর রবিউদ্দিন সাহেব।

'অসুস্থ কবিকে বিদায় দিয়ে আমরা মহানগরী লণ্ডনের জনাকীর্ণতায় মিশে গেলাম।

'পরের দিন সকালের ও বিকালের কয়েকটি কাগজে আমাদের পৌছুবার খবর দেখতে পেলাম। সেই সঙ্গে দেখতে পেলাম নার্গিস ও বাহনরূপে আমার ছবি। আর পাকিস্তানের বিস্ময় সাড়ে পাঁচ বছরের মেয়ে নার্গিস আইনগত বাধার জন্য নাচতে পারবে না বলে কাগজের দুঃখ প্রকাশ।

'যাই হোক, ২৭শে এপ্রিল অর্থাৎ দু' সপ্তাহ বসে থাকবার পর 'Leicester' নামক ইংল্যাণ্ডের এক শহরে আমাদের 'শো' আরম্ভ হলো।

'২৭শে এপ্রিল সোমবার শিল্পী হিসেবে আমার জীবনে অবিস্মরণীয় দিন! সেইদিন আমাদের শিল্পী সম্প্রদায়ের European Premier বা সর্বপ্রথম ইউ-রোপের রঙ্গমঞ্চে অবতারণা। বলাই বাহুল্য, অনেক উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা নিয়ে সাড়ে সাতটায় আমাদের পর্দা উঠলো—এক কথায় প্রাণ মন ঢেলে দিয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আমরা শো করলাম—প্রত্যেকটি নৃত্যানুষ্ঠানের পর উচ্ছ্বসিত করতালিতে প্রেক্ষাগৃহ মুখর হয়ে উঠতে লাগলো। 'হাফিজের স্বপ্ন' 'চাঁদ সুলতানা', 'বাঙ্গলার ফসল-উৎসব' নামক Ballet প্রভৃতি বিশেষভাবে সমাদৃত হলো।

Chunati.com
Pioneer in village based website

'কিন্তু অধিনায়ক যে, তার তো চিন্তার অবধি নেই। জনসাধারণ অকুণ্ঠ সমাদর করলেও 'প্রেস' অর্থাৎ সমালোচকেরা কী বলবেন তাই নিয়ে দুর্ভাবনায় পড়লাম। পরের দিন দুর্ভাবনা ভাঙিয়ে দিলেন আমার এক বন্ধু 'Leicester Chronicle' & 'Evening Mail' পত্রিকা দু'খানা হাতে করে নিয়ে এসে। দেখালেন এই দু'খানা পত্রিকায় আমাদের ছবিসহ কলমব্যাপী উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বেরিয়েছে। নূতনত্বের পরিবেশনায়, পোশাকের পারিপাট্যে, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় এবং সর্বোপরি অপরূপ নৃত্য সুষমায় আমরা নাকি অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছি।

'দুদিন পরে 'Stage' নামে প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক (কাগজটি লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়) আমাদের এই শো সম্পর্কে সমালোচকের কলমব্যাপী মন্তব্য পড়লাম। এই কাগজ আমাদের শো'কে Best seen in years বলে অভিনন্দন

জানিয়েছেন। 'কবি হাফিজের স্বপ্ন', 'চাঁদ সুলতানা', 'আনারকলি' প্রভৃতি মুসলিম সংস্কৃতিমূলক নৃত্যকে অকুণ্ঠ প্রশংসা জানিয়েছেন এঁরা।

'সপ্তাহব্যাপী আমরা লেষ্টারে শো করি। লেষ্টার বৃটেনের এক ছোট শহর—আমাদের শো'তে লোক সমাগম সে তুলনায় বেশ ভালই হয়েছে বলতে হবে এবং আমি শুনেছি, অনেকেই নাকি তিন চারবারও আমাদের শো দেখেছেন।

'একটা কথা আমি আজ নিশ্চিত করে বলতে পারি, সাধারণ দর্শকদের আমাদের নৃত্যানুষ্ঠান মুগ্ধ করেছে। অনেকেই এসে Back Stage-এ ভীড় করে আমাদের শো'-র পরে ধন্যবাদ জানিয়েছেন Mermorable Evening এর জন্য। এমন অপূর্ব নাচ হতে পারে—ভাব প্রকাশের এমন সহজ সুন্দর ভঙ্গি হতে পারে, এ নাকি তাঁদের জানা ছিলো না! কেউ কেউ রামগোপালের সঙ্গে আমাদের তুলনা করে বলেছেন—তাঁর নাচ আমাদের বোধগম্য নয়—মুদ্রা আমরা বুঝি না, Critic-রা তাঁকে ধন্য ধন্য করে—আমরা বোকার মত সায় দিয়ে গেছি—আপনাদের নাচ কিন্তু আমাদের বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হলো না। কোনো কোনো ইংরেজ মহিলা আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন:

In comparison to your ballet, our ballet seems so artificial. Leiscester-এর পর Cheltenham ও Cambridge-এ আমরা শো' করি। এই দুই জায়গায়ও আমার উচ্চ প্রশংসা লাভ করতে সক্ষম হয়েছি।

'Cheltenham-য়ে 'Glouchester Shire Echo' নামক দৈনিক সান্ধ্য-পত্রিকা 'Dazzling ballet excites enthusiastic audience' শিরোনাম দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। Cambridge-য়ের 'Cambridge Daily News' পত্রিকা Eastern Grace Rythm শিরোনামায় কলামব্যাপী আমাদের স্তুতি গেয়েছেন। এই দু' জায়গাতেও জনসাধারণের কাছে আমাদের নৃত্যানুষ্ঠান অভিনব ও সর্বসুন্দর মনে হয়েছে। এখানেও 'কবি হাফিজের স্বপ্ন, 'চাঁদ সুলতানা', 'আনারকলি', 'এক পান্থশালায়', 'বাঙ্গলার ফসল-উৎসব', বিষের বাঁশী', 'বসন্ত উৎসব', 'রূপক', নৃত্যশ্রী' প্রভৃতি Item প্রতিদিন জনসাধারণকে মুগ্ধ করেছে।

'এরপরে আমরা ডাবলিনে যাই—ডাবলিনে ছ' সপ্তাহ আমরা শো' করেছি। সেখানে আমরা যে সাড়া জাগিয়ে এসেছি, আজ পর্যন্ত কোনো দেশের কোন ব্যালে সম্প্রদায় নাকি এরকম বিপুল সম্বর্ধনা পায়নি। Ireland-য়ের দশটি পত্রিকাই একবাক্যে আমাদের নৃত্যের প্রশংসা করেছে।'

সাত

বুলবুলের এই লেখা হতেই বুঝতে পারা যায়, ইংল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডে বুলবুলের নৃত্যানুষ্ঠান কিভাবে সমাদৃত হয়েছে। বলা প্রয়োজন যে ডাবলিন ইংল্যাণ্ডের অন্যান্য শহরে নৃত্য পরিবেশন করে বুলবুলের গ্রুপ ফ্রান্সে যায়। ফ্রান্স থেকে হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম। এখানেও বুলবুলের শিল্প-কৌশল, তার ভাব ও কল্পনাসমৃদ্ধ নতুন 'টেকনিক' যুক্ত নৃত্যনাট্য অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। কঠিন জীবনের মর্মবাণী এইসব অনুষ্ঠানে এমনভাবে জীবন্ত হয়ে ওঠে যে, ইউরোপের বহু মনীষী স্বতঃপ্রণোদিত অভিনন্দনে তাঁকে অভিনন্দিত করেন। বিখ্যাত সাম্যবাদী নেতা রজনী পাম দত্ত তাঁকে উচ্ছ্বসিত প্রসংসা করেন এবং ফ্রান্সে আর হল্যাণ্ডে বুলবুলকে ওই দু'টি দেশের শ্রেষ্ঠ জাতীয় শিল্পীদের সঙ্গে তুলনা করা হয়। এমনি ভাবে 'পাকিস্তানের' এই মহান শিল্পী বিদেশীর চোখেও মহান হয়ে ওঠেন। অর্থাৎ ইউরোপ তাঁকে একটি অবিস্মরনীয় প্রতিভা বলেও স্বীকৃতি দিয়েছে। ইংল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের পত্র-পত্রিকাসমূহ পাকিস্তানের জাতীয় শিল্পীর স্তুতিতে মুখর হয়ে উঠেছিলো। তারই কয়েকটি প্রমাণ নিয়ে উদ্ধৃত হল :

'পাকিস্তানের নৃত্যশিল্পী'

-----তিনি একজন প্রবর্তক। ভারতীয় নাট্যকলাকে তিনি বাঁক ফিরিয়েছেন, এটা সম্পূর্ণ নতুন। বুলবুল যেমন ভালো নাচিয়ে, তেমনিই তিনি একজন কোরিওগ্রাফারও। ১৯৪৩ সালে অনুষ্ঠিত বাংলার দুর্ভিক্ষকে রূপ দিয়ে রাজনৈতিক নৃত্যনাট্য তিনি মঞ্চস্থ করেছেন গতকাল রাত্রিতে। এই

নৃত্যনাট্যটি আশ্চর্য মর্মস্পর্শী। সমসাময়িক বিষয়কে নৃত্যে রূপ দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। এই নৃত্যরূপ কি করে দেওয়া যেতে পারে, সেই প্রশ্নে যারা আগ্রহশীল বুলবুলকে তাদের অবশ্যই দেখা উচিত।

ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান (ইংল্যাণ্ড)

লণ্ডনের ডায়েরী

------স্ক্যালা থিয়েটারে পাকিস্তানী যে নাচ দেখানো হচ্ছে তা স্বদেশপ্রেম ও অবারিত প্রাণশক্তিতে অনুপ্রাণিত। ১৯৪৩ সালে বাংলা দেশে অনুষ্ঠিত মানুষের তৈরী দুর্ভিক্ষে সরাসরি রাজনৈতিক বাস্তবতারই রূপারোপ। তথাপি সুন্দর নৃত্যাভিনয় ও আন্তরিক প্রাণস্পন্দনের কোনো অসুবিধা এখানে হয়নি।

নিউস্টেট্‌স্‌ম্যান এণ্ড নেশন (লণ্ডন)

Chunati.com
Pioneer in village based website

'বলিষ্ঠ ভঙ্গি'

-----কৃষক ও জেলের বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে নৃত্যরূপায়িত বাস্তব কাহিনী যা ভারতের দশ হাজার বছরের ধর্ম ও দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা না করেই বোঝা যায়, এমন সরল রোমান্টিক কাহিনীই এই দলটি পছন্দ করেন।

মাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান (লণ্ডন)

'শক্তিশালী শিল্পকৃতি'

------'যেন ভুলে না যাই' একটি শক্তিশালী শিল্পকৃতি। নৃত্যাভিনয়ের মধ্যে ১৯৪৩ সালের বাংলার শোচনীয় দুর্ভিক্ষকে এখানে রূপ দেওয়া হয়েছে।

ডেইলী টেলিগ্রাম (লণ্ডন)

'প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন'

'যেন ভুলে না যাই' নৃত্যনাট্যটি আকারে অনেকটা পশ্চিমী ধাঁচের কিন্তু শিল্পপ্রেরণার দিক থেকে পাকিস্তানী। প্রতীচ্যের সঙ্গে প্রাচ্যের মিলন ঘটলে এবং তাকে আত্মস্থ করতে পারলে কী হয় তার উজ্জ্বল একটি দৃষ্টান্ত এই নৃত্যনাট্যটি।

ডেইলী ওয়ার্কার (লণ্ডন)

'লোকপ্রিয় হাস্যরস'

এই সপ্তাহে ডাবলিনের অলিম্পিয়া থিয়েটারে বুলবুল ও তার প্রাচ্যদেশীয় নাচিয়েরা যেসব নাচের অনুষ্ঠান করছেন, তার আবেদন রামগোপালের পৌরাণিক ভাবধারাসম্পন্ন হিন্দু নাচের চেয়ে বেশী ব্যাপক ও জনপ্রিয় হবার সম্ভাবনা আছে। অধিকাংশ নাচই তাঁদের বৃত্তিমূলক লোকভঙ্গি থেকে গড়ে তোলা, সে ভঙ্গি ফসলকাটার ভঙ্গি, মাছধরা ও যুদ্ধ করার ভঙ্গি। এই সব নাচের অধিকাংশেই এক আকর্ষণীয় বাঙ্ময়ছন্দের সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে গ্রাম্য উল্লাস ও লোকপ্রিয় হাস্যরস। - - - - -

দি আইরিশ টাইমস্ (আয়ারল্যাণ্ড)

Chunati.com Pioneer in village based website

'বাস্তবতা'

পাকিস্তানের নৃত্যটির প্রেরণা কোনো পৌরাণিক কাহিনী নয়। প্রেম, পরিশ্রম থেকে নেওয়া বিষয়বস্তু। অত্যাচারিত একটি জাতির দুর্দশা, স্বাধীনতার জন্য তাদের সংগ্রাম এবং প্রাণোচ্ছলতা এই হলো প্রধান বিষয়। যে সমস্ত কোরিয়োগ্রাফার বাস্তব থেকে প্রেরণা খুঁজে নিতে চান না, তাঁরা এই সব নাচ থেকে যে শেখার মতো কিছু পাবেন তাতে সন্দেহ নেই।

লে-লেৎর ফ্রঁসেজ (ফ্রান্স)

'দর্শকবৃন্দ হর্ষধ্বনি করতে সাহসী হয়নি'

দুর্ভিক্ষ-নাট্য 'যেন ভুলে না যাই' শেষ হয়ে গেলে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বুলবুলের খেদোক্তির পর আলোগুলি যখন নিভে গেলো, দর্শকেরা নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন। পর্দা যখন পড়ে গেলো আর জ্বলে উঠলো আলোগুলি, কে একজন শুরু করেছিলো হর্ষধ্বনি, কিন্তু পর্দা যখন আবার উঠে গেলো, সেই হর্ষধ্বনি মিলিয়ে গেলো এমনভাবে, যেন সেই ব্যক্তি বুঝতে পেরেছে যে সে কলুষিত করে দিচ্ছিলো এই পবিত্র অনুষ্ঠানকে।

হেগ পোস্ট (হল্যাণ্ড)

'সবচেয়ে বৈপ্লবিক'

বস্তুত: এখানেই ঘটেছে প্রাচ্যদেশীয় নাচের ইতিহাসে সবচেয়ে বৈপ্লবিক ঘটনাগুলোর অন্যতম ঘটনা। গতির ছন্দে পুনর্গঠন হয়েছে নাচগুলো। ভিত্তিটা প্রাচীন ঐতিহ্যের ওপরে হলেও, এর মধ্যে কোনো আড়ষ্টতা নেই।

—হে টৌনিল (বেলজিয়াম)

Chunati.com
Pioneer in village based website

'জীবন রূপায়ণ'

আধুনিক বুর্জোয়া থিয়েটারের কোনো একটি অনুষ্ঠানও, এই নৃত্যনাট্যের মতো জীবন রূপায়ণের আন্তরিকতায় এতখানি মর্মস্পর্শ করে না। বাঁশী ও তারের যন্ত্রের শোকাবহ সুরে এখানে শোনা যায় নিপীড়িত মানুষের কণ্ঠ। এখানে পাওয়া যাবে, একটি জাতির ওপর অনুষ্ঠিত এক বীভৎস অন্যায়ের শিল্পরূপায়িত অপূর্ব ব্যাখ্যা।

—দ্য রুদেভাঁ (রেডব্যানার) (বলজিয়াম)

আট

বলাবাহুল্য যে, অনেক বিরূপ অবস্থা ও প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই বুলবুল এই সাফল্য অর্জন করেছিলেন। সে সব প্রতিকূলতা ও বাধার

পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে গেলে একে আশাতিরিক্ত সাফল্য ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। তার চাইতে বড় কথা—শিল্পকর্মের ওপর তাঁর নিষ্ঠা, ধৈর্য, আন্তরিকতা ও নিজের ওপর অবিচল বিশ্বাসই তাঁকে চরম সাফল্য লাভে সাহায্য করেছিলো।

লণ্ডনে পৌঁছুবার পর বুলবুল প্রায় দুই সপ্তাহ কোনো শো করেননি। ফলে আর্থিক দিক দিয়ে এসময় তিনি খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁর বিরাট ট্রুপটির প্রত্যেকটি শিল্পীর সব রকম দায়িত্ব বহন করে বুলবুল তাঁর মানসিক ধৈর্যের যে পরিচয় দিয়েছিলেন, তাতে শিল্পীদের চোখে তাঁকে আরো মহৎ করে তোলে। অনাগত কালের শিল্প সেবকদের জীবনে 'উদাহরণ' স্থাপনের প্রয়োজনেই হয়তো তাঁদের পথিকৃতদের জীবনে এমন দুর্যোগপূর্ণ ভাগ্যের সমাবেশ ঘটে। অবশ্য একথাও সত্য যে, বুলবুলের অসীম মনোবল ও কর্মনিষ্ঠার কাছে ভাগ্য চিরদিন পরাভূত হয়েছে।

বুলবুলের শিল্পী-জীবনের অভাবিতপূর্ব সাফল্যের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে আর একজন মহান শিল্পীর আন্তরিকতাপূর্ণ দান জড়িয়ে রয়েছে। তিনি হচ্ছেন সুরস্রষ্টা তিমিরবরণ। পাক-ভারতের প্রতিটি সঙ্গীতামোদীর কাছেই এই শিল্পীর নাম এতো বেশী পরিচিত যে, নতুন করে তিমিরবাবুর পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

বুলবুলের শিল্পীজীবনের প্রারম্ভ থেকে দীর্ঘদিন স্রষ্টা তিমিরবরণ ছিলেন তাঁর সঙ্গীত সংযোজক ও পরিচালক। বুলবুলের চিন্তা ও কল্পনাসমৃদ্ধ নৃত্যে তিমিরবাবু করেছেন প্রাণপ্রতিষ্ঠা। বুলবুলের শিল্পসৃষ্টি ছিলো রূপকথার ঘুমন্ত রাজকন্যা আর তিমিরবাবুর সুর সংযোজনা ছিলো সেই রাজকন্যাকে জাগিয়ে তোলার সোনার কাঠি। তিমিরবাবু হলেন সুরের যাদুকর আর বুলবুল নৃত্যের। একের সঙ্গে অপরের মিলনের মাধ্যমে সৃষ্ট হয়েছে অপূর্ব এক স্বপ্ন-জগত। সেই স্বপ্ন জগত হলো হাফিজের স্বপ্ন 'ইরাণের পান্থশালায়' 'সুর ও ছন্দ' ইত্যাদি। এই স্বপ্নজগত এতই স্বপ্নময় যে 'হাফিজের স্বপ্ন' দেখতে দেখতে দর্শকেরা ভুলে যেতেন স্থান-কাল-পাত্র। সময় ও দিনের পার্থক্য ঘুচে গিয়ে সব একাকার হয়ে যেতো তাঁদের সামনে। বুলবুলের নৃত্যের আঙ্গিক ও ভাবকল্পনা এবং তিমিরবাবুর সুরসংযোজনা পরস্পরের সঙ্গে এমন অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত যে, এককে বাদ দিয়ে

১০—

অপরকে ভাবা যায় না। বুলবুল-প্রতিভার প্রাণ তাঁর ছন্দ আর তিমির-প্রতিভার প্রাণ তাঁর সুর। সুর ও ছন্দ অথবা ছন্দ ও সুর এই দুই প্রাণ এক হয়ে যে মহৎ শিল্পরূপের সৃষ্টি, স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষের মনের কাছে সেই শিল্পরূপ শান্তির বাণী পৌঁছাবে নিঃসন্দেহে। তিমির-বাবু না হলে বুলবুলের সৃষ্টি হয়ে পড়তো প্রাণহীন, আর বুলবুল না হলে তিমির-বাবুর সুর সৃষ্টি হয়তো থেকে যেতো অসম্পূর্ণ। হয়তো উভয়েই সেকথা জানতেন। তাই কোলকাতায় যেমন, তেমনি তৎকালীন 'পূর্ব' ও 'পশ্চিম পাকিস্তান' সফর আর ইউরোপ পরিভ্রমণের সময়ও বুলবুল আর তিমিরবরণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হননি। সব সময় তাঁরা ছিলেন এক, অবিচ্ছেদ্য ও অভিন্ন। এজন্যেই বুলবুলের সৃষ্টির সঙ্গে, বুলবুলের সাফল্যের সঙ্গে, তিমিরবরণের কৃতিত্বও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে।

ইউরোপ সফরকালে বুলবুল শরীরের প্রতি চরম উদাসীনতার পরিচয় দেন। সব সময়ই তিনি শো'র ব্যাপারে উৎকণ্ঠিত থাকতেন। রিহার্সেলের সম্পূর্ণ খবরদারি, মঞ্চসজ্জার খুঁটিনাটি কাজটি পর্যন্ত বুলবুলের সজাগ দৃষ্টি এড়াতে পারতো না। তারপর একটানা দীর্ঘসময় নৃত্য পরিবেশন, সমস্ত শো'র প্রতিটি নাচ সম্বন্ধে চিন্তা ও প্রয়োজনীয় রদবদল বা সংযোজনা, নতুবা নতুন কোনো পরিকল্পনা নিয়ে চিন্তা করা—বুলবুলের নিজের কথায়: অধিনায়ক যে, তাঁর চিন্তার শেষ নেই; সুতরাং মুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম নেবার সময় করে উঠতে পারতেন না। এই কঠোর ও একটানা কাজের ও চিন্তার ধকল শরীর আর কত সইবে! এই অশান্ত কাজের চাপে ক্রমে তাঁর শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা ভেঙে পড়ে এবং তখন নানারকম উপসর্গ দেখা দেয়। দেহের অভ্যন্তরের যন্ত্রণা দিন দিন বাড়তে থাকে। কিন্তু বিশ্রামের সময় কোথায়—কাজ যে তাঁর তখনও শেষ হয়নি। তাই চরম সংযম ও ধৈর্যের আড়ালে শারীরিক যন্ত্রণাকে যতটুকু সম্ভব ঢেকে রাখতেন। হোমিওপ্যাথি মতেই চিকিৎসা চলছিলো তখন। ১৯৫৩ সালের মাঝামাঝি সময় বুলবুল বাধ্য হয়ে কিছুদিন হাসপাতালে ছিলেন। অবশ্য বিদেশে থাকাকালীন মা ও অন্যান্যের কাছে বুলবুল যে সব চিঠি লিখেছিলেন তাতে এ সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ পাওয়া

Chunati.com

যায় না। দেশে মা ও অন্য সকলে চিন্তিত হয়ে পড়বেন ভেবে বুলবুল হাসপাতালের কথা গোপন করেছিলেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা ক্রমশঃ বেড়ে যাওয়াতে এলোপ্যাথি মতে চিকিৎসা করাতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং সে সময় ডাক্তারেরা তাঁকে হুঁশিয়ারী জানিয়ে বলেছিলেন—বিশ্রামের প্রয়োজন, সম্পূর্ণ বিশ্রাম—শারীরিক ও মানসিক উভয় দিকেই। অন্ততঃ পক্ষে ছয়টি মাস বিশ্রাম নিন, নতুবা সমূহ বিপদের আশঙ্কা রয়েছে—জীবন বিপন্ন হতে পারে। লণ্ডনের ডাক্তারের এই মতামত বুলবুল দেশে ফিরে আসার পরে একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন ডাক্তারদের কাছে।

এই নির্মম সত্য কথাটি বুলবুলের চাইতে আর কেউই বেশী জানতো না। বুলবুল বুঝেছিলেন বিশ্রাম নেওয়া না নেওয়ার পর্যায় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে অনেক আগেই। খুব সম্ভবতঃ এই জন্যই ইউরোপের সামনে নিজের সৃষ্ট শিল্পরূপকে অবিলম্বে তুলে ধরার জন্য তিনি অমন ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

তখনও যে অনেক কিছুই করার বাকী রয়েছে। তাঁকে যেতে হবে আমেরিকায় এবং সেখানেও তুলে ধরতে হবে তাঁর সৃষ্টিকে। আমেরিকার মত ধনীর দেশে। তিনি কেবল যশ কুড়াতেই যাবেন না, প্রচুর অর্থও তাঁকে আনতে হবে সেখান থেকে। নিজের দেশে একটি 'চারুকলাকেন্দ্র' প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক অর্থের দরকার। আমেরিকা সফরের সমস্ত অর্থ নিঃশেষে দান করে দেবেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের কাজে এই রকম একটা পরিকল্পনা বুলবুলের ছিলো। বিশ্রাম নিলে তো চলবে না—ভাগ্যের প্রতিকূলে, অবস্থার প্রতিকূলে যুদ্ধ করেই তো জীবনের এতখানি পথ অতিক্রম করেছেন। রোগের বিরুদ্ধে কালব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার সংকল্প নিয়েই যেন বুলবুল তাঁর বাকী কাজগুলো শেষ করবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু শেষ করে উঠতে পারলেন না! এই দেশদরদী, ছন্দ পাগল মহৎশিল্পী অভিযাত্রী ইউরোপ সফর করে দেশে ফিরবার মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই মারা যান। তৎকালীন পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনের সংগ্রামে বুলবুলই বুঝি প্রথম শহীদ! বুলবুলের দেশ আর বুলবুলের দেশের মানুষ কি সে কথা ভুলতে পারবে কখনো? বিদেশে থাকতেই ডাক্তারের সাবধানবাণীকে অগ্রাহ্য করে বুলবুল

Chhuti.com Pioneer in village based website

নিজের কাজে মেতে উঠেন, আর তার ফলেই সেই ব্যাধির প্রকোপে দ্রুত কাবু হয়ে পড়েন।

বুলবুলের প্রিয়তম বন্ধু ও ভক্তবৃন্দের মনে একটি প্রশ্ন গভীর মর্মযাতনার মতো আজও গুমরে মরে : একখানা নবনীত হৃদয়, একখানা প্রশান্ত অন্তর, একখানা দরদী মনের স্পর্শ কি বুলবুল পায়নি জীবনে ? তারই অভাবে কি তাঁর এতবড় ব্যক্তিত্ব, এতবড় প্রতিভা এমন অসময়ে এমন অকালে ক্ষয়ে ক্ষয়ে ঝড়ে পড়লো—তীব্র তাপে শুকিয়ে যাওয়া, কুঁকড়ে যাওয়া ফুলটির মতো ! ওই উপচে পড়া প্রাণোচ্ছ্বাসের আড়ালে, ওই সুন্দর সুরভিত মনের একান্তে, এমনকি কোনো ব্যথা লুকিয়ে ছিলো, যার খবর কেউ কোনোদিন পায়নি কিংবা পেতে চায়নি ? সেই অভিমানেই কি শেষ পর্যন্ত তিনি জীবনের পরোয়া পর্যন্ত করলেন না ! এই প্রশ্নের জওয়াব হয়তো কোনোদিনই মিলবে না। মহাকালের বুকে এক নীরব প্রশ্ন হয়েই চিরকাল শুধু ফরিয়াদ করতে থাকবে।

ইউরোপ সফর শেষ করে সোজাসোজি আমেরিকা পাড়ি দেবার পরিকল্পনা ছিলো বুলবুলের। কিন্তু [illegible] নিয়ে এগুনো আর সম্ভব হলো না।

শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে সেই পরিকল্পনা বাতিল করে ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি শিল্পীদল নিয়ে দেশে ফিরে এলেন।

বুলবুল জীবনের কোনো কল্পনা-পরিকল্পনা কখনো অলস বিলাস কিংবা ভাবপ্রবণতায় পর্যবসিত হতে দেননি। নিজের মেধা বুদ্ধি ও শ্রম দিয়ে তাকে সার্থক করে তুলতে চেষ্টার ত্রুটি করেননি কোনোদিন। ছাত্রবয়সের 'কলিকাতা ফাইন আর্টস এসোশিয়েশন' প্রভৃতি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো বুলবুলের সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও বাস্তব ভিত্তিক সক্রিয়তারই বলিষ্ঠ প্রমাণ। তাই 'চারুকলাকেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বুলবুলের পরিকল্পনার কথা ভাবলে—মহান আদর্শ ও নিষ্ঠা ভিত্তিক এক 'আনন্দধামের' রূপই চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কিন্তু সেই আনন্দধাম বাস্তবে আর রূপ পেলো না। তার আগেই বুলবুলের স্বপ্নময় চোখের আলো চিরতরে নিভে গেলো !

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এক

মানুষের জীবনে মাত্র চৌত্রিশটি বছরের পরমায়ু মহাসিন্ধুর মধ্যে একটি বিন্দুর মতো। আর এই আয়ুসীমার মধ্যে একজন নৃত্যশিল্পী যদি সাহিত্য-ক্ষেত্রেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে যেতে সক্ষম হন তবে তা যে বিস্ময়কর, সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। বুলবুলের জীবন সেই বিস্ময়েরই যেন এক দৃষ্টান্ত। বলাবাহুল্য বুলবুল সাহিত্যিক হিসেবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পেরেছেন।

আশৈশব বুলবুল দেখেছেন, বাবা সময় পেলেই বই-পুস্তকের মধ্যে ডুবে থাকতেন। কাসেম সাহেব ও রাজেন বাবুর সংসর্গ তাঁর মনের পুষ্টিসাধনে একান্ত ভাবে সহায়তা করেছিলো, সে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। নিজের বাড়িতে কোনো কোনো উৎসব উপলক্ষে গান-বাজনার বৈঠক বুদ্ধি হয়ে অবধি দেখেছেন। স্কুলে পড়বার সময় মায়ের উদ্যোগে বুলবুল ও তাঁর বোনদের সঙ্গী সাথীরা মিলে বাড়ির উঠানে মঞ্চ বেঁধে ছোটদের নাটক করেছেন কয়েকবার। তার মধ্যে 'বঙ্গমাতা' 'চশমা' 'জমিদার' ইত্যাদি নাটকের কথা মানিকগঞ্জের স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে অনেকের আজও হয়তো মনে আছে।

Chunati.com
Pioneer in Village based website

মায়ের মুখেই বুলবুল ছেলেবেলায় সর্বপ্রথম ডি এল. রায়ের সেই প্রসিদ্ধ দেশাত্মবোধক গান শুনেছেন। তিনি নিজে যত্ন নিয়ে ছেলে-মেয়েদের এই গান শিখিয়েছিলেন। নিজেদের ঘরোয়া পরিবেশের মধ্যেই বুলবুল আশৈশব সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বাদ পেয়ে এসেছেন। স্কুলজীবনে—কৈশোর ও তরুণের সন্ধিক্ষণে স্বয়ং নজরুল ছিলেন বুলবুলের আদর্শ। সে যুগে নজরুল তরুণসম্প্রদায়কে এত বেশী প্রভাবান্বিত করেছিলেন যে তাঁর আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদও অনেকে অনুকরণ করতো। বুলবুল নজরুলের অনুকরণ করতে গিয়েই প্রথম

বাবরীচুল রেখেছিলেন। তারপর কোলকাতায় কলেজে পড়বার সময় বুলবুল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গোপাল হালদার প্রমুখ কথাশিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের সংসর্গে আসার সুযোগ লাভ করেন। এই পরিবেশ ও সংসর্গের সঙ্গে তাঁর স্বাভাবিক মননশীলতার মণি-কাঞ্চন সংযোগের ফলেই তিনি সাহিত্য চর্চায় উৎকর্ষ লাভ করেন। প্রগতি-লেখক সঙ্ঘের উৎসাহী সদস্য ছিলেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গের অনেক শক্তিশালী লেখক এই সঙ্ঘের সদস্য ছিলেন।

সম্ভবত: প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ. পড়বার সময় বুলবুলে লেখা ছোট-গল্প 'পয়মাল' কোলকাতার অন্যতম সেরা সাহিত্য-পত্রিকা 'পরিচয়ে' প্রকাশিত হয়। পরিচয়ে লিখবার আগেও বুলবুল অনেক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও গান লিখেছেন। কিন্তু সে সব লেখা বুলবুল কখনো কোনো পত্র-পত্রিকাতে দেননি। সে দিক দিয়ে দেখতে গেলে 'পয়মাল' হচ্ছে বুলবুলের প্রথম প্রকাশিত লেখা। কোনো লেখকের লেখা প্রথমবারেই পরিচয়ের মতো একখানা বনেদী কাগজে স্থান পাওয়া নিঃসন্দেহে গৌরবজনক। 'অনির্বাণ' ও 'মাড মাউণ্ড' নামে আরো দু'টো ছোটগল্প 'পরিচয়ে' প্রকাশিত হওয়ার পর বুলবুলের সহজাত সাহিত্য-প্রতিভার অভ্যুদয়ই ঘোষণা করেছিলো। সম্ভবত: বুলবুলের আরো কিছু লেখা তখনকার অন্য একখানা মাসিক পত্র 'শ্রীগৌরাঙ্গে' প্রকাশিত হয়েছিলো।

এই প্রসঙ্গে মুহূর্তের জন্যও ভুললে চলবে না যে—বুলবুল ছিলেন নৃত্য-শিল্পী এবং তাতে যে নিষ্ঠা ও সাধনার প্রয়োজন তা অবিচ্ছিন্ন রেখেই তাঁকে সাহিত্য-চর্চা করতে হয়েছে। সুতরাং সাহিত্য-চর্চা করবার মতো প্রশস্ত সময়ের একান্তই অভাব ছিলো তাঁর। কিন্তু বুলবুলের সুসমৃদ্ধ কল্পনাশক্তি কোনো বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে নতুবা নিছক কল্পনার ভিত্তিতেই যখন কোনো গল্প ফেঁদে ফেলতো, তখন মনে মনে ভিড় করে আসা কথাগুলো প্রকাশ করতে না পারলে তিনি অস্থির হয়ে উঠতেন। অথচ কাগজ-কলম নিয়ে বসবার মতো সময়ও তিনি পেতেন না অনেক সময়। কাজেই তিনি মুখে মুখে সেই বানানো গল্পের ঝুলঝুড়ি ছুটিয়ে দিতেন। বুলবুলের গল্প বলার ধরনও ছিলো বড় সুন্দর। চুনতির বাড়িতে শীতের রাতে আগুনের ধুনীর

Chunati.com Pioneer in village based website

পাশে বসে অথবা গ্রীষ্মের গুমোট ধরা রাত্রিতে উঠনে শীতল পাটি বিছিয়ে বুলবুলের বানানো গল্প শুনতে শুনতে কখন যে রাত ভোর হয়ে যেতো কেউ তা বুঝতেই পারতো না। সে সব গল্প সংকলন করতে পারলে আলাদা একটা বই হয়তো প্রকাশ করা যেতো।

বি. এ. পড়বার সময় কোনো এক ছুটিতে সেবার বুলবুল চুনতি এসেছেন। সাতগড় নামে একটা গ্রাম থেকে তখন প্রত্যেক দিন খবর আসছিলো, বাঘের উপদ্রবে সেই গ্রামের মানুষের জীবন বিপন্ন হবার উপক্রম হয়েছে। গরু ছাগল গোয়াল থেকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—দিন-দুপুরেও মানুষ ভয়ে ঘরের বাইরে যাচ্ছে না। সাতগড় ও কাছাকাছি কয়েকটি গ্রামের লোক ভসা*১ বসিয়েও বাঘটাকে মারতে পারেনি। সাতগড়ের মগ অধিবাসিরা বাঘ মারতে বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে।

বুলবুল এই সময় একদিন শিকারে যাবার ব্যবস্থা করলেন। ব্যবস্থাটি হরিণ শিকারের। শল্লান *২ ঘাওনি *৩ ভেঙ্গাইন্যার *৪ একটা দল নিয়ে তিনি হরিণ শিকারের জন্য হারবাংছড়ার দিকে রওনা হয়ে গেলেন। হরিণ শিকারে যেতে হলে সমস্ত দিনের খাওয়া দাওয়া নিয়ে শেষ রাতে উঠে রওনা দিতে হয়। বুলবুলের দল সেই নিয়মেই রওনা হয়ে গেলো। যাওয়ার সময় খুব হৈ চৈ করে বুলবুল প্রচার করে দিলেন যে, তিনি হরিণ শিকার উপলক্ষ করে বাঘ মারতেই যাচ্ছেন আসলে।

ঘটনাচক্রে সেইদিনই দুপুরের দিকে সাতগড়ের মগ অধিবাসীরা বাঘটাকে মেরে গাঁয়ে ফিরবার সময় বুলবুলের দলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। তারপর কি করতে হবে এক মুহূর্তে ভেবে নিয়েছিলেন বুলবুল। মগপল্লান মোটা বকশিশ পেয়ে বাঘটা বুলবুলকে দিয়ে দিলো। তখন আর বুলবুলকে পায় কে। তাঁর হৈ হল্লার চোটে বন বাদাড় মুখর হয়ে উঠলো। সেখানে আর

Chunati.com
Pioneer in village-based website

---

* (১) বাঘ মারবার ফাঁদ। * (২) শিকারী। * (৩) শিকারীকে যে সাহায্য করে। * (৪) যারা শিকারীর লক্ষ্যের মধ্যে হরিণ তাড়া করে নিয়ে আসে। এই কথাগুলো চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় ব্যবহার করা হয়।

কাল বিলম্ব না করে সোজা চুনতির পথ ধরলো তাঁর দল। পথে পথে প্রচার হয়ে গেলো বুলবুলের দল বাঘ মেরে ফিরছে। ফলে চুনতি পৌঁছাবার আগেই চুনতিতে খবর ছড়িয়ে পড়ে আর গ্রামের মানুষ ভেঙে পড়লো হিংস্র জানোয়ারটাকে দেখবার জন্য।

যমদূতের মতো জানোয়ারটাকে মারতে গিয়ে দু'তিনটি গ্রামের লোক হিমসিম খেয়ে গেছে, অবশেষে কেমন করে তাকে মারা সম্ভব হলো—সেই রোমাঞ্চকর বর্ণনা শুনবার জন্য বুলবুলদের বৈঠকখানা কয়েকদিন সরগরম হয়ে রইলো। শাখায় শাখায় পল্লবিত করে বুলবুল এমন সুন্দর বর্ণনা দিলেন যে, কেউ তখন বিশ্বাসই করতে পারেনি যে এ বর্ণনা স্রেফ কল্পনা-প্রসূত। নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার এতটুকু সম্পর্ক মাত্র নেই। কয়েক দিন পর গ্রামবাসীদের উত্তেজনা যখন প্রশমতি হয়ে এলো, তখন আসল কথাটা ফাঁস করে দিয়ে বুলবুল বলেছিলেন : দেখলে তো, কেমন তাক লাগিয়ে দিয়েছিলাম সবাইকে!

Chunati.com
Pioneer in village based website

দুই

আশৈশব বুলবুলকে সবাই দেখে এসেছে প্রাণপ্রাচুর্যের ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ। কথায় কাজে, চলনে বলনে তাঁর প্রাণবন্যা উছলে পড়তো। আর সেই প্রাণ-বন্যায় আপন পর, ছোট বড় সকলকেই মুগ্ধ করতে পারতেন তিনি। বয়োজ্যেষ্ঠ, সমবয়সী, বয়োকনিষ্ঠ সকলের সঙ্গেই তিনি মিশতে পারতেন অবাধে। বুলবুলের শিশুসুলভ প্রাণোচ্ছলতা এত স্বাভাবিক ছিলো যে, তাঁর প্রাপ্ত বয়সেই কেউ তাঁকে অশোভন, অতিরিক্ত মনে করেনি কখনো। আর এই সজীব প্রাণের মধ্যেই বুঝি ছিলো বুলবুলের সামগ্রিক শিল্পী-মানুষটির জিয়ন-কাঠি।

ছেলেবেলায় বোনটিকে খেপাতে গিয়ে মুখে মুখে ছড়া রচনা, তারপর রাজেন বাবুর উদ্দেশ্যে কবিতা লেখা এবং আরো পরে 'বকুল' ও 'শেফালিকা' নামে গান ও কবিতার বই লেখা থেকে বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে হাতে লেখা

পত্রিকা প্রকাশ করার মাধ্যমে সাহিত্য-চর্চার ধারাটি অবিছিন্ন ভাবেই বয়ে আসছিলো। পরবর্তী জীবনে ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনার মধ্যে সেই সাধনা সার্থকতার পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করে।

একদা আরাকান ট্রাঙ্করোডে দাঁড়িয়ে একটি কিশোর স্বপ্নমাখা দুটি চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত করে বাবাকে প্রশ্ন করেছিলো: এ পথ কোথায় গেছে আব্বা? ....ও:, সে যে অনেক দূর। সেই স্মৃতিটুকু হয়তো বুলবুলের মনের মণিকোঠায় সঞ্চিত হয়েছিলো, যা পরে এক অবিস্মরণীয় সাহিত্যিক প্রেরণা হয়ে দেখা দিয়েছিলো তাঁর রচনায়।

বহু বছর পরে গত মহাযুদ্ধের সময় বর্মায় জাপানী আক্রমণের আকস্মিকতায় বিপর্যস্ত, শ্রান্তি কাতর, অবসাদে আচ্ছন্ন বর্মার উদ্বাস্তদের মিছিল সেই আরাকান ট্রাঙ্করোড ধরেই চলেছিলো অবিশ্রান্ত। আর দিনের পর দিন তা দেখে বুলবুলের সেই স্বপ্নমাখা চোখ দু'টো বেদনায় বাষ্পাকুল হয়ে উঠেছিলো। সেই অন্তলাম্ব বেদনাই বুলবুলকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলো কলম হাতে নিতে। এই হলো 'প্রাচী' রচনার ইতিহাস ও তার পটভূমি।

Chunati.com Pioneer in village based website

তিন

সেই 'প্রাচী'র পাণ্ডুলিপি যেদিন শেষ হলো, সে দিন বুলবুলের স্বাভাবিক প্রাণোচ্ছ্বাস শতগুণে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলো। বুলবুলের সেদিনের সেই আনন্দ যাঁরা দেখেছেন, সে ছবি ভুলতে তাঁরা পারবেন না কখনো। সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায়, রাত্রিতে, সময়ে অসময়ে, বুলবুলের কলকণ্ঠ শুনতে পাওয়া যেতো চুনতির বাড়িতে। আর দেখা যেতো, ছোট, বড় শ্রোতা পরিবেষ্টিত হয়ে পরম উৎসাহে বুলবুল প্রাচীর পাণ্ডুলিপি পড়ে চলেছেন। সব চাইতে অদ্ভুত ব্যাপার হলো—যাদের পেটে এক ফোঁটা বিদ্যা নেই, তেমন অনেক চাষাভূষা আর ছোট ছোট ছেলে-মেয়েও ছিলো প্রাচীর শ্রোতার দলে। বৃদ্ধ দাদিমা, নিষ্ঠাবতী ফুফু, চাচি, খালা—এঁরাও বুলবুলের আগ্রহে সমস্ত কা

তাঁর পাশে এসে বসতেন। তাঁরা কে কি বুঝতেন জানি না, কিন্তু বুলবুলের অকৃত্রিম আগ্রহে তাঁরা সাড়া না দিয়ে পারতেন না।

প্রাচীর ভূমিকাতে প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন: 'প্রাচীর এই অপূর্ব আলেখ্যখানিতে বিভীষিকা আছে, বাস্তবের অকুণ্ঠিত অসুন্দর ছায়াপথ আছে। কিন্তু তার মাঝখানে শিল্পীর বেহালায় বেজে চলেছে অমর্ত্যলোকের অপূর্ব সঙ্গীত, শিল্পীর ধ্যানী-নেত্রে ধরা দিয়েছে অতলান্ত অন্ধকারের চক্রতীর্থে অনাগত প্রভাতের শুকতারা। ভাবীকালের সাধক আমরা—এই শুকতারাকে বন্দনা করি'।

'প্রাচী' ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়। বইটি বুলবুল বাবাকে উৎসর্গ করেছেন। 'প্রাচী' পুস্তকরূপে প্রকাশ হওয়ার পর বুলবুলের উৎসাহ আরো বেড়ে গেলো। তখন বুলবুল বোনের কাছে এক চিঠিতে লিখেছিলেন:

'আমার ভেতর যদি কোন সৃজনী শক্তি থেকে থাকে, তবে এখন থেকে তা সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রেও নিজেকে যাচাই করে নেবে। তোমাদের শুভ-কামনা নিয়ে আমার নব যাত্রা শুরু হয়েছে।

Chunati.com Pioneer in village based website

'......শুনে খুশি হবে যে, আমি আমার দ্বিতীয় উপন্যাসে হাত দিয়েছি। 'নাগরিক' নাম হবে বইখানার। আশা করি সব দিকে উৎরে যাবে'।

১৯৪২-৪৩ থেকে ১৯৪৪-৪৫ সালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বোনের কাছে লিখিত বুলবুলের কয়েকখানা চিঠিতে আরো দু'টি উপন্যাস লেখার উল্লেখ আছে:

'কল্যাণীয়া,

সম্প্রতি 'আরাকান ট্রাঙ্করোড' নামে অন্য একখানা উপন্যাসে হাত দিয়েছি। বুঝতেই পারছো, আমার কাহিনীর পরিবেশটা। 'পাদপ্রদীপ' নামে আমার আগের সেই উপন্যাসখানার কিছু রদবদল করেছি। পুনর্লিখনও সমাপ্ত হয়ে গেছে। আমি জানি, তুমি কি খুশিই না হবে এই খবর পেয়ে...'।

---

* প্রাচীর রচনাকাল ১৯৪২ সাল। প্রায় সাড়ে চার বছর পর ১৯৪৭ সালে বইটি প্রকাশিত হয়। বুলবুলের এক আত্মীয়ও অনুরক্ত—জনাব লুৎফর রহমান প্রাচীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন বুলবুলের মৃত্যুর বছর খানেক পর।

বুলবুলের সাহিত্যিক সুহৃদ শ্রীযুক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় খুব সম্ভব বুলবুলের এইসব উপন্যাস সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। বুলবুলের সাহিত্যপ্রতিভার প্রতি তিনি উচ্চাশা পোষণ করতেন। নারায়ণ বাবুর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলোর অন্যতম "উপনিবেশ'-এর প্রথম খণ্ডটি বুলবুলকে উৎসর্গ করে তিনি তাঁদের প্রগাঢ় বন্ধুত্বকে অমর করে রেখেছেন।

'উদয়ন' নামে চট্টগ্রামের একখানা মাসিক পত্রিকাতে ১৯৫০ সালে বুলবুলের ছোটগল্প 'আগুন' প্রকাশিত হয়। এবং ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত 'পূর্ব বাংলার সমকালীন সেরাগল্প' সংকলনেও উক্ত গল্পটি স্থান পেয়েছে। গল্পটি যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত। যুদ্ধের বাজারে একদল লোক ঠিকাদারি. কালোবাজারি করে লাল হয়ে গেল, যুদ্ধ শেষের অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কি করে দেশে দুর্ভিক্ষের রক্তচক্ষু ভ্রূকুটি কুটিল হয়ে উঠেছিলো এবং যাদের চক্রান্তে সেই দুর্দিন আরো ভয়ঙ্কর রূপ নেয়—মানুষ নামধারীর দল, কি ভাবে নৃশংস হয়ে উঠেছিলো এ তারই হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা।

বুলবুলের গল্পগুলো সবই প্রায় গ্রামের পারিপার্শ্বিকতা ভিত্তিক। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের হাসি, কান্না, সুখ, দুঃখের এক একখানা জীবন্ত চিত্র। সাধারণ মানুষের গতানুগতিক জীবনের ব্যথা, বেদনা নিজের মনে অনুভব করবার ক্ষমতা ছিলো বলেই বুলবুলের লেখনিতে ফুটে উঠেছে এমন দরদ আর আন্তরিকতা। দেশের সাধারণ মানুষের চরিত্রের বিশালতাকে বুলবুল তাঁর গল্পে অমর করে রেখেছে। বুলবুলের মৃত্যুর পর কোলকাতা হতে প্রকাশিত 'সুভেনিয়র' এ বলা হয়েছে : 'অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ গোয়েন্দার ট্র্যাজিক কাহিনী 'ব্লাড্ হাউণ্ড' তাঁর স্মরণীয় সৃষ্টি। বুলবুলের ছোটগল্প 'অনির্বাণ' নাকি রুশ ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে।

নৃত্যশিল্পী বুলবুলের কর্মবহুল সংক্ষিপ্ত জীবনে যে সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন তা নি:সন্দেহে বিস্ময়কর। দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি বুলবুলের প্রাণের আকর্ষণ আর ভালোবাসার বীজমন্ত্রই তাঁকে করেছে কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিক।

বুলবুলের জীবন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, নানা রকম ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও তিনি সাহিত্যসেবা করে গেছেন। সুতরাং এ প্রসঙ্গে বুলবুল অনুরাগীদের

Chunati.com

মনে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে, তাঁর অপ্রকাশিত লেখাগুলো বাঙলা সাহিত্যের বলিষ্ঠতর সংযোজনা হতে পারতো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজো পাণ্ডুলিপিগুলো সংগৃহীত ও প্রকাশের কোনো ব্যবস্থাই হয়নি।

Chunati.com
Pioneer in village based website

অষ্টম পরিচ্ছেদ

এক

১৯৫৪ সালের প্রথম দিকে বুলবুল ঢাকা থেকে চুনতি যাবার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম শহরে এসে পৌছান। কিন্তু অত্যধিক শারীরিক অসুস্থতার জন্য চুনতি যেতে পারেননি। তাই চট্টগ্রামে কয়েক দিন থেকে আবার ঢাকা হয়ে কোলকাতা ফিরে যান, সেই যাওয়াই তার শেষ যাওয়া। মাতৃভূমির শেষ স্পর্শ নিয়ে সেই যে তিনি গেলেন তারপর আর ফিরে আসেননি।

চট্টগ্রামে আসা এবং সেখানে কয়েকদিন অবস্থানের বর্ণনা দিয়ে বুলবুলের আত্মীয় ও অনুরক্ত লুৎফর রহমান জীবনীকারের কাছে একখানা চিঠি লিখেছিলেন :

'......টুনু ভাইকে এগিয়ে আনার জন্য আমরা সদলবলে স্টেশনে গেলাম। সেই একই ট্রেনে মওলানা ভাসানীও আসছিলেন। তাই স্টেশনে জনতার ভিড় ছিলো। আর সে ছিলো প্রাদেশিক সাধারণ নির্বাচনের হুজুকের সময়।

'গাড়ী এলে অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলে এগুলাম আমরা, পেছনের দিকে এক কম্পার্টমেন্টে আবিষ্কার করলাম তাঁকে। তখনো বাঙ্কে অর্ধশায়িত। শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছেন। তাঁকে যাঁরা জানতেন ও ভালোবাসতেন ওই শরীর দেখে সেদিন তাঁরা নিশ্চয় চমকে উঠেছিলেন—চান্দ্রমাসের শেষে চাঁদ যেন ক্ষয়ে যাচ্ছে।

'স্টেশন থেকে ডাক্তার সাহেবের (খুকুর স্বামী, ডাঃ আলতাফউদ্দিন আহমদ—ইনি তখন চট্টগ্রামের সিভিল সার্জেন) বাসায় নিয়ে এলাম তাঁকে। বাসায় পৌঁছেই খুকু আপাকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ নীরবে অশ্রুবর্ষণ করলেন। অনেকক্ষণ পর বোনকে ছেড়ে এক, এক করে সকলকে আদর করলেন, কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। চোখের পাতা তখনও ভিজা। সেই চোখের পাতা কতক্ষণ অশ্রুসিক্ত ছিলো জানি না। শেষের দিকে লক্ষ্য করিনি, লক্ষ্য করার মতো দৃষ্টিই ছিল না আমাদের—চোখের জলে ঝাপসা হয়ে গিয়েছিলো উপস্থিত সবাইর চোখ।

'তখন তাঁর কোমর ও পিঠে খুব ব্যাথা। সাধারণভাবে নড়া চড়া করবার সময়ও ব্যথায় কঁকিয়ে উঠতেন। তবুও চাল চলন ছিলো অত্যন্ত ধীর স্থির।

'সামনের ঘরে খাটে শুয়ে আমাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করলেন। কিছুক্ষণ পর জানালা দিয়ে দেখা গেলো, রাস্তায় বিরাট এক মিছিল—সর্বাগ্রে হেঁটে চলেছেন মওলানা ভাসানী। টুনু ভাই সেদিকে লক্ষ্য করে বললেন: 'এই জাতি ওই বৃদ্ধের ঋণ শুধবে কি করে' ?

'বেলা তিনটার দিকে আবার গেলাম তাঁর কাছে। দূর থেকে দেখে মনে হলো, শুয়ে ঘুমোচ্ছেন। কিন্তু কাছে যেতেই কথা বললেন, 'এত দেরী করে এলি ? এই বুঝি তোদের তাড়াতাড়ি আসা ? আমরা সবাই তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম। এই বৈঠকে ভবিষ্যৎ বিদেশ-যাত্রা নিয়ে কিছু আলাপ হলো। তাঁর পরিকল্পনা ছিলো এবারে আমেরিকা পাড়ি দেবার। সেখানকার কয়েকজন ইম্প্রেসারিও এ ব্যাপারে বিশেষ ঔৎসুক্যও দেখাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা ছিলো চট্টগ্রামে আবার শো' করে কিছু টাকা তুলবেন—পুনরায় বিদেশ যাত্রার পাথেয়। তাঁর প্ল্যান ছিলো জে. এম. সেন হলের মাঠে প্যাণ্ডেল করে শো' করবেন। বললেন: প্রাথমিক খরচপত্র যা হবে তোকেই যোগাতে হবে। কেনো মনে হয়েছিলো জানি না—এ যেন আমার পরম সৌভাগ্য, সেদিন বুঝতে পারিনি এ সৌভাগ্য জীবনে কোনো দিন আসবে না।

'মাকে দেখবার জন্য উনি বারবারই উদগ্রীব হয়ে উঠছিলেন, আলাপ-আলোচনার মধ্যেও তাঁর মনের এই উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাচ্ছিলো। রফিককে (বুলবুলের ছোট ভাই) পাঠানো হয়েছিলো দেশের বাড়িতে, মাকে আনার জন্য। পরের দিন দুপুরে এসে পৌঁছানোর কথা। সে কি উৎকণ্ঠা!]

'অবশেষে রফিক ফিরে এলো, মা এলেন না, অনিবার্য কারণে আসতে পারলেন না বলে। শুনে টুনু ভাই সকলের অলক্ষ্যে একবার চমকে উঠেছিলেন ক্যামেরায় আটকা পড়ার মতো আমার চোখে এখনো সে দৃশ্যটি ধরা রয়েছে - - - -।

'কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকার পর আমাকে ইশারা করে বারান্দার দিকে এগিয়ে গেলেন। সে দিকটায় তখন কেউ ছিলো না। পশ্চিম দিকে কিছুদূর

Chunati.com Pioneer in village based website

গিয়ে দেয়ালে মাথা রেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ নীরবে কাঁদলেন। আমি কিছু সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কিছুই বলতে পারিনি। আমারও তো মা আছে, আমারও তো বুক আছে - - - -।

'সেইবারেই এমনি আলাপ আলোচনার মধ্যে বলেছিলেন: 'আমি যদি মরে যাই এদেশের আর কি কেউ নৃত্যকে জীবন হিসেবে নেবে না? জীবনের মত ভালোবেসে সাধনা করবে না?' এটা আশা কি নিরাশাবাদিতা আমি বুঝতে পারিনি। তবে বুঝতে পেরেছিলাম, জীবন ও নৃত্যকে তিনি অবিচ্ছিন্ন ভাবেই দেখেছিলেন। ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারের প্রতি তাঁর এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও অকৃপণ শুভেচ্ছা প্রকাশ পেয়েছিলো হয়তো। কথার ফাঁকে ফাঁকে আরো যে জিনিসটা শেষ বারের মত জানতে পেরেছিলাম, তা হলো তিনি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করতেন, আমাদের এই সমাজ অচিরেই বিরাট পরিবর্তনের সম্মুখীন হবে। পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে জনাব লিয়াকত আলীকেই তিনি ভালোবাসতেন সবচেয়ে বেশী।

'কোলকাতায় ফিরে যাওয়ার দিন রাত্রিতে বাসা থেকে বিদায় নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে পাহাড় থেকে (চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজের বাংলো পাহাড়ের ওপর) নেমে আসার পর ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা বোন ভাগ্নে, ভাগ্নি ও অন্যদের দিকে-ফিরে তাকিয়ে বড় ভাগ্নিকে ডেকে চীৎকার করে বলেছিলেন: হেনা, যাই মা' গুড্‌বাই! কিন্তু এটা যে সত্যিকারের গুড্‌বাই তা তখন কেউই টের পায়নি।

'আমরা সবাই মিলে তাঁকে ট্রেনে তুলে দিতে এলাম। বিছানা পেতে সেই আগের মতো শোওয়া। ঢাকা হয়ে কোলকাতা যাবেন। জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি তো সোজা এখান থেকে কোলকাতা যেতে পারতেন, তবে কেনো এই কষ্টটুকু বাড়ালেন? উত্তর দিলেন: 'তাই তো, তাও তো হতো। তখন খেয়াল করিনি'। আশ্চর্য! তখন তিনি এতটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন······!

'গাড়ী ছাড়লো, হাত নেড়ে বিদায় দিলাম, জবাবও পেলাম। সেটা আমার জীবনে এখনো মহামূল্য সম্পদ হয়েই রয়েছে।

Chunati.com

'তার মাসেক কাল পরে শুধু তাঁকে দেখতেই আমি কোলকাতা গিয়েছিলাম। আমাকে দেখে শুধু একটা কথা বলেছিলেন : 'আমার জন্য তুই এতদূর আসতে পারিস্ তা কখনো ভাবিনি।' দই খেতে ভালোবাসতাম বলে রোজ দু'বেলা দই খাওয়াতেন।

'ধরে ধরে ট্যাক্সি করে ভবানীপুর ডাক্তারের বাড়ি নিয়ে যেতাম। ডাক্তার ওঁরই বন্ধু। আসা-যাওয়ার সময় খুবই কষ্ট হতো—তবুও বাইরের দিকে চেয়ে থাকতেন। মাঝে মাঝে আমায় দেখাতেন কোলকাতার কোন অংশটা চট্টগ্রাম শহরের মতো। তখন এক সময় বলেছিলেন : কোলকাতার মতো শহর হয় না, আমার এত ভালোলাগে। কলেজ জীবন থেকে সেইখানেই বরাবর কাটিয়েছেন বলে হয়তো কোলকাতার প্রতি তাঁর বিশেষ একটা টান ছিলো। এ শহর পাকিস্তানের বাইরে পড়েছে বলে তাঁর বিশেষ দুঃখও ছিলো……।'

Chunati.com
Pioneer in village based website

দুই

কোলকাতা ফিরে যাওয়ার পর বুলবুলের রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন মা পেয়ারাকে (বুলবুলের সর্বকনিষ্ঠ ভাই) নিয়ে কোলকাতায় আসেন। তাঁকে এগিয়ে নিতে দমদম বিমান বন্দরে এসেছিলেন বুলবুলের একাত্মপ্রাণ বন্ধু হরিনারায়ণ বাবু আর বুলবুলের বড় ছেলে শহিদ বুলবুল। বিমান বন্দরে বুলবুলকে দেখতে না পেয়ে মা'র সমগ্র চেতনা অবশ হয়ে আসে। তখনই তিনি প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন, কোনো কঠিন ব্যাধিতেই ভুগছে তাঁর ছেলে, যা তিনি এতদিন অনুমানও করতে পারেননি। ব্যাকুল হয়ে এসে পৌঁছালেন ছেলের বাসায়। বুলবুল থাকতেন পার্ক সার্কাসের চার নম্বর সোহরাওয়ার্দী এভেন্যুতে। তিনি তখন একখানা ইজি চেয়ারে অর্ধশায়িত হয়ে অধীর ভাবে মায়ের প্রতীক্ষা করছিলেন। পিঠে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। শরীরখানা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। সামনে এসে মা থমকে দাঁড়ালেন। ছেলেকে

ঠিক এমনটি দেখবেন, এ যে তাঁর কল্পনারও অতীত। মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিলেন আবার। হাত দু'খানা সামনে মেলে দিয়ে এগিয়ে গেলেন ছেলের দিকে। বুলবুলের দুচোখ বেয়ে তখন নীরব অশ্রুর বন্যা নেমেছে। মা'র হাত দু'খানা নিজের হাতে তুলে নিয়ে মুখ গুঁজে থাকলেন অনেকক্ষণ। একটু শান্ত হলে বললেন : 'ইয়া আল্লাহ্, মাকে আমার দেখালে তুমি। হাজার শোকর তোমার দরবারে। আমার আর কোনো সাধ নেই, কামনা নেই,...... এবারে তোমার যা খুশি কর, কোনোই অনুযোগ করবো না আর।'

সেইদিন থেকে বুলবুলের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মা তাঁকে বুকে করে রেখেছিলেন। বুলবুল আজীবন মা'য়ের হাতের রান্না খেতে ভালবাসতেন। এবারে মাকে কাছে পেয়ে আবার যেন সেই ছেলেবেলায় ফিরে গেলেন তিনি। তাঁর প্রিয় ডিসগুলো মায়ের হাতে তৈরি করিয়ে খেতেন। কথায় বার্তায়, আদরে আবদারে চেষ্টা করতেন মাকে ভুলিয়ে রাখতে।

একদিন বুলবুল অদ্ভুত আবদার ধরে বসলেন। একখানা কালো রঙের ডুরে শাড়ি আনিয়ে মাকে বললেন। আর্জি জানালেন পরতে হবে। ছেলেকে এ হেন অদ্ভুত খেয়াল হতে নিবৃত্ত করার জন্য মা বললেন : এখন কি নতুন কাপড় পরবার সময় বাবা? তুই ভালো হয়ে ওঠ, তখন না হয় পরবো। কিন্তু বুলবুল কোনো আপত্তিই শুনলেন না, অবোধ ছেলেটির মতো জিদ করে বসলেন, মাকে কাপড়খানা পরতেই হবে।

অবশেষে রুগ্নছেলের জিদের কাছে মা হার মানলেন। সেই রোগযাতনার মধ্যে বুলবুলের এধরনের খেয়ালকে শিল্পী সুলভ উচ্ছ্বাস ছাড়া আর কিছু বলা চলে না—এ যেন জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে মনের বিক্ষিপ্ত খেয়ালের চরিতার্থতা সন্ধান।

ক্রমে রোগ আরো বাড়াতে হাসপাতালে যাওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু হাসপাতালে যাওয়া বুলবুল গোড়া থেকেই পছন্দ করেননি। তাই চেষ্টা করা হয়েছিলো, হাসপাতালে না গিয়ে পারা যায় কিনা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত না গিয়ে কোনো উপায় রইলো না। বাসায় থেকে ক্যানসারের

চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। স্নেহাংশু বাবুর• ব্যক্তিগত চেষ্টায় চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালে বুলবুলের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। হরিনারায়ণ বাবু ও অন্যান্য বন্ধুরা বুলবুলের সব রকম সুখ সুবিধার প্রতি প্রথম থেকেই যত্নবান ছিলেন।

হাসপাতালে যাবার দিন বুলবুল খুব অস্থির হয়ে ওঠেন। বার বার একটা কথাই শুধু তিনি বলেছিলেন: এতদিন পরে মাকে আমার কাছে পেলাম, আর ক'টা দিন আমার ঘরে মাকে নিয়ে থাকতে দে না ভাই। বুলবুলের কাতরোক্তিতে হরিনারায়ণ বাবু, পেয়ারা এবং উপস্থিত অন্য সকলের চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠেছিলো। আর মা? মায়ের বুকে যে ঝড় উঠেছিলো তাকে চেপে রাখতে গিয়ে তিনি বার বার কেঁপে উঠছিলেন।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো রুগীর 'এটেণ্ডেণ্ট' হিসেবে পেয়ারা থাকবে হাসপাতালে, বুলবুলের সঙ্গে। মা থাকবেন বাসায়, রোজ ছেলের সঙ্গে থেকে আসবেন ভিজিটিং আওয়ার্সের পুরো সময়টুকু। হরিনারায়ণ বাবু, স্নেহাংশু বাবু, নীলরতন বাবু ও বুলবুলের আরো অনেক বন্ধু হাসপাতালে বুলবুলকে একদিনও নিঃসঙ্গ বোধ করতে দেননি। ননী গোপাল নামে একটি ছেলে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে হাসপাতালে বুলবুলের সেবা করেছেন। আশ্চর্য, বুলবুলের মৃত্যুর কিছুদিন পর ননীও মারা যান।

খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে বুলবুল স্বভাবত একটু শুচিবায়ুগ্রস্ত ছিলেন, সাধারণত পুরুষ মানুষের এ সবের বালাই থাকে না। ঘরের খাওয়া নিয়েই তিনি চিরদিন খুঁত খুঁত করে এসেছেন, হাসপাতালের খাওয়ায় কি করে তিনি তৃপ্ত হবেন। সুতরাং বাসা থেকেই দু'বেলা খাবার যেতো। একমাত্র অষুধ ছাড়া হাসপাতালের আর কোনো জিনিসই বুলবুল ব্যবহার করেননি। তোষক, বালিশ, চাঁদর, তোয়ালে থেকে যাবতীয় সব জিনিসই বুলবুল নিজের সঙ্গে নিয়েছিলেন।

• স্নেহাংশু বাবু ময়মনসিংহের বিখ্যাত জমিদার বাড়ির ছেলে। তাঁদের বদান্যতায় কলকাতায় চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালটি সমৃদ্ধ।

Chhanati.com Pioneer in village based website

হাসপাতালে আসতে যে মানুষের এত আপত্তি ছিলো তিনি যেন হাসপাতালে এসে অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। যেদিন একটু ভালো থাকতেন, ধীরে ধীরে হেঁটে অন্য সব রুগীদের কাছে গিয়ে তাদের অসুখের কথা জানতে চাইতেন, তাদের অভাব অসুবিধাগুলো লক্ষ্য করতেন আর যতটুকু সম্ভব আশ্বাস দিতেন সবাইকে। ডাক্তারেরা তাঁকে দেখতে এলে অন্যান্য রুগীকে কথা বলে, তাদের অভাব ও অসুবিধাগুলো প্রতিকারের জন্য অনুরোধ করতেন, তাদের হয়ে অনুযোগ জানাতেন।

তিন

হাসপাতালে আসার পর বুলবুলের অবস্থা প্রথম দিকে ভালোই যাচ্ছিল। তখন বুলবুল অনেকটা জোর করেই পেয়ারাকে বাড়ি পাঠিয়েছিলেন। মায়ের অনুপস্থিতিতে ঘরবাড়ির বিশৃঙ্খলা, বিশেষ করে পেয়ারার আসন্ন বি. কম. পরীক্ষায় প্রস্তুতির জন্যই তিনি পেয়ারাকে জোর করে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বাড়ি যাওয়ার দিন পেয়ারাকে নিজের পাশটিতে বসিয়ে, বুলবুল দেশের প্রত্যেকটি মানুষের কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। ওরা সকলে কে, কি অবস্থায় আছে। দেশে এ বছর ধান-চাল কেমন হয়েছে এবং কি দামে বিক্রি হচ্ছে। গাঁয়ের দরিদ্র লোকেরা দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পাচ্ছে কিনা, তারা কে কি কাজ-কর্ম করছে। টাকা পয়সা আমদানি করবার মতো কোনো কাজ দেশে হয়েছে কিনা। এসব বলতে বলতে বুলবুল এমন মগ্ন হয়ে যেতেন যে দেখে মনে হতো, তিনি যেন দেশের গরীব আত্মীয়-স্বজন ভাইবন্ধুদের মধ্যে বসে তাদেরই মুখে জানতে চাইছেন তাদের নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা। যখন সেই ঘোর কেটে যেতো মাকে বলতেন: একবার যদি দেশের বাড়িতে আমাকে নিয়ে যেতে পারেন মা, তা হলে আমি এমনিতেই ভালো হয়ে যেতাম। আমার গ্রামের সেই নিজস্ব বুনো গন্ধ, ঘুঘু ডাহুকের সেই মিষ্টি ডাক, পুবের পাহাড়ের পেছনে সূর্যোদয়ের অপূর্ব দৃশ্য, সবার ওপর দেশের গরীব-দুঃখী মানুষগুলোর অকৃত্রিম ভালোবাসা আমার কি যে ভালো লাগে মা—!

Chunati.com
Pioneer in village based website

মায়ের বুকে রুগ্ন ছেলের ওই কথাগুলো আচমকা আঘাত করতো। তিনি অস্থির হয়ে বলতেন : আর একটু ভালো হয়ে ওঠ বাবা, তোকে কোলে করে নিয়ে যাবো দেশে। কিন্তু বুলবুল মা'য়ের এই কথায় কোনো উৎসাহ দেখাতেন না। হয়তো তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, দেশে তিনি আর কোনো দিনই যেতে পারবেন না। পেয়ারা দেশে চলে যাওয়ার পর সবসময় মা হাসপাতালে বুলবুলের কাছে থাকতেন। মা দেখতেন, যে দিনই তিনি একটু ভালো থাকেন সে দিন আর বিছানায় পড়ে থাকেন না, অন্য রুগীদের কাছে গিয়ে তাদের খোঁজ-খবর করে বেড়াতেন। বুলবুলের এই অস্থিরতা দেখে তিনি বললেন : তুই নিজেও তো সুস্থ নোস বাবা, এরকম হাঁটাহাঁটি করা আর রাজ্যের যত রুগীদের কাছে যাওয়া কি ভালো?

বড় বেদনায় একটু হেসে বুলবুল মাকে বলতেন : মা, আপনি আমার কাছে আছেন, আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলে আমাকে খাইয়ে দাইয়ে কত যত্ন করে রেখেছেন। আমার বন্ধুরা আমার জন্য যত্ন নিচ্ছে, ডাক্তারেরা যত্ন নিয়ে আমার চিকিৎসা করছেন—সব রকমেই আমি তো আরামে আছি মা। কিন্তু ওরা? ওদের মধ্যে এমনও অনেকে রয়েছে যাদের কেউ নেই, কিছু নেই—অর্থসামর্থ্য, আত্মীয়-স্বজন, প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছুই নেই মা। কেউ তো এদের দিকে ফিরেও চায় না- - - -।

Chunati.com
Pioneer in village based website

ইউরোপ থেকে বুলবুল অনেক হোমিওপ্যাথির বইপত্র সঙ্গে এনেছিলেন। সে সব বইপত্রের উল্লেখ করে বললেন : আমি যদি বেঁচে উঠি, তাহলে দেশের মানুষের মধ্যে যে কয়জনকেই পারি রোগমুক্ত করার চেষ্টা করবো। রোগ-যন্ত্রণা যে কি ভীষণ জিনিস তা যে আমি হাড়েহাড়ে বুঝতে পেরেছি মা। আমার এই রোগযন্ত্রণাই যে রোগ-কাতর মানুষের কাছে আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

মায়ের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার পর থেকে এই শাস্ত্রের ওপর বুলবুলের অদ্ভুত বিশ্বাস জন্মেছিলো এবং একান্ত ভাবেই বিশ্বাস করতেন, হোমিওপ্যাথিতে তিনি একদিন ব্যুৎপত্তি লাভ করবেন। এই প্রসঙ্গে জনাব এম. কে. মেসওয়ানী বলেন :......I was at that time also carrying a small burden on my face—a tumour, Bulbul, talking dance and ballet, suddenly stopped short, began asking me my health history.

To my utter surprise—and this would be a surprise to many who read this, among them his most intimate friends, I am sure... I found that day that he was also a doctor, a homeopath, a science he had learnt only to satiate a generous impules, of helping others. This trait of Bulbul's character was a part o his being.*

মায়ের সেই জটিল রোগ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাতে নিরাময় হয়ে যাওয়ার পর থেকে বুলবুল মনে মনে একটা ইচ্ছা পোষণ করে আসছিলেন যে, 'চারুকলাকেন্দ্র' প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে দেশে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও তিনি স্থাপন করবেন। হাসপাতালে এসে দুঃস্থ পীড়িত মানবের যাতনা বুলবুলকে সেই পরিকল্পিত চিকিৎসালয়ের কথা অহরহ মনে করিয়ে দিচ্ছিলো। মায়ের সঙ্গে, বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে এই কথা তিনি বহুবার বলেছেন : আমি যদি আর ক'টা বছর বেঁচে থাকি, তবে আমার সবটুকু ঐকান্তিকতা দিয়ে 'দাতব্য চিকিৎসালয়' ও 'চারুকলাকেন্দ্র' স্থাপন করবো। 'আরোগ্য-নিকেতন' ও 'চারুকলাকেন্দ্র'—একটাতে মানুষ লাভ করবে দৈহিক আরোগ্য ও স্বাস্থ্য; আর একটাতে পাবে আনন্দের সঙ্গে মানসিক সুস্থতা ও শান্তি। জীবনের শেষ দিনেও এই মহৎ চিন্তাই করে গেছেন তিনি।

আপন-পর সকলের জন্য বুলবুলের বেদনাবোধের কাছে উপস্থিত কারো মুখে কোনো কথা জোগাতো না, মা' সাশ্রু নয়নে স্তব্ধ হয়ে থাকতেন। সকলের সদিচ্ছায় তাঁর সন্তান যেন নিরাময় হয়ে ওঠে, এই প্রার্থনা করতেন অন্তরের নিভৃতে।

* বুলবুলের জন্ম বার্ষিকীতে প্রকাশিত একটি স্মৃতিনির-এ জনাব এম. কে. মেসওয়ানীর লেখা হতে প্রাপ্ত।

Chunati.com
Pioneer in village based website

চার

সাধারণ মানুষের প্রতি মমতাবোধ বুলবুলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মাধ্যমে জনসাধারণের সেবা করার ইচ্ছাটা একটি বিশিষ্ট পরিকল্পনার রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে ১৯৫০-৫১ সাল থেকে। তখন বিভিন্ন কাজে তাঁকে প্রায়ই ঢাকায় আসা-যাওয়া করতে হতো। ঢাকায় এসে থাকতেন খুকুর বাড়িতে। আবাল্য সঙ্গিনী খুকুর স্নেহসান্নিধ্যে নিজেকে একটুখানি জুড়াবার জন্যই প্রধানতঃ খুকুর কাছে থাকতে ভালোবাসতেন। ভাই-এর জন্য একটি ঘর সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখতো খুকু। ঢাকা-চাটগাঁ-ময়মনসিংহ আর কোলকাতা আসা-যাওয়া করতে করতে কখন যে ভাই এসে পড়ে তার কোনো ঠিক ঠিকানা ছিলো না। যখনই তিনি আসতেন, আসতেন ঝড়ের মত করে। এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে বাসায় ফিরতেন. নাওয়া খাওয়া বিশ্রাম-আরাম সব কিছুই চলতো অনিয়মে। বিদেশে ট্রুপ নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা, দেশে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের চিন্তা, শিল্পীদলের নিয়মিত রিহার্সেল চালানো ইত্যাদিতে বুলবুল [illegible] মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে যেতো। খুকু বকে-ঝকে কেঁদে-কেটে সেই ছোটবেলার মত ভাইকে অনুযোগ করতো: শরীর বলেও যে একটা কিছু আছে ভাই তাও কি তুমি ভুলে যাচ্ছো? তখন খুকুর সামনে খুব তোড়জোড় করে কথা দিতো: কাল থেকে এমন আর হবে না, দেখিস ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় খাওয়া-দাওয়া থেকে সব কাজ করবো। তোর এই ঘ্যান ঘ্যান কে শুনবে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। আবার সব ভুলে যেতেন, আবার শুরু হতো সেই অনিয়ম।

কোলের বাচ্চার বিরক্তিতে রাত্রিবেলা দুই, তিনবার করে খুকুর ঘুম ভেঙে যেতো। বাচ্চার কাজে এটা সেটা আনা নেওয়া করবার জন্য খুকু বারান্দায় বের হলেই দেখতে পেতো বুলবুলের ঘরে তখনও আলো জ্বলছে। প্রথমটায় ভাবত, হয়তো বাতি জ্বালিয়ে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছেন। সারাদিন ঘুরাঘুরি করে প্রশান্ত হয়ে বাসায় আসেন তার ওপর আবার অতক্ষণ রাত জাগা কি করে সম্ভব! কিন্তু দু'একদিনই নয় শুধু, প্রায় প্রত্যেক রাতে, বাতি জ্বলতে দেখে খুকুর মনে সন্দেহ হয়। তখন বুলবুলের ঘরের জানালা দিয়ে দেখলো,

বিছানার ওপর আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে একটি বই পড়ছেন খুব মনোযোগ দিয়ে। খুকু জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ডাকলো ভাইকে, কোনো সাড়া পেলো না। দ্বিতীয়বার জোরে ডাকতেই বুলবুল মুখ তুলে চাইলো : কিছু বলছিস আমায় ?

বলবো আর কি ! এত রাত পর্যন্ত কি কর তাই দেখতে এলাম। সারা দিন রাজ্যের কাজে চরকির মত ঘোরো, রাতেও চোখ ভরে ঘুমাতে না পারলে তুমি যে পাগল হয়ে যাবে ভাই। তোমার হয়েছে কি বলতো ? ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখো, তিনটা বেজেছে ! একটুখানি হেসে, খানিক রেখে ঢেকে বুলবুল জবাব দিলো : নারে না, আমার কিছু হয়নি। সারাদিন তো ছুটোছুটিতে থাকি, সময় করে উঠতে পারি না, তাই রাতে হোমিওপ্যাথি বইগুলো পড়ি। এ এক অদ্ভুত শাস্ত্র, যতই পড়ছি ততই যেন বেশী আকর্ষণ করছে আমাকে। অতি সূক্ষ্ম ব্যাপার, কিন্তু যদি 'ডায়াগনোসিস' ঠিক হয় তবে একটি মাত্র 'ডোজে' রোগ নির্ঘাত আয়ত্তে এসে যাবে----' খুকু তখন এক ধরনের গুরুতর রোগে ভুগছিলো। তার উল্লেখ করে বললেন : ভাবছি সকালে এক ডোজ অষুধ দেবো। আর, তুই তো জানিস আমাদের দেশে কত লোক অর্থাভাবে বিনা চিকিৎসাতে মারা যায়। আমি যদি এই শাস্ত্রটা ঠিক মতো আয়ত্ত করতে পারি তবে চুনতির একটি লোকও অন্তত: বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে না। ডাক্তারি বই পড়বার সময় নতুন নাচ কম্পোজ সম্বন্ধে চিন্তা করবার সময় তাঁর মধ্যে এক ধরনের গভীর ও গম্ভীর তন্ময়তা প্রকাশ পেতো। যে মানুষ শিশুটির মতো কল-কূজনে মুখর ছিলেন, যখন গম্ভীর হতেন তখন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে সহজ হয়ে কথা বলাই যেতো না। বুলবুলের এই স্বভাবটি শেষের দিকেই বেশী করে চোখে পড়তো। প্রায়ই গম্ভীর হয়ে যেতেন, তন্ময় হয়ে পড়তেন। একি শিল্পীর তন্ময়তা ? যা প্রায় সব বড় শিল্পীর জীবনেই দেখা গেছে।

সেদিন ভাইয়ের কথা শুনে খুকুর যেন মনে হয়েছিলো, মানুষের জন্য ঐকান্তিক মমতাবোধ, কোনো কাজের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা, দু'চোখ ভরা অদ্ভুত কোমল স্থির, শান্ত দৃষ্টির গভীরতা দেখে মনে হতো বুলবুল যেন শান্তি ও স[illegible] যুগের মানুষ—যখন মানুষ মানুষকে ভালোবাসতো, সেবা করতো। মনের

Chunati.com Pioneer in village based website

গভীরে ডুব দিয়ে বুলবুল বুঝি প্রতিদিন সেই অপার্থিব মানসিকতায় অবগাহন করে উঠতেন আর দরিদ্র জনসাধারণের কথা ভাবতেন।

পাঁচ

হাসপাতালে রুগ্ন ছেলের বিছানার পাশে বসে নতুন করে ছেলের সেই মনের পরিচয় পেয়ে মায়ের মনে পড়লো, খুকুর মুখে শোনা সেই রাত জেগে ডাক্তারীশাস্ত্র আয়ত্ত করার একাগ্র নিষ্ঠার কথা। মনে মনে তিনি মোনাজাত করলেন : 'সকলের মঙ্গলের জন্য আমার ছেলেকে নিরাময় কর অল্লাহ্'।

পেয়ারা দেশে চলে আসার কিছুদিনের মধ্যে রমজান মাস শুরু হয়। মা রোজা রাখতেন। তাঁর সেহরীর সময় পাশে বসে তাঁর খাওয়া-দাওয়ার প্রতি যত্ন নেওয়া একটা কাজ ছিলো বুলবুলের। সেহরীর সময় মা সতর্ক থাকতেন যেন বুলবুলের ঘুম না ভাঙে। কিন্তু মায়ের সব রকম সতর্কতা সত্ত্বেও ঠিক সময় বুলবুল জেগে যেতেন আর সেহরী খাওয়াতেন। মা যেন খাওয়াতে ফাঁকি না দেন দেখতেন। যেদিন রোগযন্ত্রণায় নিতান্ত কাতর হয়ে পড়তেন, সেদিন বিছানায় শুয়ে শুয়েই খবরদারি করতেন। এমনি করে মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত বুকের মমতা মায়ের পায়ে অকৃপণ ভাবে ঢেলে দিয়েছেন। সে সব দিনের ছোটখাটো ঘটনাগুলো মায়ের চোখে সুর্মার মত লেগে রয়েছে। জিজ্ঞেস করলে মা বলেন : স্নেহ ভালোবাসা, শ্রদ্ধায় ভক্তিতে টুনু আমার চিরদিনই সবার বাড়া ছেলে—তবুও শেষের দিনগুলোতে ওর প্রতিটি কথায় প্রত্যেকটি কাজে সকলের জন্য ওর দরদ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি, ওর মনের ব্যাপ্তি আমায় বিস্মিত করেছে। ওর সহনশীলতায় আমি শ্রদ্ধান্বিত হয়েছি—অতি সুন্দর একখানা মন ছিলো টুনুর।

ডাক্তাররা বুলবুলকে দেখতে এলে নিজের রোগের সূত্র ধরে ওঁদের সঙ্গে এমন সব আলাপ-আলোচনা শুরু করতেন যে, ডাক্তারী বিদ্যায় দখল না থাকলে সে সব আলোচনা চালানো সম্ভব নয়। তাঁর কথা শুনে ডাক্তাররা'ও

অবাক হয়ে যেতেন। তাঁরা বলতেন: আমাদের হাতে কত রুগী আসে, কিন্তু আপনার মত এমন রুগীর হাতে তো কোনোদিন পড়িনি চৌধুরী সাহেব - - - - - - - - - - - শিল্পীর কাছ থেকে ডাক্তারী বিদ্যা অন্তত: আমরা আশা করিনি। পরে মায়ের দিকে ফিরে বলতেন: আপনার ছেলে শিল্পী না হয়ে ডাক্তার হলেও ঠিক এমনি খ্যাতি অর্জন করতেন।

ছয়

রমজান মাসের মাঝামাঝি থেকে বুলবুলের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে। শিরনি সালাত, সদ্‌কা-খয়রাত চিকিৎসা-পত্র, মানুষের শত রকমের চেষ্টা, শত শুভেচ্ছা, শত প্রার্থনাও ঠেকিয়ে রাখতে পারলো না সেই অন্তিম মুহূর্তকে। তখন বুলবুল বোধহয় পরিষ্কার রূপেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি আর বাঁচবেন না। আসন্ন শোকের ইঙ্গিত করে মাকে বলতেন: আমার আর কোনো দুঃখ নেই মা, দেশে যদি আর যাওয়া নাও হয় আমার তবুও আফসোস থাকবে না। আপনি তো কাছে আছেন, এখন আমার দেশ আর আমার মা এক হয়ে গেছে আমার চোখে। নুরুল হুদা আমার বন্ধু, 'চারুকলাকেন্দ্র' সম্পর্কে ওর সঙ্গে আমার অনেক আলাপ আলোচনা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি নুরুল হুদা আমার পরিকল্পনাকে রূপ দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। জাগতিক ব্যাপারে এই কথাগুলোই বুলবুলের শেষ কথা।

সেদিন ছিলো রবিবার, ১৬ই মে, ১৯৫৪ সাল। মা বা ছেলে কারো চোখে ঘুম ছিলো না। ক্যানসারের তীব্র যন্ত্রণায় বুলবুল ছট্‌ফট্‌ করছিলেন। শেষ রাতের দিকে যন্ত্রণা উপশমের সঙ্গে সঙ্গে গভীর ক্লান্তিতে বুলবুল নিঝুম হয়ে পড়লেন।

মা তাহাজ্জদের নামাজ পড়ে আবার বুলবুলের শিয়রের কাছে গিয়ে বসলেন। ছেলের কপালের ওপর এলোমেলো চুলগুলো আলতো ভাবে সরিয়ে দিয়ে, তাঁর রোগ শীর্ণ মুখখানার পানে চেয়ে বসেছিলেন তিনি। অল্পক্ষণ আগেও

যে রকম ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিলেন বুলবুল, মা দেখলেন এখন মুখখানাতে তার কোনো চিহ্নমাত্র নেই, কিন্তু বড় ক্লান্ত, বড় অবসন্ন দেখাচ্ছে তাঁকে; আর এক ধরনের শান্তির সুষমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মুখখানা। বুলবুলের আব্বার অন্তিম মুহূর্তেও ঠিক যেন এমনি একটা উজ্জ্বলতা দেখেছিলেন তিনি। হঠাৎ অব্যক্ত অস্থিরতায় তিনি কেঁপে উঠলেন।

সুদীর্ঘ রাতের শেষে একটু একটু করে দিনের আলো পরিষ্কার হয়ে উঠলো। প্রভাতের শান্ত বাতাসের সঙ্গে দূরাগত আজানের শেষ রেশটুকু মায়ের অশান্ত চিত্তে করুণ মূর্চ্ছনায় মিলিয়ে গেলো। সেই শান্ত পবিত্রতার সন্ধিক্ষণে হঠাৎ বুলবুলের তন্দ্রার ঘোর কেটে গেলো, ক্লান্ত কণ্ঠে ডাকলেন: 'মা'। মা ছেলের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন : এই তো বাবা আমি, কিছু বলবে আমাকে? তেমনি অবসন্ন কণ্ঠে বুলবুল বললেন: ডাক্তারকে একবার খবর দিতে বলছিলাম.........'।

ডাক্তারকে খবর দিতে হলো না, প্রতিদিনের মতো তিনি বুলবুলকে দেখতে এসেছেন তখন। যথারীতি বুলবুলকে পরীক্ষা করে দেখার পর তিনি যেন কেমন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ইনজেক্‌শন দেবার জন্য তৈরী হচ্ছেন দেখে, বুলবুল সে সম্বন্ধে কি যেন জিজ্ঞেস করলেন।

তারপর ছ'টো স্বচ্ছ সুন্দর চোখের দৃষ্টি মায়ের দিকে তুলে ডাক্তারের দিকে হাতখানা এগিয়ে দিতে দিতে আবার ডাকলেন: 'মা'। এ যেন কণ্ঠ-স্বর নয়, যেন বুকের পুঞ্জ পুঞ্জ ভালোবাসা আর অনুভবের প্রতিধ্বনি। সেই তাঁর শেষ ডাক!

তারপর একটি মুহূর্তমাত্র! মা দেখলেন, পদ্মের পাঁপড়ির মতো ছুটি চোখের পাতা একটু একটু করে বুজে এলো আর মুখখানা একটু যেন কাৎ হয়ে গেলো এক পাশে। মা তখনও বুঝতে পারেননি। সিরিঞ্জের সূঁচটি টেনে নিয়ে, আলগোছে অতি যত্নে বুলবুলের মুখের ওপর কাপড়খানা টেনে দিয়ে ডাক্তার চলে যাচ্ছিলেন, তখনই মা সম্বিৎ ফিরে পেয়ে চীৎকার করে বললেন: ডাক্তার বাবু, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? কি হয়েছে? টুনু চোখ বন্ধ করেছে কেনো?

সেই অনন্ত জিজ্ঞাসা মহাশূন্যের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত প্রতিধ্বনি জাগালো শুধু। জবাব মিললো না! এই অনন্ত জিজ্ঞাসার জবাব দেবার সাহস ডাক্তার কোথায় পাবে! বুকের রক্তে সেই মুহূর্তের বর্ণনা লিখলেও মায়ের সন্তাপের ছবি আঁকা যাবে না! কিংবা চোখের জলে বিশ্বচরাচর ভাসিয়ে দিয়েও মায়ের বুকের আগুন নিভানো যাবে না!

• • •

১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারীর এক শান্ত বিকেলে সুলুকে নিয়ে বুলবুল কোলকাতার কোনো এক কবরস্থানে গিয়েছিলেন, একজন বুজর্গের মাজার জেয়ারৎ করতে। কবরস্থানের শান্ত সুস্মিত পরিবেশটি আতর-লোবানের গন্ধে ভরা। গাছের ছায়ায় ছায়ায় সারি সারি কবর। গাছের ডালে বসে বিলম্বিত করুণ সুরে জানা-অজানা পাখি ডেকে চলেছে একটানা। ভাই-বোন জেয়ারৎ করতে করতে বুজর্গদের মাজার শরীফের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সেই পরিবেশে এমনিতেই কেনো জানি মন উদাস হয়ে ওঠে। তার ওপর, সেদিন সুলুর মন এক ধরনের অস্থির, অজানা বেদনায় ভারি হয়ে উঠেছিলো, অকারণ অশ্রুতে দুটি চোখ ভরে উঠেছিলো। বুলবুল তা লক্ষ্য করেছিলো কিনা জানি না, কিন্তু খানিকটা যেন নিজের মনেই বললেন: এখানে এলে আমার এত ভালো লাগে, শান্তিতে মন ভরে ওঠে। কবরগাহের শান্তি যে তখন থেকেই বুলবুলকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিলো তা কি করে সুলু বুঝতে পারবে!

—দরগাহ্ জেয়ারৎ শেষ করে সুলু মুখ ফিরিয়ে দেখলো, বুলবুল তখনো মোনাজাত করছেন। মোনাজাতরত হাত দু'খানা তাঁর ওপরের দিকে তুলে ধরা—মুখের এক পাশে অস্তগামী সূর্যের একটা তির্যক আলোর রেখা এসে পড়েছে। কিন্তু কোনো দিকেই যেন তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। এক অপার্থিব ভাবের মধ্যে যেন নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছেন। মাথার ওপরে সীমাহীন স্বচ্ছ নীল আকাশ, নীচে শান্ত, সুরভিত, পবিত্র পরিবেশ—তার মধ্যে বুলবুলের সেই ধ্যানীরূপ, অপূর্ব মনে হয়েছিলো সুলুর। আর অদ্ভুত একটা কথা মনে হয়েছিলো সেই মুহূর্তে, মনে হয়েছিলো, মাথার উপর এই শান্ত বিকেলের নির্মেঘ নির্মল আকাশ যেমন আর একটু পরে বদলে যাবে, যেমন বাতাসের

Ghunati.com Pioneer in village based website

বুকে মিলিয়ে যাবে আতর-লোবানের গন্ধটুকু, তেমনি করে তার ভাইও যেন চলে যাবে অন্য কোথাও! তিনি যেন বহুদূর দেশ হতে আগত এক মোসাফির। একটু পরে, এই মোনাজাত শেষেই আবার চলে যাবেন তাঁর যাত্রাপথে। তাই মোনাজাত করছে সকলের মঙ্গলের জন্য—যারা চলে গেছেন আর যারা পড়ে থাকলেন পেছনে, তাদের সকলের জন্য। সুদূর সেদিনের সেই অনুভবকে ঘটনার বিশ্লেষণে বুঝানো সম্ভব নয়, মনেই তার প্রতিফলন প্রয়োজন।

……সোমবার, ১৩ই রমজান, ১৭ই মে, ১৯৫৪ সাল, ভোর ৬টা ১৪ মিনিটের সময় বৃদ্ধা জননী, স্ত্রী, তিনটি শিশু সন্তান, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সকলকে শোক সাগরে ভাসিয়ে বুলবুল পার্থিব জগত থেকে চিরবিদায় নেন। সেদিন রাতে—যেখানে গেলে 'পরম শান্তিতে তাঁর মন ভরে উঠতো' যেখানে তাঁর 'এতো ভালো লাগতো'—সেই কবরস্থানেই বুলবুলকে সমাহিত করা হয়।

০ ০ ০

Chunati.com

বুলবুলের মৃত্যুতে তৎকালীন পাকিস্তানের সর্বত্র এবং পশ্চিম বঙ্গে গভীর শোকের ছায়া পড়ে। সভায়-সমিতিতে, কাগজে-পত্রিকায় বিবৃতিতে দেশবাসী তাঁদের অন্তরের অকৃত্রিম শোক জ্ঞাপন করেন। এই শোকের মাধ্যমে দেশবাসীর মনে বুলবুল আবার যেন নতুন করে বেঁচে উঠলেন। বিদেহ হয়ে যেন নতুন করে তাদের অন্তরবাসী হলেন। শোকের সঙ্গে দেশবাসী বুলবুলের অনস্বীকার্য প্রতিভার জন্যও গর্ব অনুভব করেন। বিদেশের সুধী সমাজ এই মহান শিল্পীর প্রতি তাঁদের শেষ তসলিম জানিয়ে বার্তা প্রেরণ করেন।

সাত

পাঠকের হয়তো মনে আছে, ইউরোপ যাওয়ার পথে ভিক্টোরিয়া জাহাজে ট্রুপের একটি মেয়ের হাতে বুলবুল একখানা বন্ধ খাম দিয়ে সেই যে বলেছিলেন : এখন রেখে দে……এই শোকবিহ্বল মুহূর্তে মেয়েটির মনে পড়লো সেই খামটির কথা। পরম যত্নে সে তা রেখে দিয়েছিলো নিজের বাক্সে। এবার সেটি বের করে

খুলে দেখলো—বুলবুলের মনের পুঞ্জীভূত বেদনার স্পর্শে লেখা কয়েক ছত্র কবিতা! শুধু বুলবুলেরই নয়—সকল দেশের, সকল যুগের, সকল শিল্পী-সত্তার চিরন্তন অভিমানই যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে এই কয়টি কথার মধ্যে :

'তোমরা যখন ছিলে ভুলের ঘুমে
আমি বারে বারে এসেছি দ্বারে
ডেকে গেছি ওঠ সব ভাই
কেহ জাগিলে না। অভিমানে চলে যাই,
যখন ভাঙ্গিবে ঘুম আমি সেথা নাই।

বুলবুল......'

ভিক্টোরিয়া জাহাজ,
এপ্রিল, '৫৩।

Chunati.com
Pioneer in village based website

পরিশিষ্ট

১৯৩৪-৩৫ সালে বুলবুল যে সব নৃত্য রচনা করেছিলেন, এখানে আমরা সেই সব নাচের নাম উল্লেখ করছি।

প্রভাতী নৃত্য

দেহছন্দ।	সর্প নৃত্য।
ইন্দ্র নৃত্য	অরুণ ও উষা নৃত্য।
ভ্রমর নৃত্য।	রাধাকৃষ্ণ নৃত্য।
ভিল বালক নৃত্য।	দেবদাসী নৃত্য।
সাঁওতালি নৃত্য।	নবান্ন নৃত্য (উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের মদনভষ্ম লোক নৃত্যের অনুপ্রেরণায়)।
শিকারী নৃত্য।	
চাতক নৃত্য।	গন্ধর্ব নৃত্য।
উষা নৃত্য।	পার্বতী নৃত্য।
প্রণয়ী নৃত্য।	নিশাদেবী নৃত্য।
নটরাজ নৃত্য।	রাধিকা নৃত্য।
সাগরসঙ্গম।	সূর্য নৃত্য।

Chunati.com
Pioneer in village based website

দুঃখের বিষয়, এই নাচগুলোর নাম ছাড়া বিস্তৃত রচনা আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি। তবে এর মধ্যে 'অরুণ ও উষা' 'সাগর সঙ্গম' ইত্যাদি নৃত্য ভাবকল্পনায় যে কত সমৃদ্ধ তা নামেই অনুমান করা যেতে পারে।

'শিকারী' 'ভিলবালক' 'সাঁওতালি নৃত্য'--সাধারণ মানুষ বিশেষ একটা দিনে কিভাবে নির্মল আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে, তারই নৃত্যরূপায়ন। আঙ্গিক ও অভিব্যক্তির দিকে নাচগুলো খুবই বলিষ্ঠ। 'দেবদাসী' 'নটরাজ' 'রাধিকা' 'পার্বতী' রাধাকৃষ্ণ' 'গন্ধর্ব' নৃত্যে হিন্দু সংস্কৃতিমূলক এবং পুরাতন কাঠামো ও আঙ্গিক সমৃদ্ধ। ভারতের এই ট্রেডিশনাল নাচগুলোকে যথাসাধ্য সহজবোধ্য করবার চেষ্টা করেছিলেন, অবশ্য গতানুগতিক পথ থেকে সরে গিয়ে।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে 'রাসলীলা' নৃত্যে স্বনামধন্যা শ্রীমতী সাধনা বসুর সহশিল্পীরূপে বুলবুল শিল্পী জীবনের প্রথম দিকে যে বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন সে দিনের দর্শকবৃন্দ বিশেষ করে শ্রীমতী বসু সে কথা আজো ভুলতে পারেননি নিশ্চয়। বলা বাহুল্য—'রাসলীলা' আসামের ট্রেডিশনাল নৃত্য এবং মনিপুরী আঙ্গিক ও অভিব্যক্তি সমৃদ্ধ। কিন্তু ভারতীয় নৃত্যের ট্রেডিশন চিহ্নিত পথে না গিয়ে বুলবুল তখন থেকেই নিজের পরিকল্পিত পথের সন্ধানে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতে থাকেন এবং 'ওরিয়েন্টাল ফাইন আর্টস এসোসিয়েশন' গড়ে তোলেন। বুলবুলের পরিকল্পিত নৃত্যাভিনয় বা নৃত্যনাট্য সম্বন্ধে আমরা পূর্বে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। এখানে কয়েকটি নাচের পরিচয় দেওয়া হলো :

আবাহন

পাষাণ দেবতা নটরাজের ঘুম ভাঙাবার জন্য সাধক শিল্পী-যুগলের নৃত্যারতি। অন্তরের আকুল আবেদন তাদের নৃত্যের ছন্দে ও ব্যঞ্জনায় বিচিত্র মুর্ছনায় ঝংকৃত হয়ে উঠেছে : জাগো, দেবতা জাগো, তোমার কৃপা কটাক্ষে আমাদের অন্তর উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠুক।

Ghunati.com Pioneer in village based website

চাঁদনী রাতে

আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ—বাতাসে বকুল, কেয়া, হাসনুহানার মধু-মদির গন্ধ—নদীর বুকে জ্যোৎস্নার রূপালি জোয়ার—এই মনোরম আবেষ্টনীতে প্রেমিকযুগল পুষ্প-বীথিকায় মিলন-রভসে মত্ত। তাদের অন্তরের প্রতি তন্ত্রীতে যে আনন্দের ঝঙ্কার উঠেছে নৃত্যের ছন্দে, গানের সুরে, বাঁশীর মূর্ছনায় তা অনুরণিত হয়ে চলেছে।

বিষের বাঁশী

বেদে জীবনের এক বিস্ময়কর কাহিনী। বেদে আর বেদেনী গ্রামে গ্রামে সাপের খেলা দেখিয়ে আহার্য ও অর্থ সংগ্রহ করে। বিপুল বিস্ময়ে গ্রামের লোক বিষধর সর্প ও সাপুড়ে কৌশল দেখে চমৎকৃত হয়। অন্যমনস্ক সাপুড়ে সহসা

গোক্ষুরের প্রাণান্তকর এক দংশনে বিষের ক্রিয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে ঢলে পড়ে। মুহূর্তকাল বেদেনী বিমূঢ়ের মতো চেয়ে থাকে, তারপর হঠাৎ অদ্ভুত কৌশলে মন্ত্র আর ওষধির আকর্ষণে পলায়মান সাপ ধরে ফেলে এবং বিষ ঝেড়ে দিয়ে বেদেকে বাঁচিয়ে তোলে। ভীত দর্শকবৃন্দের মুখে হাসি ফুটিয়ে বেদেনী বেদেকে নিয়ে গ্রামান্তরে প্রস্থান করে।

ফসল উৎসব

চাষী-মজুরের বৈচিত্র্যহীন জীবনের সবচাইতে আনন্দমুখর দিন হলো—যেদিন তারা মাঠের ফসল গোলায় তোলে। সেদিনের উৎসব নৃত্যের তালে তালে আঙ্গিকের অভিব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়ে ওঠে।

হারেম নিকেতন

বিস্মৃতপ্রায় মোগল যুগের একটি ছিন্ন স্মৃতি। বাদশাহী অন্তঃপুরের নিভৃত বিলাস কক্ষে যে পুরসুন্দরীদের নূপুর নিক্কন ঝঙ্কৃত হয়ে উঠতো, ইতিহাসের কুহেলী-যবনিকা ছিন্ন করে তারই একটি চিত্র প্রতিফলিত করবার প্রয়াস।

Chhuati.com
Pioneer in village based website

প্রবীর পতন

যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের যজ্ঞ-অশ্বের রক্ষক হয়ে মধ্যম পাণ্ডব অর্জুন দেশে দেশে পর্যটন করছিলেন। মাহিষ্মতী রাজ্যের অধিপতি নীলধ্বজের পুত্র প্রবীর, বীরবিক্রমে সেই অশ্ব অবরোধ করেন। শুভাকাঙ্ক্ষী সকলের হিতোপদেশ ও ভীতি প্রদর্শন অগ্রাহ্য করে মাতৃভক্ত প্রবীর মাতার আশীর্বাদ শিরে নিয়ে ভুবন বিজয়ী বীর অর্জুনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে সম্মুখীন হন। মাতৃ-পদধূলি প্রবীরের অক্ষয়-বর্ম, মাতৃআশীর্বাদের শক্তিতে মাতৃভক্ত প্রবীর সমরে অজেয়।

অপরাজেয় প্রবীরকে নিহত করবার জন্য পাণ্ডব-বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ দৈব-চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করলেন। রণক্লান্ত প্রবীর সমস্ত রাত্রি মোহিনী নায়িকার ছলনা পাশে আবদ্ধ রইলেন। প্রভাতে সহসা প্রবীরকে রণপ্রান্তরের মধ্যে রেখে দৈব-মায়া জাল তিরোহিত হলো। মাতৃ-আশীর্বাদ বঞ্চিত প্রবীর দুর্বার সংগ্রাম শেষে অর্জুনের হস্তে নিহত হলেন।

জীবন ও মৃত্যু

কোন অনাদিকাল থেকে আলোর পিছনে ছায়ার মতো, জীবনের পিছনে মৃত্যুর ছায়ামূর্তি, নিঃশব্দ পদক্ষেপে অনুসরণ করে আসছে। পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের আস্বাদ পেয়ে, জীবন যখন পরিপূর্ণভাবে বিকশিত, এমন সময় সহসা মৃত্যুর তুষার-শীতল কঙ্কাল হস্তের স্পর্শে সে শিউরে ওঠে। পৃথিবীর প্রতি ধূলিকণা আঁকড়িয়ে বাঁচবার বিপুল প্রয়াসে ক্লান্ত, অবসন্ন জীবন অনিবার্য মৃত্যুর করাল কোলে ঢলে পড়ে।

শিকারী

গভীর অরণ্যে বন্য ব্যাধ শিকার অনুসন্ধান করে বেড়ায়। এক হাতে তার দীর্ঘ ধনুক অন্য হাতে বিষ-মাখানো তীর। নিপুণ কৌশল ও অব্যর্থ শর নিক্ষেপে পাখি, হরিণ ও বাঘ শিকার করে হৃষ্টমনে শিকারী কুটিরের পথে ফিরে যায়।

Chunati.com
Pioneer in village based website

যাযাবরের দল

ছন্নছাড়া যাযাবর জীবনের [illegible] সুখ-দুঃখের [illegible] দুই বেদুইন ভিখারিনী পথে পথে গান গেয়ে পথিকের মনোরঞ্জন করে জীবিকা উপার্জন করতো। কিন্তু কেবল গান গেয়ে অর্থ উপার্জন করা যখন দুরূহ হয়ে উঠে—তখন একদিন তাদেরই সগোত্রের এক যাযাবর নর্তকের সাক্ষাৎ মিললো। পরস্পর পরস্পরকে নিজেদের বিদ্যা বিনিময় করার প্রস্তাব করলো। তাদের ইচ্ছা ও অনিচ্ছার গোলযোগ মিটিলে, একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিবিড় উল্লাসে মেতে ওঠে।

বিদায় অভিশাপ

(রবীন্দ্রনাথের গীতি কবিতার অনুপ্রেরণায়)

দেবগণ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে বৃহস্পতিপুত্র কচ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কাছে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখবার জন্য তৎসমীপে গমন করেন। সেখানে সহস্র বৎসর অতিবাহন করে নৃত্য-গীতে শুক্রদুহিতা দেবযানীর মনোরঞ্জনপূর্বক সিদ্ধকাম হয়ে কচ দেবলোকে প্রত্যাগমন করেন।

দেবযানীর কাছে বিদায় কালে—বহুদিনের সঞ্চিত স্মৃতির কুসুমে গাঁথা পরিপূর্ণ প্রেমের মালাখানা অপ্রত্যাশিত নিষ্ঠুর অবহেলায় ব্যর্থ হতে দেখে, ক্ষুব্ধ-বিমুখ দেবযানী কচকে তীব্র অভিশাপ-বিষে জর্জরিত করেন। অভিশাপ আর বিষাদের গ্লানি বহন করে নিরুপায় কচ দৈত্যপুরী ত্যাগ করেন।

উত্তরা-অভিমন্যু

যুদ্ধযাত্রায় উন্মুখ তরুণ বীর অভিমন্যু তাঁর কিশোরী প্রিয়ার কাছে বিদায় চাইতে এসেছেন। অজানা অমঙ্গল-আশঙ্কায় শঙ্কিত উত্তরা। প্রিয়তমকে রণে নিবৃত্ত করতে প্রয়াস পাচ্ছেন। ক্ষত্রিয়বীর অভিমন্যু তীব্র রণোন্মাদনায় অধীর—প্রিয়াকে প্রবোধ দিয়ে রণসাজে সজ্জিত হবার আনন্দে তিনি ব্যাকুল।

ব্রজ-বিলাস

যমুনা-পুলিনে ব্রজাঙ্গনা গোপিনীগণের প্রমোদ-কোলাহল মুখরিত। সহসা কুঞ্জবনের অন্তরাল থেকে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর সুর ভেসে এলো। মিলনোৎসুক গোপিনীগণ কুঞ্জবনের অন্তরালে গিয়ে দেখলো—সহচরদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ পাশা খেলায় মত্ত। পাশার ছক উল্টে দিয়ে গোপিনীরা তাকে টেনে আনলো। নিধুবনের কুসুম কুঞ্জে প্রমত্ত মিলন-লীলায় কৃষ্ণ ও গোপিনীগণ নিবিড় আনন্দে রাস-নৃত্যে মেতে উঠলো।

উল্লিখিত নাচগুলোর মধ্যে কয়েকটি ছাড়া অন্য নাচগুলো বুলবুল তাঁর অনুষ্ঠানসূচী হতে বাদ দিয়েছিলেন। মুসলিম সংস্কৃতিমূলক নৃত্যনাট্যগুলোই প্রধানত বুলবুলের অনুষ্ঠানসূচীতে স্থান পেয়েছিলো।

সোহরাব-রুস্তম*

সোহরাবের জন্মের আগেই পিতা রুস্তমকে যুদ্ধে চলে যেতে হয়। কিন্তু তিনি আর ফিরে আসতে পারেন না। তারপর উনিশ বছর কেটে গেছে। ইতিমধ্যে সোহরাবও একজন অসম সাহসী যোদ্ধা হয়ে উঠেছেন, ঘটনাচক্রে দুটি বিবদমান যোদ্ধাদলের নেতা হিসেবে সোহরাব ও রুস্তম পরস্পরের সম্মুখীন হন—কেউই তাঁরা জানেন না, তাঁদের মধ্যেকার সম্পর্কটি পিতা ও পুত্রের।

* পারস্যের অমর সাহিত্য থেকে নেওয়া একটি গল্পের নৃত্য রূপায়ন।

আল্লার আরাধনা শেষ করে, উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে সোহরাব রুখে দাঁড়ালেন শত্রুর সম্মুখে। যুদ্ধ শুরু হলো। পরম বিক্রমে উভয়ে উভয়ের আক্রমণ প্রতিহত করতে লাগলেন। এমনিভাবে এক সময় তাঁরা একে অন্যের বক্ষলগ্ন হয়ে পড়লেন। কিন্তু সংস্কার ও আত্ম-গৌরবের খাতিরে আবার তাঁরা সচেতন হয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। এবার সোহরাবের এক জোরালো আঘাতে রুস্তমের তরবারি ছিটকে পড়ে গেলো।

কিন্তু নিরস্ত্র রুস্তমের শিরে আঘাত না করে সোহরাব তাঁকে নিজের তরবারি তুলে নেবার সুযোগ দিলেন। তারপর আবার সেই যুদ্ধ। কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করেও রুস্তমের ওপর চরম আঘাত হানতে পারলেন না। রুস্তমেরও প্রায় সেই অবস্থা। একজন সামান্য যুবকের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে, প্রবীণ যোদ্ধা রুস্তম ক্ষেপে উঠে নিজের সাহস ও যুদ্ধ কৌশলকে অনুপ্রাণিত করার জন্যই যেন প্রচণ্ড হুঙ্কার হেঁকে উঠলো--'রুস্তম'।

যে মহাবীরের সন্ধানে সোহরাব গৃহত্যাগ করেছেন, সেই বীর, অর্থাৎ নিজের পিতার নাম শুনে সোহরাব যেন সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। সেই মুহূর্তে তাঁর হাত থেকে তরবারিখানা মাটিতে পড়ে গেলো। পূর্বের রোষ সংবরণ করতে না পেরে রুস্তম নিরস্ত্র সোহরাবের বক্ষে নিজের তরবারিখানা আমূল বিদ্ধ করে দিলেন।

Chunati.com
Pioneer in village based website

মৃত্যুর মুহূর্তে সোহরাব কাপুরুষতার জন্য নিন্দা করে নিজের পরিচয় তার কাছে প্রকাশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। যুদ্ধক্ষেত্রে শায়িত প্রিয়তম পুত্রের পাশে রুস্তম একাকী বসে রইলেন শুধু নিজের চরম দুর্ভাগ্যকে অভিসম্পাত দেবার জন্য।

ইরানের এক পান্থশালায়

এক পাত্র শরাব আর নর্তকী মেয়েদের সঙ্গলাভের জন্য পান্থশালায় এসে জমা হয় সব রকমের মানুষ--কবি, দার্শনিক, ধনী, পর্যটক। কিছুক্ষণ অবস্থানের পর তারা আবার চলে যায় যে যার পথে—

ইরানের তেমনি একটি পান্থশালার এক কোণায় বসে নতমুখী একটি

ক্রীতদাসী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো। তার পাশে বসে পশুর মতো হিংস্র একজন লোক অনবরত মদ্যপান করে চলেছে—ক্রন্দনরত ক্রীতদাসীর মুনিব সে।

এমন সময় সংগীতের মুর্ছনার সাথে ঝরণা ধারার মতো একদল নর্তকী সেখানে এসে উচ্ছল হয়ে উঠলো। তারই মধ্যে ধীর পদক্ষেপে এসে ঢুকলেন এক ভ্রাম্যমাণ তরুণ কবি। আর সঙ্গে সঙ্গে নর্তকী-শ্রেষ্ঠার নজর পড়লো তাঁর ওপর—দৃষ্টি চঞ্চল হয়ে উঠলো, বক্ষ উঠলো কেঁপে। কবিও সেই দৃষ্টির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেললেন।

চঞ্চল চরণা নর্তকী স্বহস্তে কবির মুখের কাছে সুরার পাত্র তুলে ধরলেন। নৃত্যের ছন্দে, দেহের হিল্লোলে, কণ্ঠের সুষমায় নটীর দল কবির বন্দনা গাইলো। হঠাৎ কবির দৃষ্টি গিয়ে পড়লো ক্রন্দনরতা ক্রীতদাসীর ওপর। তারপর একটুও ইতঃস্তত না করে ক্রীতদাসীর পাশে এসে দাঁড়ালেন কবি। জিজ্ঞেস করলেন কি তার দুঃখ, কেনো সে এমন করে কাঁদছে? করুণ আবেদনে হতভাগ্য মেয়েটি জানালো—তার নিষ্ঠুর মুনিবের কবল থেকে তাকে রক্ষা করার কথা। করুণা ও সহানুভূতিতে বিগলিত হৃদয় কবি প্রতিজ্ঞা করলেন তাকে রক্ষা করবেনই।

Pioneer in village based website

এমন সময় সুরার নেশায় মাতাল মুনিব এসে দাঁড়ালো দু'জনের মধ্যে—হাতে তার লম্বা চাবুক। সে নির্মমভাবে চাবুক মারতে লাগলো হতভাগ্য ক্রীতদাসীর পিঠে। চকিতে কবি আড়াল দিয়ে দাঁড়ালেন মেয়েটিকে। তাতে আরো বেশী রেগে মুনিব তার শাণিত ছোরা বের করলো এবং দাসীকে ছোরার ভয় দেখিয়ে টেনে সরিয়ে নিয়ে গেলো। তখন নিরস্ত্র কবির কিছুই করবার রইলো না আর—শুধু অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইলেন। অপসৃয়মাণ দাসী তার খোপা থেকে একটি শ্বেত গোলাপ তুলে নিয়ে কবির দিকে ছুঁড়ে দিলো। সামান্য ক্রীতদাসীর প্রতি কবি যে অভাবনীয় সহানুভূতি দেখিয়ে ছিলেন—এই উপহারের মধ্যে মেয়েটি তার অন্তরের কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে গেলো যেন। কবি ধীরে ধীরে ফুলটি কুড়িয়ে নিয়ে তুলে ধরলেন দৃষ্টির সম্মুখে।

নর্তকী-শ্রেষ্ঠার নূপুর নিক্বণ কখন যেন থেমে গেছে—সে দাঁড়িয়ে আছে বিষাদ প্রতিমার মতো—ক্রীতদাসী চলে যাবার পর, সে আবার জেগে উঠলো

চঞ্চল চরণ ছন্দে, সে কবির কাছে এগিয়ে এসে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলো—কিন্তু চেষ্টা তার ব্যর্থ হলো। তারপর সে কবিকে উপহার দিলো একটি তাজা রক্ত গোলাপ—কবির প্রতি গভীর ভালোবাসার নির্দশন। কিন্তু কবি তখন শ্বেত গোলাপটি নিয়ে হতভাগ্য ক্রীতদাসীর কথাই ভাবছিলেন বুঝি। আহত মনে নর্তকীশ্রেষ্ঠা সরে গেলো এক কোণে। পর মুহূর্তেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো আবার কবির সামনে এসে ক্রীতদাসীর দেওয়া শ্বেত গোলাপটি ছিনিয়ে নিলো এবং নিজের বুকে ছুরিকাঘাত করে বুকের শোনিতে ফুলটি রক্তরাঙা করে ফিরিয়ে দিলো কিংকর্তব্যবিমূঢ় কবির হাতে। তখন নর্তকীর মুখে সার্থকতার হাসি—কিন্তু রক্ত ক্ষরণের ফলে নিস্তেজ হয়ে সে ধীরে ধীরে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

এবার কবি ভূলুণ্ঠিতা, অনাদৃতা নর্তকীকে গভীর আবেগে বুকে তুলে নিলেন।

Chunati.com
Pioneer in village based website

প্রেরণা

পূর্ণজোৎস্নায় বিশ্বচরাচর যেন ভেসে যাচ্ছে—কুঞ্জের পাশে বসে আছেন কবি—মনে ভাবের আবেশ, আর মুখে স্মিত হাসি। ভাবের আবেশে মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছেন কবি—কিন্তু লিখতে পারছেন না কিছুতেই—সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। কবির জীবনে এমন আর হয়নি কখনো।

কবি-প্রিয়া এসে তখন তাকে অনেক রকম উৎসাহিত করলো, অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করলো, কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো তার সমস্ত প্রয়াস, সব শুভেচ্ছা বুকভরা দুঃখ নিয়ে প্রিয়া চলে গেলো—

হঠাৎ স্বর্গলোক থেকে যেন একটা আলোর শিখা নেমে এলো ঃ সে তো শুধু আলোর শিখা নয়—সে যেন 'প্রেরণা'। কবিকে অনুপ্রাণিত করে আশীর্বাদ করতে এসেছে।

নিজের প্রেরণা, নিজের সৌভাগ্যকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন করলেন কবি। তারপর স্বর্গের সেই আলো ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলো।

কবির জীবনে এই সৌভাগ্যের দিনে প্রিয়াকে মনে পড়লো—তাকে কাছে ডাকলেন। হাতে একটি গোলাপ নিয়ে প্রিয়া প্রিয় সান্নিধ্যে এলো—তখন দু'জনে মনের আনন্দে মুখর হয়ে উঠলেন এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে।

দুন্দুভির আহ্বান

মাতৃভূমির সেবায় দেশের যুব সম্প্রদায়ের নিঃস্বার্থ আত্মনিয়োগের মহৎ প্রচেষ্টা নৃত্যের মাধ্যমে বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে এই নাচটিতে।

আনারকলি

মোগলসম্রাট আকবর তখন ক্ষমতায় আসীন। দিল্লীর পাষাণ দুর্গের অভ্যন্তরে দাসী-বালিকা আনারকলি—আনারকলির মতোই বিকশিত হয়ে উঠেছিলো দিন দিন। শাহ্‌জাদা সেলিম—আগামী দিনের জাহাঙ্গীর, তারুণ্যের প্রাণ ধর্মীতায় ঘুরে বেড়াতেন শাহীবাগের আনাচে কানাচে। তারি মধ্যে একদিন আনারকলির রূপে মুগ্ধ হলেন তিনি—দাসী-বালিকা আকৃষ্ট করলো শাহজাদাকে। তারপর দু'টি মুগ্ধহৃদয়ের সম্মুখে সমস্ত বিশ্বচরাচর এক হয়ে গেলো—নবরাগে নবীন মাধুর্যে ভরে উঠলো দুজনার সান্নিধ্য। প্রেমের উষ্ণতায় আনারকলি আর শাহ্‌জাদার প্রাণোচ্ছাস বেড়ে চললো দিন দিন।

কিন্তু এই মুধুর কলগুঞ্জনের মধ্যে সম্রাটের আদেশ বজ্র হুঙ্কারে ফেটে পড়লো—শাহ্‌জাদা সেলিম চলে গেলেন যুদ্ধ ক্ষেত্রে। আর দাসী-বালিকা আনারকলি বন্দী হলো কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। [illegible] এই হতভাগ্য বালিকাকে জীবন্ত সমাধি দেওয়া হলো।

যথাসময়ে শাহ্‌জাদা প্রত্যাবর্তন করলেন—কিন্তু তখন তাঁর জগত শূন্য হয়ে গেছে—একটি অতৃপ্ত বিরহী আত্মার ক্রন্দন ছাড়া তিনি যেন আর কিছুই শুনতে পেলেন না। ভগ্ন-হৃদয় শাহ্‌জাদার চোখের সম্মুখে অমর হয়ে উঠলো আনারকলির প্রেম—লাইলি-মজনু, শিরী-ফরহাদ, ইউসুফ-জোলেখার অনন্ত প্রেমের মতো।

চাঁদ সুলতানা

এই বীরাঙ্গনা মুসলিম জাহানের 'জোয়ান অব আর্ক'-অশ্বারোহণে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। নিজেদের বিজয়ের জন্য দোয়া প্রার্থনার পর চাঁদ সুলতানা মনস্থির করে নেন। তারপর চারিদিকে তাকিয়ে শত্রুশক্তি অনুমান করবার চেষ্টা করেন তিনি। নিজের সৈন্যদের প্রতি নির্দেশ দিয়ে উন্মুক্ত অসি হাতে, অপূর্ব বিক্রমে, শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন—শত্রু-সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়—বিজয় গৌরবে গরবিনী চাঁদ সুলতানা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেন।

হাফিজের স্বপ্ন

প্রিয়তমা পত্নী শাখ-ই-নবাতের মৃত্যুর পর ঋষি-কবি হাফিজ সব প্রেরণা হারিয়ে ফেলেন। তখন তিনি শাখ-ই-নবাতের সমাধিতে পড়ে থাকতেন। তেমনি একদিনের ঘটনা—হাফিজ তন্দ্রার ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন যেন—সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখে নেমে এলো এক স্বপ্ন। দেখলেন, বেহেস্তের হুরী অপ্সরীরা হাল্কা পাখায় নেমে এসে, সমাধির আবরণ উন্মোচন করে ফেললো। কবি দেখলেন, শাখ-ই-নবাত—কবির হারানো প্রিয়া উঠে আসছেন তাঁর কাছে। আনন্দে বিস্ময়ে কবি হতবাক। কবি-প্রিয়া তাঁকে প্রেরণা দিয়ে বললেন ঃ যুগে যুগে আমি যে তোমারই। তুমি কেনো স্তব্ধ হয়ে আছো কবি?

মন্বন্তর বা পাছে আমরা ভুলে যাই

১৯৪৩ সালে বাংলাদেশে মানুষের তৈরী দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা এই নৃত্য-নাট্যে রূপায়িত হয়েছে।

শান্ত সুখী একখানা গ্রামের ছবি। চারিদিকে শান্ত সুখী মানুষের কলগুঞ্জন—তারই মধ্যে হঠাৎ রণ-দুন্দুভির উচ্চরবে। গ্রামের মানুষ আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। যুদ্ধের সুযোগে দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারীদের আধিপত্য চরমে ওঠে।

Chunati.com
Pioneer in village based website

আর আধিপত্য বাড়ে চোরাকারবারী, মুনাফাখোর এবং সমাজের কলঙ্ক দালালদের। দরিদ্র গ্রামবাসীদের সারা বছরের ধান কিনে নেয় তারা। আর তারই ফলে খাদ্য সংকট দেখা দেয়, দুর্ভিক্ষ আসে, আসে মহামারী। ক্ষুধার্ত মানুষের মিছিল চলে শহরে বন্দরে—অসংখ্য মানুষ মরে পথে ঘাটে। জ্বরাগ্রস্ত ক্ষুধার্ত কৃষক মানুষের বিশ্বাসঘাতকতায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, বিধাতার উদ্দেশ্যে বলে, কোথায় তোমার বজ্রদণ্ড! কিন্তু সে অচিরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো।

'সাধনা' নামে বুলবুলের একটি নাচের উল্লেখ পাওয়া যায় স্টেটস্‌ম্যানের খবর-এ Bulbul's solo number 'Sudhanna' attracted as usual a great deal of attention. His rendering of this war dance to the accompaniment of a Timir Baran Composition, was a notable feature of the evening.

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বুলবুল রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর নৃত্যরূপ দিয়েছিলেন এবং ১৯৯৬ সালে কোলকাতায় 'ফার্স্ট এম্পায়ারে' এই নৃত্যনাট্যটি মঞ্চস্থ করা হয়েছিলো। 'নৃত্যশ্রী' 'ননিচোরা মীরা' 'উন্মেষ বসন্ত বাহার' 'মালকোষ' 'জেলে' 'কৃষাণ কৃষাণী' ইত্যাদি নৃত্যগুলো বুলবুলের অনবদ্য রচনা সম্ভারের অন্যতম।

ঐতিহ্যগত লোক-নৃত্যকে বুলবুল কখনো অবহেলা করেননি। বরং উত্তর বঙ্গের জনপ্রিয় লোক-নৃত্য ও ভারতের যুক্তপ্রদেশের লোক-নৃত্য 'গাজন' ও 'হোলি' বুলবুলের অনুষ্ঠান সূচীতে সাদরে স্থান করে নিয়েছিলো। উপজাতিদের নাচের অনুপ্রেরণায় রচিত নাচের মধ্যে 'রূপক' নামক নৃত্যটি অত্যন্ত জনপ্রিয়।

এই পরিচ্ছেদের প্রথম পৃষ্ঠায় উল্লেখিত নাচ সম্বন্ধে বুলবুলের হাতে লেখা কাগজ-পত্র আমরা জোগাড় করতে পেরেছি। সন তারিখের সঙ্গে তাতে আরো উল্লেখ রয়েছে যে ঃ All dances are composed by Master Bulbul (Ist Muslim Dancer of Oriental Style)

তরুণ বয়সেই নয় কেবল, সঙ্গীত সম্বন্ধে বিশেষ করে নৃত্ত-সঙ্গীত সম্বন্ধে বুলবুল পরে আরো বেশী আগ্রহশীল ও সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। দেশ-বিদেশের প্রায় দুই শতের মতো অর্কেস্ট্রা, কন্সার্ট ও সঙ্গীতের রেকর্ড বুলবুল সংগ্রহ করেছিলেন। 'বুলবুল ব্যালে'র যুগের সঙ্গীত পরিচালক, পাক-ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুরসাধক তিমির বরণের সান্নিধ্য, তাঁর সার্থক সঙ্গীত পরিবেশন বুলবুলের সঙ্গীত পিপাসা যে চরিতার্থ করতে পেরেছিলো, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

Ghunati.com
Pioneer in village-based website

বুলবুল তাঁর শিল্পকর্মকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে সাধ্যমতো কোনো ত্রুটি থাকতে দেননি। পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও বুলবুল সুরুচির পরিচয় দিয়ে গেছেন। বিভিন্ন ধরনের নাচের সঙ্গে পোশাকের সামঞ্জস্য নিয়ে তিনি রীতিমতো চিন্তা করতেন। মুসলিম সংস্কৃতিমূলক নৃত্যনাট্যের পোশাক নির্বাচনের সময় বুলবুল মোঘল আমলের বহু চিত্রের সাহায্য নিয়েছিলেন। বুলবুলের নৃত্য-বৈশিষ্ট্যকে পোশাকের পরিপাট্য যে সমৃদ্ধতর করে তুলেছিলো তাতে দ্বিমতের অবকাশ নেই। বুলবুলের নৃত্যানুষ্ঠান যাঁরা দেখেছেন স্বাভাবিক নির্বাচনে তাঁর সুন্দর সামঞ্জস্যপূর্ণ রুচি সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন।